শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা
ও
বিবেকানন্দ

গিরীশচন্দ্র ঘোষ

সপ্তর্ষি
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
মহালয়া, ১৩৭০

প্রকাশক :
ভোলানাথ দাস
সপ্তর্ষি,
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
শ্রীগণেশ কুমার ভাণ্ডারী
লক্ষ্মী প্রিণ্টার্স
২১/১ বি পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

সূচীপত্র

শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা

ও

বিবেকানন্দ

[শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কিত
গিরিশচন্দ্রের রচনার সঙ্কলন]

সাধন-গুরু

বৈজ্ঞানিক যখন কোন সত্য বর্ণনা করেন, তাহার ভাব অতি দীন, অতি সাবধানে কথা প্রয়োগ, অতি বিনীতভাবে প্রকাশ করেন যে,—উপস্থিত আমরা এইরূপ দেখিয়াছি, শ্রোতারাও এইরূপ দেখিবেন। যথা,—হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন মিলিত করিলে জল হয়, আপাততঃ স্বভাবের যেরূপ অবস্থা আছে, তাহাতে উক্ত দুই বাষ্প একত্র করিলে জল হইবে। যদি কেহ সন্দেহ করিয়া প্রশ্ন করেন যে, কোন অদৃশ্য বাষ্পের অস্তিত্ব কি সম্ভব নাই—যে বাষ্পের সহিত উক্ত বাষ্পদ্বয় মিলিত হইয়া জলরূপে পরিণত হয়? তিনি অতি বিনীতভাবে উত্তর করিবেন, "আছে কি না জানি না"—সলিলে এই দুই বাষ্পের প্রমাণ হয়। পরে যদি কেহ সেই অদৃশ্য বাষ্পের আবিষ্কার করিতে পারেন, আমরা তাহা স্বীকার পাইব। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন যে, অক্সিজেন কি স্বয়ং স্বতন্ত্র পদার্থ বা অপর কোন পদার্থে মিলিত হইয়াছে—তাহাতেও সেই বিনীত উত্তর। বলিতে পারি না, কালে প্রকাশ পাইলেও পাইতে পারে যে, দুই বাষ্পের সংযোগে অক্সিজেন হইয়াছে; কিন্তু আপাততঃ তাহার কোন প্রমাণ নাই। কিন্তু এইরূপ বিনীত ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ যখন নিজ নিজ মত প্রকাশ করেন, শুনিলে হৃৎকম্প হইতে থাকে; সে দীনভাব নাই; যিনি পূর্ব্বে একটি বালকের অমূলক প্রশ্ন,—অক্সিজেন দুইটি গ্যাস কি না, বা হাইড্রোজেন অক্সিজেন মিলিয়া পরশ্ব জল হইবে কি না, সন্দিগ্ধচিত্তে সাবধানে উত্তর করেন; সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় বিষয়ে আর তাঁহার সে সন্দেহ দেখা যায় না। 'নেবুলি'[১] অর্থাৎ অতি বাষ্পীয় জড় অবস্থা হইতে সৃষ্টি করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হ'ন না। কাহার পর কি জীব সৃষ্টি হইয়াছে, তদ্বিষয়ে অনুমানেও সঙ্কুচিত নন। পৃথিবীর অবস্থা কি হইবে, অনায়াসেই কল্পনা করেন, যদিচ স্পষ্টাক্ষরে বলেন না, পূর্ব্বমত সকল মিথ্যা। কিন্তু তাঁহাদের প্রবন্ধ পাঠে—একরূপ সিদ্ধান্ত হইয়া থাকে যে, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সম্বন্ধে যে ধর্ম্মমত প্রচলিত আছে, তাহা সমুদয় অমূলক। কোন বৈজ্ঞানিকমত পাঠে এ কথায় প্রতীয়মান হইবে। হাক্সলি, স্পেন্সার, টিণ্ডেল, প্রক্টর প্রভৃতি সতর্ক ভাষায় সদর্পে প্রকাশ করেন যে, ঈশ্বর বিষয়ে এ পর্য্যন্ত মনুষ্যেরা যাহা জানিয়াছেন, সকলই ভ্রান্তি,—সৃষ্টি বিষয়েও তাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যে সকল মহাত্মার (নিউটন, ফেরডে, ডারবিন ইত্যাদির) বহু শ্রমসম্ভূত আবিষ্কার লইয়া তাঁহারা (হাক্সলি ইত্যাদির) বেদবিরোধী হন, ঐ সকল মহাত্মারা প্রায়ই ঈশ্বরবাদী, এবং সৃষ্টি-সম্বন্ধে যে, নিরাকরণ করিয়াছেন, এরূপ অভিমান রাখেন না। আবার যেমন সূর্য্য-তাপে উত্তপ্ত বালুকাসকল সূর্য্য হইতে ক্লেশপ্রদ হয়, সেইরূপ যাঁহারা ঐ সকল সন্দিগ্ধ মত পাঠ করিয়া বেদ ও হিন্দুদর্শন-বিরোধী হ'ন,

---

১ বর্ত্তমানে ইহা 'নীহারিকা' নামে অভিহিত হইয়াছে।

তাঁহাদের বাক্য-যন্ত্রণা অতি তীব্র হইয়া উঠে। রসায়নের দুই পত্তি পাঠ করিয়া সদর্পে বলেন, "পঞ্চভূত কোথায়? পঁচাত্তরটি ভূত বিরাজমান,—এখনও বসিয়া দেখ, আরও কত ভূত হয়।" আরও যে কতগুলি ভূত হইবার সম্ভাবনা আছে, ইহাতে আমাদের কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, দার্শনিকেরা কি নিমিত্ত পঞ্চভূত কল্পনা করিয়াছেন, তাহা অনুসন্ধান করা হয় না। দার্শনিকেরা রাসায়নিক নহে; তাঁহারা রাসায়নিক পুঁথি লেখেন না। যখন পঞ্চভূতের সৃষ্টি হইয়াছে বলেন, তাহাদের অর্থ এই যে, জড়ের তিন অবস্থা—বাষ্পীয়, তরল ও কঠিন—যথা ক্ষিতি, অপ, মরুৎ। এই সকল জড়ের অবস্থানের স্থান চাই, তাহাকে ব্যোম বলেন এবং তেজ অর্থাৎ ক্রিয়াদ্বারা গঠন হয়—ইহাই কল্পনা করিয়া থাকেন। আমরা বৈজ্ঞানিকের মতাবলম্বী হইয়া তেজকে ক্রিয়া বলিয়া বর্ণনা করিলাম। কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না, জীব ও উদ্ভিদ-দেহে জড়ের এই তিন অবস্থা বিরাজমান। উক্ত দেহে পরমাণুর সংযোগমধ্যে ব্যোম আছে, এবং ব্যোম মধ্যে উক্ত দেহ আছে, অতএব ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোমে সে দেহ নির্ম্মিত হইয়াছে। লক্ষ লক্ষ এলিমেণ্ট (Element) যাহা ভূত নামে অনুবাদিত হয়, আবিষ্কৃত হইলেও পঞ্চভৌতিক নির্ম্মাণ-বিরোধী হইতে পারে না।[১] দর্শন ও রসায়নে প্রভেদ না জানিয়া যেরূপ বিতণ্ডা হয়, সাধন ও অনুমানের অর্থ না জানিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধেও বিতণ্ডা। বৈজ্ঞানিকবর স্পেন্সার সাহেব বলেন যে,—মনুষ্য ঈশ্বরকে জানিতে পারেন না, ঈশ্বর সম্বন্ধে মনুষ্য যাহা বলেন, তাহা সমুদয় ভ্রান্তি। একটি দৃষ্টান্ত দেন যে,—যদি ঘড়ির চৈতন্য থাকিত, তাহা হইলে সে যদি টিক্‌টিক্ করিয়া বলিত, "আমাকে যে নির্ম্মাণ করিয়াছে—সে অতি বৃহৎ চক্রাকার; তাহার মিনিট ও ঘণ্টা নির্ণায়ক হস্তদ্বয় অতি বৃহৎ ও টিক্‌টিক্ না করিয়া টক্ টক্ করিয়া চলে," তাহা কি সত্য হইত? এই দৃষ্টান্ত দিয়া ঈশ্বর সম্বন্ধে যাহা যাহা বলিবার আছে, তাহা সাব্যস্ত করিয়া দম্ভে বলেন যে, যাক্—এ সকল উল্লেখের আর প্রয়োজন নাই।

মে মাসের (১৮৯৫ খ্রীঃ) "কন্‌টেমপোরারি রিভিউয়ে (Contemporary

---

১ আমরা দার্শনিক "ভূত" কথাটি যে অর্থে ব্যবহার করিলাম, তাহাতে কাহারও কাহারও আপত্তি আছে। তাঁহারা বলেন, এ অর্থ স্বকপোলকল্পিত, আভিধানিক অর্থ ইহা নয়; এবং বিনা আপত্তিতে সংস্কৃত ভূতের আভিধানিক অর্থ ইংরাজী "এলিমেণ্ট" বলেন। এক ভাষার অর্থ অপর ভাষায় দিয়া তাহাকে আভিধানিক বলা সঙ্গত নয় বলিলে বড় অধিক বলা হয় না। ইংরাজী এলিমেণ্টের অর্থ—অমিশ্রিত কোন পদার্থ—যাহা বিভাগ করা যায় না, এবং যাহা হইতে নয়। কিন্তু সংস্কৃত ভূত-তত্ত্ব অন্যরূপ—যথা আকাশ হইতে বায়ু ইত্যাদি এক মৌলিক ভূত হইতে পর পর উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদিগকে ইংরাজেরা এলিমেণ্ট বলিবেন না। তাঁহারা বলেন, অক্সিজেন মধ্যে তড়িৎ-স্রোত গমনে অক্সিজেন পরমাণু সকল এরূপ অবস্থাপন্ন হয় যে, তাহার নাম আর অক্সিজেন থাকে না, তাকে "ওজন" (Ozone) বলে। যদি ওজন রাসায়নিক মতে এলিমেণ্ট না হয়, তাহা হইলে বায়ু, জল, তেজ, ক্ষিতি প্রভৃতি যখন এক বস্তু হইতে অপর বস্তুতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদিগকে কোন প্রকারে এলিমেণ্ট নাম দেওয়া যাইতে পারে না। অতএব যাহারা ভূত শব্দের আভিধানিক অর্থ এলিমেণ্ট বলিয়া দৃঢ় করিয়া ধরিয়াছেন, তাঁহাদের মত তাঁহাদের কাছেই সঙ্গত।

Review) ফগেজেরো (Fogazero) প্রণীত একটি প্রবন্ধে স্পেন্সার সাহেবের সহিত কিছু বিরোধ দেখা যায়। ফগেজেরো সাহেব বলিতেছেন,—"হয়তো দস্তা ও সাধারণ রৌপ্য-নির্ম্মিত ঘড়ি, বিদ্যা-বুদ্ধির অভাবে বলিতে পারে যে, কোন সর্ব্বশক্তিমান বৃহৎ ঘড়ি সকল ঘড়ির জনক। কিন্তু স্বর্ণ-নির্ম্মিত, হীরক-খচিত ঘড়ি বলিবে যে, চক্‌চক্‌ কর ও টক্‌টক্‌ কর—ব্যস্‌। হয়তো ক্রনোমিটার ঘড়ি আসিয়া বলিবে, কারণ তাহার কলকব্জা অতীব সুন্দর, সুতরাং তাহার বুদ্ধিও সুন্দর; ক্রনোমিটার বলিবে যে, একেবারে কখনও ঘড়ি সৃষ্টি হয় নাই। কারণ এই যে, আমাতে বড় চাকাটি ও ছোট চাকাটি পৃথক ছিল, ক্রমে ক্রমে মিলিত করা হইয়াছে, তবে তো আমি হইয়াছি। তাহার মতে তাহার সৃষ্টির কারণ পূর্ব্বে কতকগুলি সামগ্রী ছিল, সেই সামগ্রী লইয়া কোন এক চেতন পদার্থ তাহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছে, এবং সেই ঘড়িতে যে চৈতন্য বিরাজিত, তাহা নির্ম্মাতার চৈতন্যের অংশ মাত্র। কিন্তু স্রষ্টা কিরূপ, তাহার আকার কেমন, তাহা আমরা কিছুই জানি না। এখানে ফগেজেরো সাহেব নিশ্চিন্ত। যদিচ তাঁহার স্পেন্সার সাহেবের মত খণ্ডন করিবার বাসনা নাই, কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে যে কতক জানা যায়, তাহা তিনি অতি সুযুক্তি সহকারে সম্পন্ন করিয়াছেন; যুক্তির যতদূর বিস্তার, তাহার সীমায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কিন্তু হিন্দুরা বলেন, স্পেন্সার ও অপরাপর সাহেবেরাও বলিয়া থাকেন যে, ঈশ্বর মনোবুদ্ধির অগম্য। তন্মধ্যে হিন্দুর বিশেষত্ব এই যে, ঈশ্বর জড় মনোবুদ্ধির অগম্য, কিন্তু শুদ্ধবুদ্ধি তাঁহাকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে পারে। শুদ্ধ মনোবুদ্ধি সাধন-সাপেক্ষ। সাধন কাহাকে বল? যাহা না জানি তাহা শিখিতে হয়, যে জানে তাহার কাছে যাইতে হয়। এখানে একটি আপত্তি উপস্থিত হইতে পারে; কেন পণ্ডশ্রম করিব? বড় বড় সাহেব বলেন, জানা যায় না, যিনি বলেন জানা যায়, তিনি প্রমাণ করিয়া দিলে আমরা তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান করিব। অবশ্য কোন সাহেব যখন বলিয়াছিলেন যে, বৈদ্যুতিক শক্তির স্পর্শ ব্যতীত সূচিকা সঞ্চালিত হয়, তখন আমরা ভাঁড়, অ্যাসিড ও কার্ব্বন প্রভৃতি আনিতে কোন আপত্তি করি নাই। বলি নাই যে, ছুঁচ নাড়িবে, তবে এ সকল কেন? তবে যদি এখন বলেন, পুষ্পচন্দনাদি সংগ্রহ কর, শিবলিঙ্গ নির্ম্মাণ কর, আসনে বসিয়া একাগ্রচিত্তে এ কথাগুলি উচ্চারণ কর; আমরা হাস্যসহকারে বলিব, আমাদিগকে বাতুল পাইয়াছ? কি ইক্‌ড়ি-মিক্‌ড়ি চামচিকড়ি কানের গোড়ায় বলিলে তাহা জপ করিব; না মাটির উপর ফুল চাপাইব? এত আহম্মক নাই, তাহা অপেক্ষা এই উনবিংশ শতাব্দীতে মরণ ভাল।

সাধন-শিক্ষক বলেন,—"বাপু! কখনও মিথ্যা কথা কহিতে শুনিয়াছ? তোমার ঈশ্বরপ্রাপ্তি হইলে আমার কি কিছু লাভ হইবে? দেখ আমি কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী —আমার কিছুই প্রয়োজন নাই, তোমার নিকট কিছুই চাহি না, তুমি ত্রিতাপে জর্জ্জরীভূত হইতেছ, তোমার দুঃখ নিবারণ হয়—এই আমার বাসনা। দিবারাত্রি আমার সহিত থাকিয়া দেখ, ইচ্ছা হয় বর্ষাবধি থাক, আমার কোন অসৎকার্য্যে প্রবৃত্তি আছে কিনা অনুসন্ধান কর,—তোমায় ঠকাইতে চাই কিনা দেখ,—অমনি মনে

মনে আন্দোলন করিব, আশ্চর্য্য করিয়াছে, সত্য এ ব্যক্তি সত্যবাদী বটে, কাঞ্চন-ত্যাগী, কেননা কাঞ্চনস্পর্শে ইহার শ্বাসরোধ হইয়া যায় দেখিয়াছি। অতি বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেও কোন ছল ধরিতে পারেন নাই। কামিনী-কটাক্ষ অন্তরে বিদ্ধ হয় না, বালকের ন্যায় সকলকেই মাতৃ-সম্বোধন করে, একি মিথ্যা কথা কহিতেছ? না, উহার ভ্রম হইয়াছে। অতি সরল প্রকৃতি বটে, কিন্তু ভ্রম—ভ্রম, বিদ্যাহীন—বিজ্ঞান পাঠ করে নাই, সুতরাং অন্ধবিশ্বাসে আবদ্ধ। সাধন-গুরু আবার অতি দীনভাবে বলিতে লাগিল, "তুমি মনে মনে এই সকল কথা আন্দোলন করিতেছ, আমার ভ্রম নয় বাপু!—আমার ভ্রম নয়। এখনও সেই জগৎ-ব্রহ্মময়ী মাতাকে আমি সম্মুখে দেখিতেছি, ঊর্দ্ধে-অধো মধ্যে-পূর্ণ দেখিতেছি, আমার বড় সাধ—তোমায় দেখাই, আমার কথা শুন, যাহাতে দেখিতে পাও, তাহার উপায় কর"—বলিতে বলিতে অশ্রুজল ঝরিতে লাগিল।

কি আশ্চর্য্য, আমার মনোভাব কিরূপে জানিল! এ ব্যক্তি তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, অনুমানে ধরিয়াছে। ভাল, আমার জন্য কাঁদে কেন? অশ্রুধারার আবার রকম আছে, আমাদের অশ্রু নাসিকার পাশ দিয়া বহে, ইহার অশ্রু চক্ষুর অপর পার্শ্ব দিয়া পড়িতেছে, ইহার কারণ কি? আমার ভালর নিমিত্ত ইহার এত গরজ কেন? যাহা হউক দেখা যাক্—ঈশ্বর দেখিয়াছি বলিতেছে, একটা প্রশ্ন করিলেই বিদ্যা-বুদ্ধি বোঝা যাইবে, দেখা যাক্। সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রশ্ন করা যাক্, যদি ঈশ্বরকে দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে সৃষ্টি কিরূপে হইয়াছে অবশ্যই বলিতে পারিবেন। 'ভাল, যদি ঈশ্বরকে দেখিয়া থাকেন, বলুন দেখি, সৃষ্টি কিরূপে হইয়াছে? সুচতুর বৈজ্ঞানিক মনে মনে ভাবিতেছেন—কেমন প্রশ্ন করিয়াছি, একেবারে' নীরব। এ মূর্খ' কোথা হইতে জানিবে যে বিকাশই সৃষ্টির কারণ। গুগ্‌লি, শামুক, কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, জন্তু, বানর—ক্রম-বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া মনুষ্য হইয়াছে, তাহা কি উপলব্ধি করিবার সম্ভাবনা? বিসমিল্লায় গলদ, সৃষ্টি কেহ করেন নাই, অতি ক্ষুদ্র চেতনাধার হইতে জীব সৃষ্টি হইয়াছে, বড় বড় বৈজ্ঞানিক ইহা সাব্যস্ত করিয়াছেন, তবে আর তাহার অন্যথা কি? কুঁভিয়ার লামার্ক (Convier Lamark) যাহা পেন্সিলে অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা ডারউইন্ (Darwiv) সাহেব বিংশতি বৎসর পরিশ্রম সহকারে চিত্র করিয়া সংশয় দূর করিয়াছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক জানেন না যে, কোটি কোটি বাইবেল-বিরোধী মত স্থাপিত হইলেও হিন্দু-দর্শনে আঘাত লাগিবে না।

ভূগর্ভে সময়ে প্রস্তরীকৃত বাদুরের অস্থি প্রথমেই হউক, কিম্বা পরেই হউক, স্থলজীব মধ্য-সময়েই হউক কিম্বা শেষেই হউক, জল-জীব প্রথমেই হউক, মধ্যেই হউক, শেষেই হউক, ভূগর্ভ খননে বৈজ্ঞানিক যাহাই নিরূপণ করুন, হিন্দুশাস্ত্রের বিরোধী হন না। সঙ্কোচ ও বিকাশ যাহাই প্রচলিত মত হউক, বাইবেল খণ্ডন করিতে পারিলে করিতে পারেন, কিন্তু বেদমূলক হিন্দুদর্শনে অখণ্ডনীয়। অতি বাষ্পীয় সৃষ্টি মতে অত্যুপ্ত পৃথিবী ধূম্রপুঞ্জ বিনির্গত করিয়া মেঘ সৃষ্টি করিয়াছিলেন—(যেরূপ এক্ষণে শনিগ্রহ করিতেছে), এবং ঐ প্রচুর ধূম্রপুঞ্জ মেঘে পরিণত হইয়া অনবরত বারিধারা

বর্ধন পূর্বক (যেমন একণে বৃহস্পতিতে হইতেছে), পৃথিবী শীতল করিয়া জীবের আবাস-উপযোগী করিয়াছেন, ঐ বরিধারা বারিষণে পৃথিবী জলময়ী হইয়াছিলেন, মহাপ্রলয়ে যেরূপ বর্ণিত কালের সৃষ্টি (অহং বহুস্যামি), এক প্রবল ইচ্ছা অপ্রতিহত প্রভাবে প্রবাহিত হইয়া সৃষ্টি করিতেছে। বিকাশবাদীরা বিকাশ হইয়াছে, সংস্থাপন করিয়াছেন ; কিন্তু কি শক্তি দ্বারা পরমাণু হইতে জগৎ বিকাশ হইয়াছে, কি শক্তি দ্বারা পরমাণুতে বিকাশ-শক্তি নিহিত তাহা নির্ধারিত করিতে পারেন না। হিকেল সাহেব জগতে চৈতন্য দ্বারা দৃষ্টি করেন না। ডারউইন সাহেব বিকাশ-মতের নেতা হইয়াও ঈশ্বরবাদী ছিলেন। ডারউইনের ঈশ্বরবাদের বিরোধী হইয়াও হিকেল সাহেব জড়পদার্থের সংযোগ-বিয়োগ-শক্তি দ্বারা বিকাশ-কার্য্য সম্পাদন করেন, কিন্তু কি শক্তি এই সংযোগ-বিয়োগ-শক্তির মূল, তাহা তিনি বলিতে পারেন না। কেবল একজাতীয় বাষ্পের অপর জাতীয় বাষ্পের সহিত আসক্তি ও বিরক্তি, ইহার কারণ বলিয়া থাকেন, কিন্তু অজ্ঞাত কোন শক্তির হাত কোন কৌশলে এড়াইতে পারেন না। উপরোক্ত পণ্ডিতবর ফগেজেরো সাহেব অতি সুযুক্তি সহকারে বলিতেছেন, "শক্তি কল্পিত হউক না কেন, যথা স্বভাব-সম্ভূত নির্বাচন (Natural Selection)[১] আসক্তিসম্ভূত নির্বাচন (Sexual Selection),[২] তাহাতে কোন অজ্ঞানিত শক্তি-সংযোগ ব্যতীত সৃষ্টি হইতে পারে না। অতএব যিনি বলেন যে, একমাত্র শক্তি জগতের সৃষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেছে, ঐ শক্তির দ্বারাই অসম্পূর্ণ সম্পূর্ণ হইতেছে, ক্রমে উন্নতির দিকে যাইতেছে, মানব-চৈতন্যে তাহা দৃষ্ট হইতেছে, সে শক্তি অচেতন কল্পনা করা তাঁহার নিজমত নিজে খণ্ডন ব্যতীত আর কি হইতে পারে? কারণ, যদি এ শক্তি চেতনশক্তি না হইত, তাহা হইলে বিশৃঙ্খল ঘটিত সন্দেহ নাই ; দিন দিন উন্নতি সাধন কিরূপে করিবে? দশটা ভাঙ্গিয়া গড়িতেছে, কিন্তু দশটাই ভাঙ্গুক, আর লক্ষ কোটিই ভাঙ্গুক, ভাঙ্গিয়া ক্রমে সুন্দর হইতে সুন্দরতর করিতেছে। যদি তুমি বিকাশ-শক্তিতে ঈশ্বর না দেখিয়া থাক, যে অজ্ঞানিত শক্তি, বিকাশ-শক্তিতে যোগ প্রদানে সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা চেতন নয় বলিতে পার না।" "অহং বহুস্যামি" এ ইচ্ছার প্রতিবাদ করিতে পার না।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে এইরূপ হউক, এদিকে সাধন-গুরু অচেতন, কাষ্ঠবৎ সংজ্ঞাহীন, চক্ষু স্পন্দহীন, মুখমণ্ডলে এক বিচিত্রভাবাপন্ন জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে ; একি মৃত না কি? না না, ক্রমে ক্রমে ভাবের পরিবর্ত্তন দেখি। এই যে চৈতন্য হইয়াছে, কিছু না, মূর্চ্ছাগত বাই আছে।—"মহাশয়, অমন অবস্থাপন্ন হইয়াছিলেন কেন?" সাধন-গুরুর উত্তর—"সৃষ্টির প্রকরণ জিজ্ঞাসা করায়, আমি ব্রহ্মযোনি দর্শনে অভিভূত হইয়াছিলাম, দেখিলাম :

---

১ যে সকল জীব স্বাভাবিক অবস্থার উপযোগী, সেই সকল জীবই জীবিত থাকে, এই নিমিত্ত বলিষ্ঠের অবস্থান ও দুর্বলের পতন ক্রিয়া 'স্বভাব-সম্ভূত-নির্ব্বাচন' বলিয়া ডারউইন সাহেব নির্ণয় করেন।

২ দেখিতে পাওয়া যায়, পশু পরস্পর পরস্পরের স্বর সৌন্দর্য্যে ও রূপ সৌন্দর্য্যে আকর্ষিত হয় ; এই আকর্ষণসম্ভূত উৎপত্তিকে ডারউইন সাহেব 'আসক্তি-সম্ভূত নির্ব্বাচন' নির্ণয় করেন।

এক রূপ অরূপ নাম বরণ
অতীত আগামী কালহীন,
দেশহীন সর্ব্বহীন 'নেতি নেতি' বিরাম যথায়,
তথা হ'তে বহে কারণ ধারা—
ধরিতে বাসনা বেশ উজারা
গরজি গরজি উঠে তার বারি
'অহং অহং' ইতি সর্ব্বক্ষণ ॥
কোটি চন্দ্র, কোটি তপন,
লভিয়ে সে সাগর জনম,
মহাঘোর রোলে ছাইল গগন,
করি দশদিক জ্যোতি মগন ॥
তাহে বহে কত জড়-জীব-প্রাণ
সুখ, দুঃখ, জরা, জনম-মরণ,
সেই সূর্য্য তারই কিরণ—
যেই সূর্য্য—সেই কিরণ ॥৩

গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

গুরুর প্রয়োজন

পরকাল চিন্তা করে না, এমন মনুষ্য নাই। মৃত্যুর পর কি হয়, এ চিন্তা সকলকেই ব্যাকুল করে। পরকাল নাই, একথা দৃঢ়রূপে বলিতে কেহ পারে না এবং পরকাল আছে, ইহা ঠিক ধারণা করা অতি অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটে। প্রায়ই সন্দেহ একেবারে দূর হয় না। পরকাল চিন্তা করিতে ঈশ্বরচিন্তা আসে; ঈশ্বর আছেন কি না—এ সম্বন্ধে নানা বাদানুবাদ মনে উঠিতে থাকে। একেবারে নাস্তিক প্রায় কেহ হয় না এবং ঠিক আস্তিকও অতি বিরল। এখানেও সন্দেহ। নাস্তিকেরা বলেন—ঈশ্বর আছেন, তাহার প্রমাণ পাই না।' বিষয় দুর্জ্ঞেয়, কালে কেহ প্রমাণ পাইলেও পাইতে পারে, কিন্তু উপস্থিত প্রমাণ নাই। কিন্তু প্রমাণ নাই বলিয়া, নিশ্চিত হওয়াও কঠিন। যিনি প্রমাণাভাব বলেন, তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, একবার কল্পনা করুন, কিরূপ প্রমাণ পাইলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার

৩ এই বৈদান্তিক-গীতিটি স্বামী বিবেকানন্দ-বিরচিত। রাগিণী খাম্বাজ—চৌতালে গেয়।
["সৌরভ" মাসিক পত্রিকায় (১ম খণ্ড, ২য় খণ্ড, ভাদ্র, ১৩০২ সাল) প্রথম প্রকাশিত]

করিবেন, তিনি সহজে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন না। অনেকেই চিন্তা না করিয়া বলিয়া দেন, যেমন চুনে-হলুদে মিশাইলে লাল হয়, তাহা মিশাইয়া প্রমাণ করা যায়; আগুনে পোড়ে—এরূপ যদি প্রমাণ পাই, তাহা হইলে বিশ্বাস করি। কিন্তু তিনি স্থিরচিত্ত হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, ঈশ্বর সম্বন্ধে এরূপ প্রমাণ হইতে পারে না। ঈশ্বর বলিলেই জড় হইতে স্বতন্ত্রবস্তু বুঝায়, জড় পরীক্ষায়, জড় সম্বন্ধে সত্য প্রকাশ পায়, সে প্রমাণে যাহা চৈতন্য স্বরূপ বলিয়া কল্পনা করি, তাহা প্রামাণ্য হইতে পারে না। জড় সম্বন্ধে কোন সত্যের প্রমাণ ইন্দ্রিয়ের অগোচর নয়। দেখিলাম, বৈদ্যুতিক শক্তিবলে সূচিকা নড়িল; বুঝিলাম, বৈদ্যুতিক শক্তিদ্বারা সূচিকা নড়ে; সূচিকা কি, জানি—বৈদ্যুতিক শক্তি কি, তাহাও কতক বুঝিয়াছি, কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে এমন কিছু জানা নাই। যদি বলেন, ঈশ্বরকে দেখিলে বিশ্বাস করি, তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, দেখা কাহাকে বলে? চোখে দেখিয়া?—স্পর্শে?—বা কিরূপ দেখিলে তিনি বিশ্বাস করেন? এক ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত আছে, চক্ষে দেখিয়া বিশ্বাস করিলেন, সে ব্যক্তি উপস্থিত। কিন্তু ঈশ্বর যদি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হন, তিনি কিরূপে বুঝিবেন—তিনি ঈশ্বর? কিরূপে ঈশ্বর বলিয়া তাঁহার ঠিক ধারণা হইবে? আমরা অসীম অনন্ত বলিয়া ঈশ্বরের উপাধি দিয়া থাকি। যাহা অনন্ত, তাহা চক্ষু বা স্পর্শ দ্বারা উপলব্ধি হইবে, একথা যুক্তিতে পরিহাসের বিষয়। তবে কিরূপ প্রমাণ আবশ্যক। যদি কল্পনা করেন যে, কল্য টেলিগ্রাফ আসুক যে, তাঁহার পুত্রকে রুশেরা 'জার' (Czar) পদে অভিষিক্ত করিয়াছে, তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর মানিবেন। এরূপ অসম্ভব ঘটনা সংঘটন হইলেও ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত হইল না; কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খলে এরূপ ঘটনা সংবদ্ধ ছিল, তাহা অনায়াসে যুক্তিদ্বারা সপ্রমাণ হইবে; যেহেতু অকারণে রুশেরা তাঁহার পুত্রকে সিংহাসনে বসাইবে না; কার্য্য হইলেই তাহার কারণ থাকিবে; মৃতব্যক্তি জীবিত হইয়া আসিলেও, প্রথমতঃ সে সত্য মরিয়াছিল কি না, তাহার প্রতি সন্দেহ; যাহারা তাহাকে মরিতে দেখিয়াছিল, তাহাদের প্রতি অবিশ্বাস; স্বয়ং যদি কেহ দেখিয়া থাকেন যে, এক ব্যক্তি মারিয়াছিল, সে আবার ফিরিয়া আসিয়াছে, তখনও তাহার মনে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবে যে, হয়তো মনে নাই। ইতিহাসে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যাহাকে মৃত বলিয়া সকলে জানিয়াছিল, যাহাকে গোর দিতে অনেকে দেখিয়াছিল, শেষ প্রমাণ হইল যে, সে মরে নাই। চটুকে নভেলে পিতামাতা, আত্মীয় সম্বন্ধে এরূপ কল্পনা অনেক আছে; পুরাবৃত্তে হঠাৎ একজনকে রাজা নির্ব্বাচন করার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। ঈশ্বর সাহায্য ব্যতীত রাজা হওয়াও অনেক স্থলে কল্পিত হইয়াছে; যেমন—আরব্যোপন্যাসে "আবুহোসেন" একদিন বাদশাহ হইয়াছিল।

এইরূপ শত শত অসম্ভব কল্পনা ফলবতী হইলেও ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ হইল না। যাদু, ভেল্‌কী, প্রাকৃতিক নিয়ম প্রভৃতি যুক্তি আসিয়া, যাহা পূর্ব্বে অসম্ভব অনুমিত হইয়াছিল, তাহা সম্ভব করিয়া দিবে। শুনা যায়, একবার নাকি জাহ্নবী জলশূন্য হইয়াছিল। এ ঘটনা ইতিহাসমূলক—এ ঘটনার সম্বন্ধেও প্রাকৃতিক নিয়ম

অনুসন্ধান করা হইয়াছিল। . যদিও কোন্ নিয়মে ইহা হইয়াছিল, তাহা কেহ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই, তথাপি যে, এই ঘটনায় "ঈশ্বরের ইচ্ছাই কারণ"—এ কথা কেহ বলেন নাই। অজ্ঞানিত প্রাকৃতিক ঘটনায় ইহা ঘটিয়াছে—ইহাই সকলের সিদ্ধান্ত। যত প্রকার অলৌকিক কার্য্য আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হউক না, সকলেরই কারণ অনুসন্ধান করি। অদ্ভুত কোন স্বপ্ন সত্যে পরিণত হইলে আমরা বলি, কোটি কোটি স্বপ্ন দেখি, তাহার মধ্যে একটা মিলিয়াছে, এইমাত্র। অসাধ্য রোগের আরোগ্য হেতু বিশ্বাস, কোন অলৌকিক দর্শনের হেতু মস্তিষ্কের বিকার। এই বৈজ্ঞানিক সময়ে বৈজ্ঞানিক কারণে এই সকল কার্য্য হইয়াছে, ইহাই স্থির করা যায়, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে যেরূপ সন্দেহ ছিল, সেইরূপ সন্দেহই থাকে।

তারপর এরূপ প্রমাণ চাওয়া অসঙ্গত। ঈশ্বর তাঁহার অস্তিত্বের প্রমাণ দিবার নিমিত্ত ব্যাকুল নন। যদি এরূপ প্রমাণ দিতে তিনি সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকেন, তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর নন। বরং যাঁহাদের কাছে তিনি এরূপ প্রমাণ দেন, তাঁহারা তাঁর ঈশ্বর। মোট কথা এই বুদ্ধি দ্বারা এরূপ প্রমাণ কল্পিত হইতে পারে না, যাহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। প্রশ্ন হইতে পারে যে যাহা অসিদ্ধ, তাহা মানিব কেন? শাস্ত্র বলেন যে, মনোবুদ্ধির অগোচর ঈশ্বর, ভক্তের গোচর হন। শাস্ত্র-বাক্য বিশ্বাস করিয়া যে মহাপুরুষ শাস্ত্রসঙ্গত অনুষ্ঠান করিয়াছেন—তিনি বলেন, আমি ঈশ্বর পাইয়াছি। কেবল তিনি পাইয়াছেন, তাহা নয়, তিনি মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করেন যে, ঈশ্বরলুব্ধ ব্যক্তি মাত্রেই, নিঃসন্দেহ ঈশ্বর লাভ করিবে। দেখা যায়, সে মহাপুরুষ নিষ্কাম, অথচ সাধারণ সকাম ব্যক্তির ন্যায় দ্বারে দ্বারে এ কথা প্রচার করিয়া থাকেন। তর্কের নিমিত্ত, ঈশ্বর আছেন স্বীকার করিলে, যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি অতি নির্ম্মল হইবেন, কল্পনা করা যায়। বস্তুতঃ দেখা গিয়াছে যে, যিনি ঈশ্বর আছেন প্রচার করেন, তাঁহার চরিত্র অতি নির্ম্মল। যাঁহার ঈশ্বর লাভ হইয়াছে, তাঁহার সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় হওয়া উচিত। বাস্তবিক প্রচারক ও সত্যবাদী এবং জিতেন্দ্রিয়, —ইহা শত পরীক্ষায় দেখা যায়। প্রাকৃতিক নিয়মে যাহা জানিবার সম্ভাবনা নাই, এই মহাপুরুষ সমাধিস্থ হইয়া, সেই ভূত-ভবিষ্যৎ-বৃত্তান্ত অনায়াসে জানিতে পারেন। ইহারও শত পরীক্ষায় শত শত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। শাস্ত্রে ঈশ্বরলব্ধ ব্যক্তির যে সকল লক্ষণ আছে, সেই সকল এই মহাপুরুষে প্রকাশ। অবশ্য এ কথা বলিতেছি না যে, ইহা দ্বারা ঈশ্বরের প্রমাণ পাইলাম, কিন্তু ঈশ্বর অসিদ্ধ, তাহা সাব্যস্ত করিবার বিশেষ বাধা জন্মিল।

এক্ষণে সন্দিহানচিত্ত মনুষ্যের কি উপায় অবলম্বন করা উচিত? ঈশ্বর আছেন কি না, যাঁহার জানিবার সাধ, তাঁহার কর্ত্তব্য কি? সদ্যুক্তি অবশ্য বলিবে, এই মহাপুরুষের আশ্রিত হও। যদি ঈশ্বর চাও, এই গুরুর আনুগত্য ভিন্ন আর উপায় নাই। তিনি যাহা বলেন, তাহাই করো, তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলে, তিনি কোন নীতি-বিরুদ্ধ কথা বলেন না। যে সকল আচার অবলম্বন করিতে তিনি আদেশ দেন, তাহাতে মানব-হৃদয় অতি উচ্চ হয়। তিনি সত্যবাদী হ'তে বলেন, জিতেন্দ্রিয় হ'তে

বলেন, হিংসাদ্বেষাদি পরিহার করিতে বলেন, নির্ম্মল চরিত্র হইয়া ঈশ্বরের ধ্যান করিতে বলেন, এবং দৃঢ় করিয়া বলেন—এই সকল অনুষ্ঠানে, নিশ্চয় ঈশ্বরলাভ হইবে। সত্যই যিনি ঈশ্বর লাভ করিতে চান, তিনি এই গুরুকে শত প্রণাম করিয়া তাঁহার উপদেশ-মত ব্রতী হইবেন নিশ্চয়। গুরু বলেন, 'এইরূপ অনুষ্ঠানে তোমার সন্দেহ দূর হইবে, স্বয়ং ঈশ্বর তোমার সন্দেহ দূর করিয়া দিবেন।' গুরু বলেন—"আমার সন্দেহ তিনি দূর করিয়াছেন।"

সন্দিহান চিত্ত আপত্তি করিতে পারে, এ মহাপুরুষ অতি উচ্চ ব্যক্তি সত্য, কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে ইনি তো ভ্রমে পড়েন নি? যেমন কি-না-কি একটা দেখিয়া লোকে বলে, ভূত দেখিয়াছে—ইঁহার তো সে অবস্থা নয়? এ আপত্তির উত্তর একটি আছে—মনোবুদ্ধির অগোচর পরমাত্মাকে আত্মার দ্বারা উপলব্ধি করাই সম্ভব। এই মহাত্মা আত্মাতে পরমাত্মা অনুভব করিয়াছেন। আমাদের অন্তরে যাহা হইতেছে, তাহা আমরা অনুভব করি এবং তাহা ভুল নয়। ক্রোধ হইয়াছে, আমরা জানিতে পারি—ভুল নয়। দয়ার উদ্রেক হইয়াছে, তাহা জানিতে পারি—ভুল নয়। তবে যে, গুরু বলিতেছেন, অসীম অনন্ত ঈশ্বর তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত, তিনি অনুভব করিয়াছেন, সত্যসেবী মহাপুরুষের কি সেইটি ভুল? সন্দেহ নির্মূল না হইতে পারে, কিন্তু এরূপ চিন্তায় সন্দেহের বেশী জোর থাকে না, ইচ্ছা আপনি উদয় হয়—এই মহাপুরুষের অনুসরণ করি। শাস্ত্রে বলে, ঈশ্বর লাভ হয়। ইনি বলেন, লাভ করিয়াছি। শাস্ত্র কত পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, সেই শাস্ত্র-বাক্য ইঁহার জীবনে পরীক্ষিত। অতএব নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তি বুঝিবে যে, গুরুপাদপদ্ম ব্যতীত, আমার আর উপায় নাই।[১]

ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব

বহুদিন পূর্ব্বে "Indian Miror"-এ দেখিয়াছিলাম যে, দক্ষিণেশ্বরে একজন পরমহংস আছেন, তথায় স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের সশিষ্যে গতিবিধি আছে। আমি হীনবুদ্ধি, ভাবিলাম যে, ব্রাহ্মরা যেমন হরি, মা প্রভৃতি বলা আরম্ভ করিয়াছে, সেইরূপ এক পরমহংসও খাড়া করিয়াছে। হিন্দুরা যাঁহাকে পরমহংস বলে, সে পরমহংস ইনি নন। তাহার পর কিছুদিন বাদে শুনিলাম, আমাদের বসুপাড়ায় ৺দীননাথ বসুর বাড়ীতে পরমহংস আসিয়াছেন; কৌতূহল বশতঃ দেখিতে যাইলাম—কিরূপ পরমহংস। তথায় যাইয়া শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা লইয়া আসিলাম। দীননাথবাবুর বাড়ীতে যখন আমি উপস্থিত হই, তখন পরমহংস কি উপদেশ দিতেছেন ও কেশববাবু

১ ['উদ্বোধন' পাক্ষিকপত্রে (১০ই ভাদ্র, ১৩০৯ সাল, ৪র্থ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা) প্রথম প্রকাশিত]

প্রভৃতি তাহা আনন্দ করিয়া শুনিতেছেন। সন্ধ্যা হইয়াছে, একজন সেজ জ্বালিয়া আনিয়া পরমহংসদেবের সম্মুখে রাখিল। তখন পরমহংস পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন,—"সন্ধ্যা হইয়াছে?" আমি এই কথা শুনিয়া ভাবিলাম, 'ঢং দেখ, সন্ধ্যা হইয়াছে, সম্মুখে সেজ জ্বলিতেছে, তবু ইনি বুঝিতে পারিতেছেন না যে, সন্ধ্যা হইয়াছে কি না!' আর কি দেখিব, চলিয়া আসিলাম।

ইহার কয়েক বৎসর পরে রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটস্থ ৺বলরাম বসুর ভবনে পরমহংদেব আসিবেন। সাধুত্তম বলরাম তাঁহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত পাড়ার অনেককেই নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আমারও নিমন্ত্রণ হইয়াছিল—দর্শন করিতে গেলাম। দেখিলাম পরমহংসদেব আসিয়াছেন, বিধুকীর্ত্তনী তাঁহাকে গান শুনাইবার জন্য নিকটে আছে। বলরামবাবুর বৈঠকখানায় অনেক লোক-সমাগম হইয়াছে। পরমহংসদেবের আচরণে আমার একটু চমক হইল। আমি জানিতাম, যাঁহারা পরমহংস ও যোগী বলিয়া আপনাকে পরিচয় দেন, তাঁহারা কাহারও সহিত কথা কন না, কাহাকেও নমস্কার করেন না; তবে কেহ যদি অতি সাধ্যসাধনা করে, পদসেবা করিতে দেন। এ পরমহংসের ব্যাপার সম্পূর্ণ বিপরীত। অতি দীনভাবে পুনঃ পুনঃ মস্তক ভূমি স্পর্শ করিয়া নমস্কার করিতেছেন। এক ব্যক্তি আমার পূর্ব্বের ইয়ার, তিনি পরমহংসকে লক্ষ্য করিয়া ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, "বিধু ওঁর পূর্ব্বের আলাপী, তার সঙ্গে রঙ্গ হ'চ্চে।" কথাটা আমার ভাল লাগিল না। এমন সময় অমৃতবাজার পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষ উপস্থিত হইলেন। পরমহংসদেবের প্রতি তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা বোধ হইল না। তিনি বলিলেন, "চল, আর কি দেখবে?" আমার ইচ্ছা ছিল, আরো কিছু দেখি, কিন্তু তিনি জেদ করিয়া আমায় সঙ্গে লইয়া আসিলেন। এই আমার দ্বিতীয় দর্শন।

আবার কিছুদিন যায়, ষ্টার থিয়েটারে (৬৮নং বিডন ষ্ট্রীট) "চৈতন্যলীলা"র অভিনয় হইতেছে, আমি থিয়েটারে বাহিরের compound-এ বেড়াইতেছি, এমন সময়ে মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক একজন ভক্ত (এক্ষণে তিনি স্বর্গগত) আমায় বলিলেন "পরমহংসদেব থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছেন, তাঁহাকে বসিতে দাও ভাল, নচেৎ টিকিট কিনিতেছি।" আমি বলিলাম, "তাঁহার টিকিট লাগিবে না, কিন্তু অপরের টিকিট লাগিবে।" এই বলিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইতেছি,—দেখিলাম, তিনি গাড়ী হইতে নামিয়া থিয়েটারের compound-এর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন; আমি না নমস্কার করিতে করিতে তিনি আগে নমস্কার করিলেন, আমি নমস্কার করিলাম, পুনর্ব্বার তিনি নমস্কার করিলেন, আমি আবার নমস্কার করিলাম, পুনর্ব্বার তিনিও নমস্কার করিলেন। আমি ভাবিলাম, এইরূপই তো দেখিতেছি চলিবে। আমি মনে মনে নমস্কার করিয়া তাঁহাকে উপরে লইয়া আসিয়া একটি Box-এ বসাইলাম ও একজন পাখাওয়ালা নিযুক্ত করিয়া দিয়া শরীরের অসুস্থতা বশতঃ বাড়ী চলিয়া আসিলাম। এই আমার তৃতীয় দর্শন।

আমার চতুর্থ দর্শন বিবৃত করিবার পূর্ব্বে আমার নিজের অবস্থা বলা প্রয়োজন।

আমাদের পঠদ্দশায় যাঁহারা "Young Bengal" নামে অভিহিত হইতেন, তাঁহারাই সমাজে মান্যগণ্য ও বিদ্বান্ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। বাঙ্গালায় ইংরাজী-শিক্ষার তাহারাই প্রথম ফল। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জড়বাদী, অল্পসংখ্যক ক্রিশ্চিয়ান হইয়া গিয়াছেন এবং কেহ কেহ ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা তাঁহাদের মধ্যে প্রায় কাহারও ছিল না বলিলেও বলা যায়। সমাজে যাঁহারা হিন্দু ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ, শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব চলে এবং বৈষ্ণব সমাজ এমন নানা শ্রেণীতে বিভক্ত যে, পরস্পর পরস্পরের প্রতিবাদী। ইহা ব্যতীত অন্যান্য মতও প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক মতেই অপর মতাবলম্বীর নরক-ব্যবস্থা। ইহার উপর অনেক যাজক ব্রাহ্মণ ভ্রষ্টাচার হইয়াছেন। সত্যনারায়ণের পুঁথি লইয়া শ্রাদ্ধ করেন, মেটে দেওয়ালে পাইখানার ঘটী হইতে জল দিয়া গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা ধারণ করেন। তাহার উপর ইংরাজীও দু'পাতা পড়িয়াছে, কালাপাহাড় জগন্নাথ ভাঙ্গিয়াছে প্রভৃতি। আবার জড়বাদীরা বুদ্ধি-বিদ্যায় সকলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য, ঈশ্বর না-মানা বিদ্যার পরিচয়, এ অবস্থায় স্বধর্ম্মের প্রতি আস্থা কিছুমাত্র রহিল না; কিন্তু মাঝে মাঝে ঈশ্বর লইয়া সমবয়স্ক বন্ধুর সহিত তর্ক-বিতর্কও চলে; আদি-সমাজেও কখনও কখনও যাওয়া-আসা করি, একটি ব্রাহ্মসমাজও পাড়ায় কাছে ছিল, সেখানেও মাঝে মাঝে যাই। কিন্তু কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ঈশ্বর আছেন কি না সন্দেহ, যদি থাকেন, কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী হওয়া উচিত? নানা তর্কবিতর্ক করিয়া কিছু স্থির হইল না, ইহাতে মনের অশান্তি হইতে লাগিল। একদিন প্রার্থনা করিলাম, 'ভগবান্, যদি থাকো, আমায় পথ নির্দ্দেশ করিয়া দাও।' ইহার কিছুদিন পরেই দাম্ভিকতা আসিল। ভাবিলাম, জল-বায়ু-আলো—ইহজীবনের যাহা প্রয়োজন, তাহা অর্জ্জন রহিয়াছে; তবে ধর্ম্ম, যাহা অনন্ত-জীবনের প্রয়োজন, তাহা এত খুঁজিয়া লইতে হইবে কেন? সমস্তই মিথ্যা কথা; জড়বাদীরা বিদ্বান—বিজ্ঞ, তাঁহারা যে-কথা বলেন, সেই কথাই ঠিক। ধর্ম্মের আন্দোলন বৃথা; এইরূপ তমাচ্ছন্ন হইয়া চতুর্দ্দশ বর্ষ অতিবাহিত হইল। পরে দুর্দ্দিন আসিয়া ঠিক নিশ্চিন্ত থাকিতে দিল না। দুর্দ্দিনের তাড়নায় চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিয়া ভাবিতে লাগিলাম, বিপদ-মুক্ত হইবার কোনও উপায় আছে কি? দেখিয়াছি, অসাধ্য রোগ হইলে তারকনাথের শরণাপন্ন হইয়া থাকে, আমারও তো কঠিন বিপদ; একরূপ উদ্ধার হওয়া অসাধ্য, এ সময়ে তারকনাথকে ডাকিলে কিছু হয় কি? পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্। শরণাপন্ন হইবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু সেই চেষ্টাই সফল হইল, বিপজ্জাল অচিরে ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিল—দেবতা মিথ্যা নয়। বিপদ হইতে তো মুক্ত হইলাম, কিন্তু আমার পরকালের উপায় কি? আবার মনোমধ্যে ঘোর দ্বন্দ্ব, কোন্ পথ অবলম্বন করি? তারকনাথের মহিমা দেখিয়াছি, তারকনাথকেই ডাকি। ক্রমে দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বাস জন্মিতে লাগিল, কিন্তু সকলেই বলে যে, গুরু ব্যতীত উপায় নাই। ভাবিলাম, কেন উপায় নাই? এই তো ঈশ্বরের নাম রহিয়াছে, ঈশ্বরকে ডাকিলে কেন উপায় হইবে না?

কিন্তু সকলেই বলে, গুরু ব্যতীত উপায় হয় না। তবে গুরু কাহাকে করিব? শুনিতে পাই, গুরুকে ঈশ্বর জ্ঞান করিতে হয়; কিন্তু আমার ন্যায় মনুষ্যকে ঈশ্বর জ্ঞান কিরূপে করি? মন অতি অশান্তিপূর্ণ হইল। মনুষ্যকে গুরু করিতে পারি না।

"গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুঃ গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥"

এই বলিয়া গুরুকে প্রণাম করিতে হয়। সামান্য মানুষকে দেখিয়া ভণ্ডামি কিরূপে করিব? ঈশ্বরের নিকট অকপট-হৃদয়ের প্রয়োজন, গুরুর সহিত ঘোর কপটতা করিয়া কিরূপে তাঁহাকে পাইব? যাক, আমার গুরু হইবে না। বাবা তারকনাথের নিকট প্রার্থনা করি, যদি গুরুর একান্ত প্রয়োজন হয়, তিনি কৃপা করিয়া আমার গুরু হোন। শুনিয়াছিলাম, নরবেশ ধরিয়া কখনো কখনো মহাদেব মন্ত্র দিয়া থাকেন। যদি আমার প্রতি তাঁহার এরূপ কৃপা হয়, তবেই। নচেৎ আমি নিরুপায়। কিন্তু তারকনাথের তো কই দেখা পাই না, তবে আর কি করিব? প্রাতে একবার ঈশ্বরের নাম করিব, তারপর যা হয় হইবে। এ সময়ে একজন চিত্রকরের সঙ্গে আমার আলাপ হয়, তিনি একজন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ছিলেন, সত্য হোক, আর মিথ্যা হোক, একদিন তিনি আমায় বলিলেন, "আমি প্রত্যহ ভগবানকে ভোগ দিই, তিনি গ্রহণ করেন, কখনো কখনো রুটিতে দাঁতের দাগ থাকে, কিন্তু এ ভাগ্য গুরুর নিকট উপদিষ্ট না হইলে হয় না।" আমার মন বড়ই ব্যাকুল হইল। তাহার নিকট হইতে চলিয়া গিয়া ঘরে দোর বন্ধ করিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। এ ঘটনার তিন দিন পরে আমি কোন কারণ বশতঃ আমাদের পাড়ার চৌরাস্তায় একটি রকে বসিয়া আছি, দেখিলাম চৌরাস্তার পূর্বদিক হইতে নারায়ণ, আর দুই একটি ভক্ত সমভিব্যাহারে পরমহংসদেব ধীরে ধীরে আসিতেছেন। আমি তাঁহার দিকে চক্ষু ফিরাইবামাত্র তিনি নমস্কার করিলেন। সেদিন আমি নমস্কার করায় পুনর্ব্বার নমস্কার করিলেন না। আমার সম্মুখ দিয়া ধীরে ধীরে চৌমাথার দক্ষিণ দিকের রাস্তায় চলিলেন। তিনি যাইতেছেন—আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন অজানিত সূত্রের দ্বারা আমার বক্ষঃস্থল তাঁহার দিকে কে টানিতেছে। তিনি কিছুদূর গিয়াছেন, আমার ইচ্ছা হইল, তাঁহার সঙ্গে যাই। এমন সময় তাঁহার নিকট হইতে আমায় একজন ডাকিতে আসিলেন, কে, আমার স্মরণ হইতেছে না। তিনি বলিলেন, "পরমহংসদেব ডাকিতেছেন।" আমি চলিলাম, পরমহংসদেব ৺বলরামবাবুর বাটীতে উঠিলেন, আমিও তাঁহার পশ্চাতে গিয়া বৈঠক-খানায় উপস্থিত হইলাম। (তৎকালে বলরামবাবু দেহ পরিত্যাগ করেন নাই।) বলরামবাবু বৈঠকখানায় শুইয়াছিলেন, বোধ হইল পীড়িত, পরমহংসদেবকে দেখিবামাত্র সসম্ভ্রমে উঠিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। বসিয়া বলরামবাবুর সহিত দুই একটি কথা বলিবার পর পরমহংসদেব হঠাৎ উঠিয়া, "বাবু আমি ভাল আছি—বাবু আমি ভাল আছি।"—বলিতে বলিতে কিরূপ এক অবস্থাগত হইলেন। তাহার পর বলিতে লাগিলেন—"না না,—ঢং নয়—ঢং নয়।" অল্প সময় এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া পুনরায় আসন গ্রহণ করিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'গুরু কি?' তিনি বলিলেন,

"গুরু কি জান, যেন ঘটক।" আমি ঘটক কথা ব্যবহার করিতেছি, তিনি এই অর্থে অন্ত কথা ব্যবহার করিয়াছিলেন। আবার বলিলেন, "তোমার গুরু হ'য়ে গেছে।" 'মন্ত্র কি?' জিজ্ঞাসা করাতে বলিলেন, "ঈশ্বরের নাম।" দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতে লাগিলেন, "রামানুজ প্রত্যহই গঙ্গাস্নান করিতেন। ঘাটের সিঁড়িতে 'কবীর' নামে এক জোলা শুইয়াছিল। রামানুজ নামিতে নামিতে তাঁহার শরীরে পাদস্পর্শ করায় সবল দেহে ঈশ্বরের অস্তিত্ব জ্ঞানে 'রাম' শব্দ উচ্চারণ করিলেন। সেই রাম নাম কবীরের মন্ত্র হইল; আর সেই নাম জপ করিয়া কবীরের সিদ্ধিলাভ হইল।" থিয়েটারেরও কথা পড়িল। তিনি বলিলেন,—"আর একদিন আমায় থিয়েটার দেখাইও।" আমি উত্তর করিলাম, "যে আজ্ঞে, যেদিন ইচ্ছা দেখিবেন।" তিনি বলিলেন, "কিছু নিও।" আমি বলিলাম, 'ভালো, আট আনা দিবেন।' পরমহংসদেব বলিলেন,—"সে বড় ব্যাজলা জায়গা।" আমি উত্তর করিলাম, 'না, আপনি সেদিন যেখানে বসেছিলেন, সেইখানে বসবেন।' তিনি বলিলেন, "না, একটি টাকা নিও।" আমি 'যে আজ্ঞে' বলায় এ কথা শেষ হইল।

বলরামবাবু তাঁহার ভোগের নিমিত্ত কিছু মিষ্টান্ন আনাইলেন। তিনি একটি সন্দেশ হইতে কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিলেন মাত্র। অনেকেই প্রসাদ ধারণ করিলেন। আমারও ইচ্ছা ছিল, কে কি বলিবে, লজ্জায় পারিলাম না। ইহার কিছুক্ষণ পরেই হরিপদ নামে এক ভক্তের সহিত পরমহংসদেবকে প্রণাম করিয়া বলরামবাবুর বাটী হইতে বাহির হইলাম। পথে হরিপদ আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখিলেন?" আমি বলিলাম 'বেশ ভক্ত।' তখন আমার মনে খুব আনন্দ হইয়াছে, গুরুর জন্মে হতাশ আর নাই। ভাবিতেছি, গুরু করিতে হয় মুখে বলে। এই তো পরমহংস বলিলেন, আমার গুরু হ'য়ে গিয়েছে, তবে আর কার কথা শুনি?

যে কারণে মনুষ্যকে গুরু করিতে অনিচ্ছুক ছিলাম, তাহা একরূপ বলিয়াছি, কিন্তু এখন বুঝিতেছি যে, আমার মনের প্রবল দম্ভ থাকায় আমি গুরু করিতে চাহি নাই। ভাবিতাম—এত কেন? গুরুও মানুষ, শিষ্যও মানুষ, তাঁহার নিকট জোড়হাত করিয়া থাকিবে, পদসেবা করিবে, তিনি যখন যাহা বলিবেন, তখন তাহা যোগাইবে, এ একটা আপদ জোটান মাত্র। পরমহংসদেবের নিকট এই দম্ভ চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। থিয়েটারে প্রথমেই তিনি আমায় নমস্কার করিলেন, তাহার পর রাস্তায়ও আমায় প্রথম নমস্কার করিলেন। তিনি যে নিরহঙ্কার ব্যক্তি, আমার ধারণা জন্মিল এবং আমার অহঙ্কারও খর্ব্ব হইল। তাঁহার নিরহঙ্কারিতার কথা আমার মনে দিন দিন উঠে। বলরামবাবুর বাটীর ঘটনার কিছুদিন পরে আমি থিয়েটারের সাজ-ঘরে বসিয়া আছি, এমন সময় শ্রদ্ধাস্পদ ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় ব্যস্ত হইয়া আসিয়া আমায় বলিলেন, "পরমহংসদেব আসিয়াছেন।" আমি বলিলাম, 'ভাল, Box-এ লইয়া গিয়া বসান।' দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আপনি অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিবেন না?" আমি বিরক্ত হইয়া বলিলাম, 'আমি না গেলে তিনি আর গাড়ী থেকে নামতে পারবেন না!' কিন্তু গেলেম। আমি পঁহুছিয়াছি, এমন সময় তিনি গাড়ী হইতে

নামিতেছেন। তাঁহার মুখপদ্ম দেখিয়া আমার পাষাণ-হৃদয়ও গলিল। আপনাকে ধিক্কার দিলাম, সে ধিক্কার এখনও আমার মনে জাগিতেছে। ভাবিলাম, এই পরমশান্ত ব্যক্তিকে আমি অভ্যর্থনা করিতে চাহি নাই? উপরে লইয়া যাইলাম। তথায় শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলাম। কেন যে করিলাম, তাহা আমি আজও বুঝিতে পারি না। আমার ভাবান্তর হইয়াছিল নিশ্চয়, আমি একটি প্রস্ফুটিত গোলাপ ফুল লইয়া তাহাকে দিলাম। তিনি গ্রহণ করিলেন, কিন্তু আমায় ফিরাইয়া দিলেন, বলিলেন,—"ফুলের অধিকার দেবতার আর বাবুদের, আমি কি করিব?" Dress Circle-এর দর্শকের, Concert-এর সময় বসিবার জন্য Star Theatre-এর দ্বিতলে, স্বতন্ত্র একটি কামরা ছিল। সেই কামরায় পরমহংসদেব আসিলেন। অনেকগুলি ভক্ত তাঁহার সহিত আসিলেন। পরমহংসদেব একখানি চৌকিতে বসিলেন, আমিও অপর এক চৌকিতে বসিলাম। কিন্তু দেবেনবাবু প্রভৃতি ভক্তেরা অপর চৌকি থাকা সত্ত্বেও বসিতেছেন না। দেবেনবাবুর সহিত আলাপ ছিল। আমি পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলাম, 'বসুন না।' কিন্তু তিনি অসম্মত। কারণ বুঝিতে পারিলাম না। আমার এতদূর মূঢ়তা ছিল যে, গুরুর সহিত সম আসনে বসিতে নাই, ইহা আমি জানিতাম না। পরমহংসদেব আমার সহিত নানা কথা কহিতে লাগিলেন। আমার বোধ হইতে লাগিল যে, কি একটা স্রোত যেন আমার মস্তক অবধি উঠিতেছে ও নামিতেছে। ইতিমধ্যে তিনি ভাবনিমগ্ন হইলেন। একটি বালকভক্তের সহিত ভাবাবস্থায় যেন ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বহুপূর্ব্বে আমি দুর্দ্দান্ত পাষণ্ডের নিকট পরমহংসদেবের নিন্দা শুনিয়াছিলাম, এই বালকের সহিত এইরূপ ক্রীড়া দেখিয়া আমার সেই নিন্দার কথা মনে উঠিল। পরমহংসদেবের ভাব ভঙ্গ হইল। তিনি আমায় লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"তোমার মনে বাঁক (আড়) আছে।" আমি ভাবিলাম, অনেক প্রকার বাঁক তো আছেই বটে, কিন্তু তিনি কোন্ বাঁক লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"বাঁক যায় কিসে?" পরমহংসদেব বলিলেন,—"বিশ্বাস করো।"

আবার কিছুদিন গত হইল, আমি বেলা তিনটায় সময় থিয়েটারে আসিয়াছি, একটু চিরকুট পাইলাম যে, মধু রায়ের গলিতে রামচন্দ্র দত্তের ভবনে পরমহংসদেব আসিবেন। পড়িবামাত্র আমাদের পাড়ার চৌরাস্তায় বসিয়া আমার হৃদয়ে যেরূপ টান পড়িয়াছিল, সেইরূপ টান পড়িল। আমি যাইতে ব্যস্ত হইলাম, কিন্তু আবার ভাবিতে লাগিলাম যে, অজানিত বাটীতে বিনা নিমন্ত্রণে কেন যাইব? ঐ অজানিত সূত্রের টানে সে বাধা রহিল না। চলিলাম, অনাথবাবুর বাজারের নিকটে গিয়া ভাবিলাম, যাইব না। ভাবিলে কি হয়, আমায় টানিতেছে। ক্রমে অগ্রসর হই আর থামি। রামবাবুর গলির মোড়ে গিয়াও থামিলাম। পরে রামবাবুর বাড়ী গিয়া পঁহুছিলাম। দোরে রামবাবু বসিয়া আছেন। ভক্তচূড়ামণি সুরেন্দ্রনাথ মিত্রও ছিলেন। সুরেন্দ্রবাবু আমায় স্পষ্টই জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন আমি তথায় গিয়াছি? আমি বলিলাম, 'পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে।' রামবাবুর বাড়ীর

নিকটেই সুরেন্দ্রবাবুর বাটী। তিনি তথায় আমায় লইয়া গেলেন এবং তিনি কিরূপে পরমহংসদেবের কৃপা পাইয়াছেন, তাহা আমায় বলিতে লাগিলেন। আমার সে কথা ভাল লাগিল না। আমি তাঁহারই সহিত রামবাবুর বাটীতে ফিরিয়া আসিলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, রামবাবুর উঠানে রামবাবু খোল বাজাইতেছেন, পরমহংসদেব নৃত্য করিতেছেন, ভক্তেরাও তাঁহাকে বেড়িয়া নৃত্য করিতেছেন। গান হইতেছে,—"নদে টল্‌মল্‌ টল্‌মল্‌ করে গৌর-প্রেমের হিল্লোলে।" আমার বোধ হইতে লাগিল, সত্যই যেন রামবাবুর আঙ্গিনা টল্‌মল্‌ করিতেছে! আমার মনে খেদ হইতে লাগিল, এ আনন্দ আমার ভাগ্যে ঘটিবে না। চক্ষে জল আসিল। নৃত্য করিতে করিতে পরমহংসদেব সমাধিস্থ হইলেন, ভক্তেরা পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন, আমার ইচ্ছা হইল, গ্রহণ করি, কিন্তু লজ্জায় পারিলাম না, তাঁহার নিকটে গিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলে কে কি মনে করিবে। আমার মনে যে মুহূর্ত্তে এইরূপ ভাবের উদয় হইল, তৎক্ষণাৎ পরমহংসদেবের সমাধি ভঙ্গ হইল ও নৃত্য করিতে করিতে ঠিক আমার সম্মুখে আসিয়া সমাধিস্থ হইলেন। আমার আর চরণস্পর্শের বাধা রহিল না। পদধূলি গ্রহণ করিলাম। সংকীর্ত্তনের পর পরমহংসদেব রামবাবুর বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। আমিও উপস্থিত হইলাম। পরমহংসদেবের আমারই সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'আমার মনের বাঁক যাইবে তো?' তিনি বলিলেন, "যাইবে।" আমি আবার ঐ কথা বলিলাম। তিনি ঐ উত্তর দিলেন। আমি পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলাম, পরমহংসদেবও ঐ উত্তর দিলেন। কিন্তু মনোমোহন মিত্র নামে একজন পরমহংসদেবের পরম ভক্ত কিঞ্চিৎ রূঢ়স্বরে আমায় বলিলেন,—"যাও না, উনি বল্‌লেন, আর কেন ওঁকে ত্যক্ত ক'চ্ছ?" এরূপ কথার উত্তর না দিয়া আমি ইতিপূর্ব্বে কখনও ক্ষান্ত হই নাই। মনোমোহন বাবুর পানে ফিরিয়া চাহিলাম, কিন্তু ভাবিলাম—ইনি সত্যই বলিয়াছেন; যাঁহার এক কথায় বিশ্বাস নাই, তিনি শতবার বলিলেও তো তাঁহার কথা বিশ্বাসের যোগ্য নয়। আমি পরমহংসদেবকে প্রণাম করিয়া থিয়েটারে ফিরিলাম। দেবেনবাবু কিয়দ্দূর আমার সঙ্গে আসিলেন ও পথে অনেক কথা বুঝাইয়া আমায় দক্ষিণেশ্বরে যাইতে পরামর্শ দিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইলাম। উপস্থিত হইয়া দেখি, তিনি দক্ষিণ দিকের বারাণ্ডায় একখানি কম্বলের উপর বসিয়া আছেন, অপর একখানি কম্বলে ভবনাথ নামে একজন পরমভক্ত বালক বসিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছেন। আমি যাইয়া পরমহংসদেবের পাদপদ্মে প্রণাম করিলাম। মনে মনে "গুরুর্ব্রহ্মা" ইত্যাদি—এই স্তবটিও আবৃত্তি করিলাম। তিনি আমায় বসিতে আদেশ করিলেন এবং বলিলেন, "আমি তোমার কথাই বলিতেছিলাম; মাইরি, একে জিজ্ঞাসা করো।" পরে কি উপদেশের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। আমি তাঁহাকে বাধা দিয়া বলিলাম, "আমি উপদেশ শুনিব না, আমি অনেক উপদেশ লিখিয়াছি, তাহাতে কিছু হয় না। আপনি যদি আমার কিছু করিয়া দিতে পারেন, করুন।" এ কথায় তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। রামলাল দাদা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাকে বলিলেন,

"কি রে—কি শ্লোকটা, বল তো?" রামলাল দাদা শ্লোকটি আবৃত্তি করিলেন,—শ্লোকের ভাব,—পর্ব্বতগহ্বরে নির্জ্জনে বসিলেও কিছু হয় না, বিশ্বাসই পদার্থ। আমার তখন মনে হইতেছে—আমি নির্ম্মল। আমি ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম —'আপনি কে?' আমার জিজ্ঞাসার অর্থ এই যে, আমার ন্যায় দাম্ভিকের মস্তক কাহার চরণে অবনত হইল! এ কাহার আশ্রয় পাইলাম—যে আশ্রয়ে আমার সমুদয় ভয় দূর হইয়াছে? আমার প্রশ্নের উত্তরে পরমহংসদেব বলিলেন,—"আমায় কেউ কেউ বলে—আমি রামপ্রসাদ, কেউ বলে—রাজা রামকৃষ্ণ,—আমি এইখানেই থাকি।" আমি প্রণাম করিয়া বাটীতে ফিরিতেছি, তিনি উত্তরের বারাণ্ডা অবধি আমার সঙ্গে আসিলেন। আমি তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আমি আপনাকে দর্শন করিয়াছি, আবার কি আমায় যাহা করিতে হয়, তাহা করিতে হইবে?" ঠাকুর বলিলেন, "তা করো না!" তাঁহার কথায় আমার মনে হইল, যেন যাহা করি, তাহা করিলে দোষ স্পর্শিবে না।

তদবধি গুরু কি পদার্থ, তাহার কিঞ্চিৎ আভাষ আমার হৃদয়ে আসিল, গুরুই সর্বস্ব আমার বোধ হইল। যাঁহার গুরু আছেন, তাঁহার উপর পাপের আর অধিকার নাই। তাঁহার সাধন-ভজন নিষ্প্রয়োজন। আমার দৃঢ় ধারণা জন্মিল, আমার জন্ম সফল।

ইহার পর অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে, এই যে পরম-আশ্রয়দাতা, ইঁহার পূজা আমার দ্বারা হয় নাই। মদ্যপান করিয়া ইঁহাকে গালি দিয়াছি। শ্রীচরণসেবা করিতে দিয়াছেন—ভাবিয়াছি—একি আপদ। কিন্তু এ সকল কার্য্য করিয়াও আমি দুঃখিত নই। গুরুর কৃপায় এ সকল আমার সাধন হইয়াছে। গুরুর কৃপায় একটি অমূল্য রত্ন পাইয়াছি। আমার মনে ধারণা জন্মিয়াছে যে, গুরুর কৃপা আমার কোন গুণে নহে। অহেতুকী কৃপাসিন্ধুর অপার কৃপা, পতিতপাবনের অপার দয়া—সেইজন্য আমায় আশ্রয় দিয়াছেন। আমি পতিত, কিন্তু ভগবানের অপার করুণা, আমার কোন চিন্তার কারণ নাই। জয় রামকৃষ্ণ!

পরমহংসদেবের শিষ্য-স্নেহ

প্রবন্ধ লিখিবার ভার যখন আমার উপর অর্পিত হইল, তখন ভাবিলাম, অতি সহজ কার্য্যই অর্পিত হইয়াছে, কিন্তু এখন কার্য্যে দেখি যে, এ প্রবন্ধ লেখা অতি কঠিন। সহজ ভাবিয়াছিলাম, তাহার কারণ এই যে, আমি তাঁহার অপার স্নেহ উপলব্ধি করিয়াছি, প্রত্যেক শিষ্যের নিকট সেই অপার স্নেহের কথা শুনিয়াছি; অনেক সময়ে মুগ্ধচিত্তে সেই সকল পরস্পর আলোচনা করিয়াছি। যে কোনও শিষ্য তাঁহার প্রতি পরমহংসদেবের স্নেহের ব্যবহার যখন বর্ণনা করিতেন, অমনি প্রতিঘাতে হৃদয়ে শত

প্রস্রবণ উন্মুক্ত হইত, শত স্রোত বহিত, শিষ্যের কথায় যত না হোক, মুগ্ধ ভাব-ভঙ্গীতে এবং তাঁহার সহিত আমার অন্তরের সম অবস্থায় তৎকালিন তাহা যেন সম্যক অনুভূত হইত। একটি কথা, যাহা শিষ্য বলিতেন, একটি কার্য্য যাহা বর্ণনা করিতেন, সেরূপ স্নেহময় কথা আমিও শুনিয়াছি, আমিও সেরূপ স্নেহময় কার্য্যের শত শত দৃষ্টান্ত পাইয়াছি, শিষ্যকে অধিক বলিতে হইত না। একটি কথা বলিয়া শিষ্য ভাবিত যেন কত বলিয়াছে, আমিও ভাবিতাম—যেন কত শুনিলাম। আমি যে কথা বলিতে চাহিতেছি, আমি তাহা সম্পূর্ণ বলিতে পারিলাম কি না, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না, কিন্তু শ্রোতৃবর্গকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিলে বোধহয় কতক যেন আমার মনোভাব বুঝাইতে পারিব। আমার জিজ্ঞাস্য, তাঁহার প্রতি তিনি তাঁহার মাতৃস্নেহ কিরূপ অনুভব করিয়াছেন? তাঁহার প্রতি তাঁহার মাতৃস্নেহ কিরূপ বর্ণনা করুন। আমায় এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে, আমি গুটিকত কথা মাত্র বলিতে পারিব,—এই মাত্র বলিব —"আহা মাতৃস্নেহ—মাতৃ-স্নেহ!" মাতার প্রতি কার্য্যে, প্রতি দৃষ্টিতে, প্রতি ব্যবহারে, যাহা আমার অনুভূত হইয়াছে, তাহা কথায় বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। একটা কথা আছে, পুত্রসন্তান হইলে পিতৃঋণ শোধ যায়; তাহার অর্থ আমি এই বুঝি, যে পিতৃস্নেহ আমাদের পুত্র না হইলে, আমরা কোনরূপে বুঝিতে পারি না। মাতৃস্নেহ বোঝা একেবারে অসম্ভব। কিন্তু যদি মাতৃস্নেহ বোঝা কখনও সম্ভব হয়, পরমহংস-দেবের স্নেহ বুঝিবার কোনও উপায় নাই। আমরা মায়িক অবস্থায় অবস্থিত, পিতৃ-মাতৃস্নেহ মায়িক স্নেহ বলিলে বলা যায়। অনেক স্থলেই মায়িক স্নেহ, সন্তানের ঐহিক সুখই তাঁহাদের কামনা, সন্তানের সাংসারিক উন্নতি তাঁহারা দেখিতে চান। এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় যে, পারত্রিক উন্নতির আশায় যদি পুত্র, সংসার-কার্য্যে মনোনিবেশ না করে, তাহা পিতামাতার বিরক্তির কারণ হয়, সমস্ত সদ্‌গুণ সম্পন্ন হইলেও যদি বিবাহ করিতে না চায়, তাহাতে পিতামাতা অসন্তুষ্ট হন, উপদেশ দিয়া থাকেন যে, পারত্রিক উন্নতির সময় আছে, সংসার-ধর্ম্ম শেষ করিয়া তারপর পারত্রিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। পুত্র তাঁহাদের এই উপদেশ না শুনিলে যদিও স্পষ্ট মুখে বলিতে পারেন না যে, পুত্র কুপথগামী হইয়াছে, কিন্তু সে পুত্র যে কার্য্যের বাহির, এ কথা বলিয়া বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট আক্ষেপ করেন। পিতামাতার স্নেহে কখনও স্বার্থ লক্ষিত হয়। পিতাকে গুণবান সন্তানের পক্ষপাতী হইতে দেখা যায়। যতদিন পুত্রের অসহায় বালক অবস্থা, ততদিন পিতামাতা নিঃস্বার্থ। কিন্তু অনেক পিতামাতাই আশা করেন যে, পুত্র হইতে তাঁহাদের বৃদ্ধকালের বিশেষ কার্য্য হইবে। নির্গুণ সন্তানের প্রতি মাতৃস্নেহ অধিক, কিন্তু গুণবান সন্তানের গুণই কখনও কখনও মাতার স্নেহের ত্রুটির কারণ হয়। পিতৃমাতৃ-স্নেহ অতি উচ্চ স্নেহ, কিন্তু একেবারে স্বার্থ স্পর্শ নাই, এ কথা বলা যায় না। পিতা মাতার স্নেহের আভাস কতক পাওয়া যায়, কিন্তু পরমহংসদেবের স্নেহ—এ নিঃস্বার্থ স্নেহ—কিরূপে অনুভব করিব এবং কি কথায় বা বর্ণনা করিব! স্বার্থ শূন্য অবস্থা ব্যতীত অর্থাৎ মায়া-মুক্ত অবস্থা ব্যতীত, অমায়িক কার্য্য বোঝা যায় না। তাঁহার ন্যায় যদি মায়াশূন্য অবস্থা প্রাপ্ত হইতাম, এবং আমার শিষ্য থাকিত, শিষ্যের

প্রতি পরমহংসদেবের স্নেহ বুঝিবার কতক শক্তি হইত ; কিন্তু বর্ণনা করিবার শক্তি হইত কি না জানি না। অপরাপর শিষ্যের নিকট তাঁহার স্নেহের কথা যাহা শুনিয়াছি, তাহা আপনার অবস্থা মিলাইয়া কতক বুঝিয়াছি সত্য, কিন্তু অন্যের অন্তরের কথা বর্ণনা করা যায় না। আমি আপনার অন্তরের কথা, আমি নিজে বুঝি কি না সন্দেহ, অন্যের অন্তরের কথা দুর্বোধ্য। অতএব এ প্রবন্ধে আমার আপনার কথা পরমহংসদেবের স্নেহ, আমার কিরূপ অনুভূত হইয়াছে, তাহাই বর্ণনা করিব। তদ্ব্যতীত আমি নিরুপায়! আপনার কথা বলিব, শ্রোতৃবর্গ অবস্থা বুঝিয়া অনুকম্পায় মার্জ্জনা করিবেন।

আর এক কথা—পরমহংসদেবের নিকট যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে শিষ্ট শান্ত ও ধর্ম্মাপরায়ণ। নরেন্দ্র প্রভৃতি যাঁহারা তাঁহার স্বগণের মধ্যে গণ্য, তাঁহারা নির্ম্মল বালক বয়সে প্রভুর নিকট যান ও প্রভুর স্নেহে আবদ্ধ হইয়া পিতামাতা ভুলিয়া প্রভুর কার্য্যে নিযুক্ত হন। তাঁহাদের প্রতি প্রভুর স্নেহ বর্ণনায়, তাঁহার প্রকৃত স্নেহ হয় তো বুঝান যাইবে না। পবিত্র বালকবৃন্দ সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া শরণাপন্ন হইয়াছে, ইহাতে স্নেহ জন্মিবার কথা। কিন্তু আমার প্রতি স্নেহ, অহেতুকী দয়াসিন্ধুর পরিচয়। ভগবানের একটি নাম পতিতপাবন, মানব-দেহে সে নামের সার্থকতা আমিই দেখিয়াছি। পতিতপাবন রামকৃষ্ণ আমায় স্নেহ করিয়াছেন, সেই নিমিত্ত আমার প্রতি স্নেহের কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। পরমহংসদেবের নিকট যাঁহারা গিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা চঞ্চল প্রকৃতি থাকিতে পারেন, কিন্তু আমার তুলনায় সকলেই সাধু। কাহার কখনও বা পদস্খলন হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আমার গঠনই স্বতন্ত্র, সোজা পথে চলিতে জানিতাম না। পরমহংসদেবের স্নেহের বিকাশ আমাতে যেরূপ পাইয়াছে, সেরূপ আর অন্য কোথাও হয় নাই। প্রবন্ধ শ্রবণে কতক আভাস পাইবেন।

যে সময় পরমহংসদেব আমায় আশ্রয় প্রদান করেন, তখন আমি দ্বন্দ্বিংন্দে বিকলিত। পূর্ব্বের শিক্ষা-দীক্ষা, বাল্যকাল হইতে অভিভাবক শূন্য হইয়া যৌবন-সুলভ চপলতা—সমস্তই আমায় ঈশ্বর-পথ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছিল। সে সময়ে জড়বাদী প্রবল, ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা এক প্রকার মূর্খতা ও হৃদয়-দৌর্ব্বল্যের পরিচয় ; সুতরাং সমবয়স্কের নিকট একজন কৃষ্ণ-বিষ্ণু বলিয়া পরিচয় দিতে গিয়া, ঈশ্বর নাই— এই কথাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা হইত। আস্তিককে উপহাস করিতাম, এবং এ পাত ও পাত বিজ্ঞান উল্টাইয়া স্থির করা হইল, যে ধর্ম্ম কেবল সংসার রক্ষার্থ কল্পনা, সাধারণকে ভয় দেখাইয়া কুকার্য্য হইতে বিরত রাখিবার উপায়। দুষ্কর্ম—ধরা পড়িলেই দুষ্কর্ম। গোপনে করিতে পারা বুদ্ধিমানের কার্য্য, কৌশলে স্বার্থ-সাধন করাই পাণ্ডিত্য, কিন্তু ভগবানের রাজ্যে এ পাণ্ডিত্য বহুদিন চলে না। দুর্দ্দিন—অতি কঠিন শিক্ষক ; সেই কঠিন শিক্ষকের তাড়নায় শিখিলাম যে, কুকার্য্য গোপন রাখিবার কোনও উপায় নাই—"ধর্ম্মের ঢাক আপনি বাজে।" শিখিলাম বটে, কিন্তু কার্য্যজনিত ফলভোগ আরম্ভ হইয়াছে, নিরাশব্যঞ্জক পরিণাম মানসপটে উদয় হইতেছে। শাস্তি আরম্ভ হইয়াছে মাত্র, কিন্তু শাস্তি এড়াইবার কোনও উপায় দেখিতেছি না। বন্ধু-বান্ধবহীন,

চতুর্দ্দিকে বিপজ্জাল, দৃঢ়পণ শক্র সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছে এবং আমারই কার্য্য তাহাদের সম্পূর্ণ সুযোগ প্রদান করিয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া ভাবিলাম—ঈশ্বর কি আছেন ? তাঁহাকে ডাকিলে কি উপায় হয় ? মনে মনে প্রার্থনা করিলাম—"হে ঈশ্বর, যদি থাক এ অকূলে কূল দাও।" গীতায় ভগবান বলিয়াছেন,—"কেহ কেহ আর্ত্ত হইয়া আমাকে ডাকে, তাহাকেও আমি আশ্রয় দিই।" দেখিলাম গীতার কথা সম্পূর্ণ সত্য। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যেরূপ দূর হয়, অচিরে আশাসূর্য্য উদয় হইয়া হৃদয়ান্ধকার দূর করিল। বিপদ-সাগরে কূল পাইলাম। কিন্তু এতদিন সন্দেহ পোষণ করিয়া আসিতেছি, ঈশ্বর নাই অনেক তর্ক করিয়াছি, তাহার সংস্কার কোথায় যাইবে ? কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ-বিচার করিতে লাগিলাম, দেখিলাম এই কার্য্য হইতে এই কারণ উপস্থিত হইয়া আমাকে বিপদ হইতে মুক্ত করিয়াছে ; সন্দেহ হয়, কিন্তু একেবারে ঈশ্বর নাই—তাহা আর জোর করিয়া বলিতে সাহস হয় না। অনুসন্ধানে প্রবৃত্তি জন্মিল, ঘটনাস্রোতে কখনো বিশ্বাস আনে—কখনো সন্দেহ আনে,—এ বিষয়ে যাঁহাদের সহিত আলোচনা করি, তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে বলেন, যে, গুরু-উপদেশ ব্যতীত কিছুই হইবে না। কিন্তু মানুষকে গুরু বলিতে তর্ক-বুদ্ধি সম্মত হইল না। বিশেষতঃ গুরুকে "গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেবো মহেশ্বরঃ" বলিয়া প্রণাম করিতে হয়, এ প্রণাম মানুষকে কিরূপে করিব, এ তো চাতুরী ! কিন্তু সন্দেহের বিষম তাড়না ! হৃদয়ে ঘোর দ্বন্দ্ব উপস্থিত। সে অবস্থা বর্ণনাতীত, সহসা চক্ষু বন্ধন করিয়া লইয়া গিয়া জনশূন্য অন্ধকার গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলে যেরূপ অবস্থা হয়, আমার তাৎকালিক অবস্থার সহিত সে অবস্থার কতক তুলনা হইতে পারে। চিন্তার তাড়নায় কখনো কখনো শ্বাস-রোধ হইয়া যায়। দুষ্কর্ম্মের স্মৃতি মুহুর্মুহু জ্বলিয়া উঠে, ও হৃদয়ান্ধকার আরও গাঢ় করিয়া তোলে ! এই সময়ে পরমহংসদেব আমায় দর্শন দেন। আমি আমাদের পল্লীর চৌমাথায় একজন ভদ্রলোকের রকে বসিয়া আছি, এমন সময় পরমহংসদেব, তাঁহার দুই একটি ভক্ত সমভিব্যাহারে পূর্ব্বদিকের রাস্তা হইতে ৺বলরাম বসুর বাড়ী যাইবার জন্য আসিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে ষ্টার থিয়েটারে তিনি আমার "চৈতন্যলীলা" অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলেন। "নারায়ণ" নামে একজন ভক্ত, আমাকে দূর হইতে দেখাইয়া দিয়া যেন কি বলিল ;—উনি তৎক্ষণাৎ আমাকে নমস্কার করিলেন। আমারই সম্মুখ দিয়া ৺বলরাম বাবুর বাটী চলিলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছেন, আমার বোধ হইতে লাগিল কি যেন টানিতেছে, আমি সে টানে স্থির হইতে পারিতেছি না ! সে যে কি অবস্থা, আমি বলিতে পারি না, কোনও আত্মীয়ের নিকট যাইবার ইচ্ছা যেরূপ, তাহা নয়, এ এক নূতন রকম। এ-টান আমার পূর্ব্বে কখনো হয় নাই। আমি যাইব কি না যাইব, ভাবিতেছি, এমন সময় তাঁহার একজন ভক্ত তাঁহার নিকট হইতে আসিয়া আমাকে বলরামবাবুর বাটী যাইতে আহ্বান করিলেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। বলরামবাবুর বৈঠকখানায় পরমহংসদেব বসিলেন, আমিও বসিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, গুরু কি ?" তিনি বলিলেন, "তোমার গুরু হইয়া গিয়াছে—গুরু কি জানো ?—

যেন ঘটক! মিলাইয়া দেয়, ঈশ্বর-লুব্ধ-চিত্ত ঈশ্বরের সহিত মিলাইয়া দেয়।" তাঁহার কথা কত দূর বুঝিলাম, তাহা জানি না, কিন্তু পরম শান্তি হইল। নানা কথা হইতে লাগিল, যেন কে আপনার লোক কথা কহিতেছে; অল্পপূর্ব্বে আলাপ হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার কথায় প্রকাশ হইতে লাগিল, যেন বহু দিনের আলাপ! তিনি আর একদিন তাঁহাকে থিয়েটার দেখাইতে অনুরোধ করিলেন। আমিও স্বীকৃত হইলাম। স্থির হইল, "প্রহ্লাদ চরিত্র" দেখিতে যাইবেন।

"প্রহ্লাদ-চরিত্র" অভিনয়ের দিন, তিনি থিয়েটারে আসিলেন। তাঁহাকে কিরূপ দেখিলাম, তাহা আমি বলিতে পারি না, সেদিন কথায় কথায় তিনি আমায় বলিলেন, যে, তোমার মনে আড় আছে। আমি ভাবিলাম আছেই তো। জিজ্ঞাসা করিলাম —"এ আড় কিসে যায়?" তিনি উত্তর করিলেন,—"বিশ্বাস করো।"

তাহার পর ৺রাম দত্তের বাড়ীতে তিনি আসিবেন একটু চিরকুট পত্রে সংবাদ পাই। সংবাদ পাইবামাত্র পূর্ব্বে যেরূপ আকর্ষিত হইয়াছিলাম বলিয়াছি, সেইরূপ আকর্ষিত হইলাম। রামবাবুর বাড়ী গিয়া, পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমার কি হইবে?" তিনি বলিলেন—"খুব হইবে।" "আমার মনের আড়"? প্রভু বলিলেন—"থাকিবে না।" আমি প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম।

এক কএক দিন দর্শন লাভে, আমার মনে মনে উদয় হইল, এ ব্যক্তি কে? আমার সম্পূর্ণ পরিচয় ইনি কি পান নাই! বোধ হয়;—নচেৎ এরূপ আপনার ভাবিয়া কথাবার্ত্তা কেন কন। কথায় মনে হয়, পরম আত্মীয়। ইনি কে? আমার মনে সাহস জন্মিয়াছে, যে ইনি কাহাকেও ঘৃণা করিতে জানেন না। আমি ইঁহাকে আত্মপরিচয় দিলে, ইনি আমাকে ঘৃণা করিবেন না। বরং আত্মপরিচয় দিলে আমার পরম মঙ্গল হইবে। আমি দক্ষিণেশ্বরে গিয়া ইঁহার চরণে আশ্রয় লইব। ইনি শান্তিদাতা নিশ্চয়।

দক্ষিণেশ্বর গেলাম। প্রভু বসিয়া আছেন, ভবনাথ নামে একজন শিষ্যের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন। আমি গিয়া প্রণাম করিবামাত্র, যেন কে পরমাত্মীয় গিয়াছি, তিনি বলিলেন,—"এই তোমার কথা আমি বলিতেছিলাম, সত্যি, জিজ্ঞাসা করো।" একটি উপদেশের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, আমি, যেমন বাপের কাছে আবদার করে, সেইরূপ আবদার করিয়া বলিলাম, আমি উপদেশ শুনিব না, আমি অনেক উপদেশ লিখিয়াছি, আপনি আমায় কিছু করিয়া দেন।" এ কথায়, বোধ হইল, যেন তিনি পরম সন্তুষ্ট হইলেন, ঈষৎ হাস্য করিলেন। সে হাসি দেখিয়া আমার মনে হইল, আমার মনে আর ময়লা নাই, আমি নির্ম্মল হইয়াছি। আসিবার সময় জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মহাশয়, আপনাকে দর্শন করিয়া গেলাম, আবার কি যে কার্য করিতেছি, তাহাই করিব?" তিনি বলিলেন, 'করো।' আমার মন তখন আনন্দে পরিপুত! যেন নূতন জীবন পাইয়াছি। পূর্ব্বের সে ব্যক্তি আমি নাই, হৃদয়ে বাদানুবাদ নাই। ঈশ্বর সত্য, ঈশ্বর আশ্রয়দাতা, এই মহাপুরুষের আশ্রয় লাভ করিয়াছি, এখন ঈশ্বর লাভ আমার অনায়াস সাধ্য—এই ভাবে আচ্ছন্ন হইয়া দিন-যামিনী যায়। শয়নে-

স্বপনেও এই ভাব,—পরমসাহস, পরমাত্মীয় পাইয়াছি, আমার সংসারে আর কোন ভয় নাই। মহাভয়—মৃত্যু-ভয়—তাহাও দূর হইয়াছে।

আমি তো এইরূপ ভাবি। এদিকে পরমহংসদেবের নিকট হইতে যে ব্যক্তি আসেন, তাঁহারই মুখে শুনি, যে প্রভু আমার কথা কতই বলিয়াছেন। যদি কেহ আমার নিন্দা করে, খুঁজিয়া নিন্দা করিতে হয় না, তিনি তৎক্ষণাৎ বলেন,—'না' জান না, ওর খুব বিশ্বাস।"

মাঝে মাঝে থিয়েটারে আসেন। দক্ষিণেশ্বর হইতে, আমাকে খাওইবার জন্ম খাবার লইয়া আসেন। প্রসাদ না হইলে, আমার খাইতে রুচি হইবে না, সেই জন্ম মুখে ঠেকাইয়া আমাকে খাইতে দেন। আমার ঠিক বালকের ভাব হয়, পিতা মুখ হইতে খাবার দিতেছেন, আমি আনন্দে তাহা ভোজন করি।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছি, তাঁহার ভোজন শেষ হইয়াছে, আমায় বলিলেন,—"পায়েস খাও।" আমি খাইতে বসিয়াছি, তিনি বলিলেন,—"তোমায় খাওইয়া দি।" আমি বালকের ন্যায় বসিয়া খাইতে লাগিলাম। তিনি কোমল হস্তে আমাকে খাওইয়া দিতে লাগিলেন। মা যেমন চেঁচেপুঁছে খাওইয়া দেন, সেইরূপ চেঁচেপুঁছে খাওইয়া দিলেন। আমি যে বুড়ো ধাড়ি, তাহা আমার মনে রহিল না। আমি মায়ের বালক, মা খাওয়াইয়া দিতেছেন,—এই মনে হইল। যখন মনে হয় যে অনেক অস্পর্শীয় ওষ্ঠে আমার ওষ্ঠ স্পর্শিত হইয়াছে, সেই ওষ্ঠে তিনি নির্ম্মল হস্তে পায়েস দিয়াছেন, তখন যেন আত্মহারা হইয়া ভাবি, এ ঘটনা কি সত্য হইয়াছিল, না স্বপ্নে দেখিয়াছি! একজন ভক্তের মুখে শুনিয়াছিলাম যে তিনি দেব-দৃষ্টিতে আমাকে উলঙ্গ-বালক দেখিয়াছিলেন। সত্যই আমি তাঁহার নিকট গিয়া, যেন নগ্ন-বালকের ন্যায় হইতাম। যে সকল দ্রব্য আমার রুচিকর, তিনি কিরূপে জানিতেন, তাহা আমি জানি না, সেই সকল দ্রব্য, আমাকে সম্মুখে বসাইয়া খাওয়াইতেন। স্বহস্তে আমাকে জল ঢালিয়া দিতেন। আমি বর্ণনা করিতেছি মাত্র, কিন্তু আমি তাঁহার স্নেহ প্রকাশ করিতে পারিতেছি কি না—জানি না। বোধ হয় আমার সম্পূর্ণ অনুভব হইতেছে না,—সম্পূর্ণ অনুভব হইলে, যাহা বলিতেছি, বলিতে পারিতাম না, ক্বচিৎ কখনো সে ভাব উদয় হইলে, জড় হইয়া যাই।

তাঁহাকে পরম আত্মীয় জানিয়াছি, কিন্তু সংস্কার-বন্ধন অতি দুশ্ছেদ্য। এক দিন থিয়েটারে মত্ততা বশতঃ কতই অকথ্য কথনে তাঁহাকে গালি দিলাম, তাঁহার ভক্তেরা কুপিত হইয়া আমাকে শাস্তি দিতে উদ্যত; তিনি নিবারণ করিয়া রাখিয়াছেন। আমারও তত কবিতার মুখ চলিতেছে। আমি তাঁহাকে জেদ করিয়া ধরিয়াছি "তুমি আমার ছেলে হও।" তিনি বলেন,—"কেন? তোর গুরু হব,—ইষ্ট হব।" আমি বলি,—"না তুমি ছেলে হও!" তিনি বলেন—"আমার বাপ অতি নির্ম্মল ছিলেন,—আমি তোর ছেলে কেন হইব?" আমার মুখের তোড় যতদূর চলে—চলিল। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া গেলেন। আমার মনে কিছু মাত্র শঙ্কা নাই। আদুরে গোপাল, বয়াটে ছেলে—যেরূপ বাপকে গালি দিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, আমিও পরম-

হংসদেবের আদরে, বয়াটে ছেলের মত কার্য্য করিয়া নির্ভয়ে রহিলাম। পরে অনেকে অনেক বলিতে লাগিল; কার্য্য ভাল হয় নাই—ক্রমে বুঝিলাম; কিন্তু তত্রাচ পরমহংসদেবের স্নেহের উপর আমার এত নির্ভর, তাঁহার স্নেহ এত অসীম যে তিনি আমায় পরিত্যাগ করিবেন—এ আশঙ্কা একবারও জন্মিল না। দক্ষিণেশ্বরে অনেকেই তাঁহাকে বলিতে লাগিল, যে, ওরূপ অসংব্যক্তির নিকট আপনি যান!—কেবল একমাত্র ৺রামচন্দ্র দত্তই বলিয়াছিলেন, "মহাশয়, ও আপনাকে পূজা করিয়াছে। কালীয়নাগ ভগবানকে বলিয়াছিল, যে 'আপনি আমাকে বিষ দিয়াছেন' আমি কোথা হইতে সুধা আপনাকে দিব"! গিরিশ ঘোষকেও যাহা দিয়াছেন, সে তাহাই দিয়া আপনাকে পূজা করিয়াছে।" পরমহংসদেব বলিতে লাগিলেন,—"শোনো শোনো—রামের কথা শোনো।" আবার অনেকেই আমার নিন্দা করিতে লাগিলেন, প্রভু বলিলেন, 'গাড়ী আনো, আমি গিরিশ ঘোষের বাড়ী যাইব।" স্নেহময় পরমপিতা আমার বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জন্মদাতা পিতা যে অপরাধে ত্যাজ্য পুত্র করে, সে অপরাধ—আমার পরম পিতার নিকট অপরাধ বলিয়া গণ্য হইল না। তিনি আমার বাড়ী আসিলেন, দর্শন লাভে চরিতার্থ হইলাম। কিন্তু দিন দিন অন্তর কুঞ্চিত হইতে লাগিল। তিনি স্নেহময়—সম্পূর্ণ ধারণা রহিল; কিন্তু নিজকার্য্যের আলোচনায় আপনি লজ্জিত হইতে লাগিলাম। ভক্তেরা কত প্রকারে তাঁহার পূজা করে, ভাবিতে লাগিলাম। আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিসাম। ইহার কিছু দিন পরে ভক্তচূড়ামণি দেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের বাসায় প্রভু উপস্থিত হইলেন। আমিও তথায় উপস্থিত। চিন্তিত হইয়া বসিয়া আছি, তিনি ভাবাবেশে বলিলেন—"গিরিশ ঘোষ, তুই কিছু ভাবিস্‌নে, তোকে দেখে লোক অবাক্ হয়ে যাবে।" আমি আশ্বস্ত হইলাম।

এক দিন পদসেবা করিতে দিয়াছেন, আমি বেজার। ভাবিতেছি—কি আপদ, কে, বসে এখন পায়ে হাত বুলোয়! সে কথা যখন মনে হয়, আমার প্রাণ বিকল হয়ে উঠে, কেবল তাঁহার অসীম স্নেহ স্মরণ করিয়া শান্ত হই।

পিড়ীত অবস্থায়, আমি দেখিতে যাইতাম না। কেহ যদি বলিত, অমুক দেখিতে আসে না, তিনি অমনি বলিতেন,—"আহা, সে আমার যন্ত্রণা দেখিতে পারে না।"

তাঁহার শিক্ষাদানের এক আশ্চর্য্য কৌশল, বাল্যকাল হইতে আমার প্রকৃতি এই যে, যে কার্য্য কেহ নিবারণ করিবে, সেই কার্য্য আগে করিব। পরমহংসদেব এক দিনের নিমিত্ত আমায় কোনো কার্য্য করিতে নিষেধ করেন নাই। সেই নিষেধ না করাই, আমার পক্ষে পরম নিষেধ হইয়াছে। অতি ঘৃণিত কার্য মনে উদয় হইলে, আমার পুরুষ-প্রকৃতিকে প্রণাম আসে। সে স্থলে পরমহংসদেব উদয়। কোথায় কোন ঘৃণিত আলোচনা হইলে পরমহংসদেবের কথায় বহুরূপী ভগবানকে মনে পড়ে। তিনি মিথ্যা কথা কহিতে সকলকে নিষেধ করিতেন। আমি বলিলাম, "মহাশয়, আমি. ত মিথ্যা কথা কই কিরূপে সত্যবাদী হইব?" তিনি বলিলেন, "তুমি ভাবিও না, তুমি আমার মত সত্য-মিথ্যার পার।" মিথ্যা কথা মনে

উদয় হইলে, পরমহংসদেবের মূর্ত্তি দেখিতে পাই, আর মিথ্যা বাহির হইতে চাহে না। সাংসারিক ব্যবহারে চক্ষু-লজ্জায় দু'একটা এদিক ওদিক কথা কহিতে হয়, কিন্তু যে আমি মিথ্যা বলিতেছি, তাহা জানান দিবার বিশেষ চেষ্টা থাকে। পরমহংসদেব আমার হৃদয়ের সম্পূর্ণ অধিকারী—সে অধিকার তাঁহার স্নেহের। এ স্নেহ অতি আশ্চর্য্য! তাঁহার কৃপায় যদি আমার কোনও গুণ বর্ত্তিয়া থাকে, সে গুণগৌরব আমার, তিনি কেবল আমার পাপ গ্রহণ করিয়াছেন, স্পষ্ট কথায় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার ভক্তের মধ্যে যদি কেহ বলিত আমি পাপী, তিনি শাসন করিতেন, বলিতেন,—"ও কি? পাপ কিসের? আমি কীট আমি কীট বলিতে বলিতে কীট হইয়া যায়। আমি মুক্ত আমি মুক্ত, এ অভিমান রাখিলে মুক্ত হইয়া যায়। সর্বদা মুক্ত অভিমান রাখো, পাপ স্পর্শ করিবে না।"

এতক্ষণ আমার অন্তরের কথা বলিতেছিলাম, বলিয়াছি অন্যের অন্তরের কথা কি জানিব, কিন্তু দেখিয়াছি, কোনও ভক্তের ছিন্নবস্ত্র দেখিলে, তাঁহার চক্ষে জল আসিত, পায়ে জুতা না থাকিলে তিনি ব্যাকুল হইতেন, যখন রোগের দারুণ যন্ত্রণা তিনি ভোগ করিতেছেন, যদি কোন ভক্ত সে সময় তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকায় আহারের বিলম্ব হইত, তিনি তাহাকে আহার না করাইয়া নিরস্ত হইতেন না। কাহারও অসুখ হইলে তিনি অস্থির। তাঁহার ভক্তেরা তাঁহাকে ঐহিক পারমার্থিক পিতা জানিতেন। তিনিও মাতা-ঠাকুরাণীকে বলিতেন যে, লোকে পুত্রের কামনা করে, সকল পুত্র সুপুত্র হয় না, কিন্তু তোমায় আমি কতকগুলি পুত্র দিয়া যাইতেছি, সকলেই সুসন্তান। তিনি শিষ্যকে পুত্রবৎ দেখিতেন। পুত্রবৎ—এ কথায় ঠিক প্রকাশ হইল না, অন্য কথার অভাবে পুত্রবৎ বলিতেছি, সম্পূর্ণ ঐহিক পারত্রিকের দায়িত্ব গ্রহণ যিনি করেন, তিনি কে? তাঁহার সহিত কি সম্বন্ধ? তিনি যে মুক্ত অভিমান রাখিতে বলিতেন, এই সম্বন্ধ বিচার করিলেই, এ মুক্ত অভিমান আপনিই আসে। মৃত্তিকার দেহে যেন আর আত্মা আবদ্ধ থাকে না। চিত্তের মালিন্য দূর হয়। কাম-ক্রোধাদি দুর্দ্দমনীয় রিপু অন্তর্হিত হয়! কোনও সাধন-ভজনের প্রয়োজন থাকে না। কেবল তাঁহার বিমল স্নেহের উপলব্ধিই মুক্তি! উপলব্ধিই মনুষ্যত্ব! উপলব্ধিই মানব জীবনের চরম অবস্থা! এই অকিঞ্চনের সেই স্থায়ী উপলব্ধি হউক, সকলে আশীর্ব্বাদ করুন।

['রামকৃষ্ণ-মিশনে' পঠিত এবং 'উদ্বোধন' পাক্ষিক পত্রে (৭ম বর্ষ, ১লা বৈশাখ, ১৩১২ সাল) প্রথম প্রকাশিত]

প্রলাপ না সত্য ?

একটি গল্প আছে যে, প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ভূকৈলাসের রাজারা আবাদের নিমিত্ত মাটী খনন করিতে করিতে, মাটীর নীচে সমাধিস্থ একজন মহাপুরুষকে পান। মহাপুরুষকে ভূকৈলাসে আনিয়া, সমাধিভঙ্গের নানাবিধ চেষ্টা হয়, কিন্তু কিছুদিন কোনও রূপে সমাধি ভঙ্গ হইল না। ক্রমে নানা উপায়ে সমাধি ভঙ্গ হইল এবং তৎপরে মহাপুরুষের দেহত্যাগ হয়। এ কথা পরমহংসদেবের নিকট উঠিয়াছিল। এক ব্যক্তি পরমহংসদেবকে জিজ্ঞাসা করেন, "মহাশয়, এ কিরূপ হইল ? এরূপ সমাধিস্থ মহাপুরুষের অশুচি অবস্থায় দেহত্যাগের কারণ কি ?" পরমহংসদেব উত্তর করিলেন, সে সমাধিস্থ মহাপুরুষের দেহের আর আবশ্যক ছিল না। উপমা দিলেন যে, বৈদ্যেরা বোতলে করিয়া মকরধ্বজ প্রস্তুত করে—যখন মকরধ্বজ প্রস্তুত হয়, বোতল ভাঙ্গিয়া ফেলে।

সাময়িক কথার উত্তর হইল, কিন্তু সে কথার যত আন্দোলন করা যায়, ততই মনুষ্যদেহধারী জীবের অবস্থা উপলব্ধি হয়। ঈশ্বর জ্ঞানলাভের নিমিত্ত দেহের প্রয়োজন। ঈশ্বরজ্ঞান হইলে দেহের প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদেরা বলেন যে, প্রথম ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমাদের বস্তু জ্ঞান লাভ হয়। আবার দেখা যায়, সেই ইন্দ্রিয়েরাই প্রলোভিত করিয়া মনকে ঈশ্বরপথ হইতে অন্তর করে। ইন্দ্রিয়-প্রলোভনে মন সুখ-আশে ব্যাকুল হয়, অনিত্য বস্তুতে আসক্তি জন্মে। উচ্চাশয় ব্যক্তিরা সাধারণের ন্যায় ইন্দ্রিয়-প্রলোভনে মুগ্ধ না হোন, নানাবিধ তত্ত্ব অনুসন্ধান করেন। কিন্তু যতই তত্ত্ব অনুসন্ধান করুন, যন্ত্র দ্বারা ইন্দ্রিয় বিস্ফোরণ পূর্ব্বক, যতই জড় নিয়মের জ্ঞান লাভ করুন, মানসিক চিন্তার দ্বারা যতই মনোবিজ্ঞানের উন্নতি করুন, স্থির চিন্তায় বুঝিতে পারেন, যে জ্ঞান তাঁহার জন্মিয়াছে, তাহা আপেক্ষিক জ্ঞান। নিশ্চিত জ্ঞান তাঁহার আদৌ জন্মে নাই।

সুবোধ ভাবুক তখন বুঝিতে পারেন, "রামকো যো জানা নেই, সো জানা হ্যায় কেয়া রে !" সার তত্ত্ব লাভের যতই চেষ্টা করুন, পুনঃ পুনঃ অসার আপেক্ষিক জ্ঞানে বিজড়িত হন। কিছুই নিশ্চিত হয় না অথচ শোনেন, ঈশ্বর আছেন, পুনর্জ্জন্ম আছে, দেহের মৃত্যুতে জীবের মৃত্যু হয় না। শোনেন মাত্র, স্থির নিশ্চয় করিতে অক্ষম হন। তিনি তখন বোঝেন যে, অপর কোন দৃষ্টি ব্যতীত, অপর কোন ইন্দ্রিয় প্রস্ফুটিত না হইলে নিরপেক্ষ জ্ঞানলাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। তখন তিনি বিদ্যাভিমান পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসু হন, ব্যাকুল হন—কোথায় কি উপায়ে সেই নিরপেক্ষ জ্ঞান লাভ করিবেন। কেহ বা নিরাশ হইয়া, বৃথা চেষ্টা বিবেচনায় নিরস্ত থাকেন।

কিন্তু যে পুরুষের সেই জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়, যন্ত্রণায় আকুল হন, নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করিবার চেষ্টা পান। শাস্ত্র পাঠে শুনিয়াছেন, প্রার্থনা করিতে

হয়। চক্ষু বুজিয়া প্রার্থনা করিয়া দেখিয়াছেন, কই সে নিরপেক্ষ জ্ঞান তো জন্মিল না। কি করিব ? কোথায় যাব ? কে পথ বলিয়া দেবে ? নানাস্থানে অন্বেষণ করিয়া দেখেন ; এ একথা বলে, সে সে কথা বলে, শাস্ত্র পাঠে যে গণ্ডগোল দেখিয়াছিলেন, সে গণ্ডগোল আর ঘোচে না। কি শোনেন, মনুষ্য নিরপেক্ষ জ্ঞান লাভ করে ? বিস্তর দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে পাইয়াছেন, লোকের মুখেও শোনেন। কখনো বলেন মিথ্যা, কখনো সন্দেহে জড়িত হ'য়ে বলেন, কই দেখিলাম না তো। ভাবেন, যাক্ আর ও কথায় কাজ নাই। কিন্তু সম্মুখে মৃত্যু—ভাবেন, হায়, চোখ বাঁধা বলদের মত ঘুরিলাম, কিছুই জানি না ! কোথায়, কে আমার উপায় বলিয়া দেবে ? প্রার্থনা করিতে হয়, তাহা তো তিনি করিয়াছেন।

যখন একান্ত আকুল, কি এক আশ্চর্য্য নিয়ম সংসারে চলে, এমন কথা তাঁর কানে আসে, এমন ব্যক্তিকে দেখিতে পান যে, একেবারেই স্থির করেন, এ ব্যক্তি যা বলে শুনিব, দেখি, এ পথে কি হয় ! তাঁর কথায় বুঝিতে পারেন যে, তাঁর প্রার্থনা বিফল হয় নাই ; যদিচ অন্ধকার পথে চলিয়াছেন, তথাপি তিনি অগ্রসর ; আরো কিছু অগ্রসর হইলে আলো পাইবেন। সেই পথে চলিতে থাকেন, ক্রমে কিঞ্চিৎ আলোর আভাস পান এবং উপলব্ধি করেন যে, সেই সমস্ত ইন্দ্রিয় রহিয়াছে, কিন্তু তাহাদের রুচি প্রভেদ। যে সকল পান-ভোজন ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তিজনক ছিল, সে সকল আর তৃপ্তিকর নয়, এমন কি—দেহের অসুখপ্রদ। দেখিতে পান, যে সকলে মনের রুচি ছিল, যে সকল আলোচনা করিতেন, সে সকল নীরস এবং যৎকালীন ইন্দ্রিয়মুগ্ধ ছিলেন, তৎকালীন যে সকল বিষয় নীরস ছিল, এক্ষণে তাহা ব্যতীত আর সরস জিনিস নাই। পূর্ব্বে যে সকল জ্ঞান লাভে তিনি ভাবিতেন যে, আমি উন্নতি সাধন করিতেছি, তাহা বুঝেন উন্নতি নয়। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এক বিষয় মীমাংসা করায় শত সহস্র মীমাংসার বিষয় উদয় হয়। ভূতত্ত্ব, খতত্ত্ব, পাতালতত্ত্বের এক বিষয়ের প্রশ্ন পূর্ণ না হইতে শত সহস্র প্রশ্ন উদ্ভাবিত হয়। ঐ একঘেয়ে—একই রকম। সে সকলে আর রস থাকে না। কেবল ঐ যে একটি কথা শুনিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার মন বিষয়-চিন্তা হইতে অন্তর করিয়া অন্য চিন্তায় নিমগ্ন করিয়াছে, তাহাই সরস।

এখন সত্য সত্যই তাঁহার দেহের অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের সে তীব্রতা নাই কেন ? সুখ-ইচ্ছা নাই কেন ? অপর চিন্তা নাই কেন ? দেহতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন যে, দেহের বিকার না জন্মিলে ইন্দ্রিয়েরা সতেজ থাকে, তাহাদের স্পৃহাও সতেজ থাকে। তবে এ কি বিকার উপস্থিত ?—এ কি পীড়া ? স্থূল দৃষ্টিতে পীড়াই বটে। মস্তিষ্কের বিকার,—নচেৎ অত বড় পণ্ডিত, অত বড় বিজ্ঞ, অত বড় মানী, সমস্ত ঐশ্বর্য্য বিসর্জ্জন দিয়া, দীন-হীনের ন্যায় পরের চরণ সেবা করিতে ব্যাকুল, দিবারাত্র রোদন করে, রোদনের ধারাও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। নাসিকার দিকে চক্ষের ধারা না বহিয়া চক্ষের অপর কোণ হইতে গণ্ডস্থল বহিয়া ধারা বয়। পরম উপভোগের দ্রব্য ভোগ করা দূরে থাকুক, স্পর্শ করাইলে নিদ্রাভঙ্গ হয়। সুললিত নারীসঙ্গ কাল সর্পের ন্যায় জ্ঞান হয়। দেহেও সেরূপ তীব্র যন্ত্রণা বোধ নাই, যে সকল কঠিন রোগে

সকলে ব্যাকুল হয়, তাহাতে তিলমাত্র কাতর নয়—যেন অঙ্গের সাড় নাই, দিবারাত্র বিভোর। অধিক সুরাপানে যেরূপ বিভোর থাকে, সেইরূপ বিভোর।

দেখা যায়, এমন কথা বলে, যাহা জনিবার কোন সম্ভাবনা নাই। তবে আর কিছু নয়, ও Clairvoyance—একটা য়োগবিশেষ। এ অতীন্দ্রিয় ব্যাপার নয়, এই ইন্দ্রিয়েরই কার্য, তবে ইন্দ্রিয়ের তীব্রতা মাত্র। এ কি বলা যায় না, রোগের প্রলাপ অবস্থায় ওরূপ হইতে দেখা গিয়াছে। কিন্তু এর কিছু স্বতন্ত্র,—এ কি সব বলে?—প্রলাপ?—প্রলাপই বটে—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই,—শাস্ত্রে এরূপ অবস্থার কথা আছে। জ্ঞানীর এরূপ অবস্থা হইয়া থাকে। আবার মিলাইয়া দেখিলে দেখা যায় যে, ইহার একটি কথাও প্রলাপ নয়। অবশ্যই যে সব অতীন্দ্রিয় কথা বলে, তাহা যদি প্রলাপ হইত, তাহা হইলে শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিত না, প্রলাপে মিল থাকে না,—আজ এক রকম, কাল এক রকম। পাগলের মুখেও কখনো কখনো ভবিষ্যৎ কথা শোনা যায়—সত্য হইতেও দেখা যায়; কিন্তু ইহার এক আধটা নয়, যাহা মিলান যায়, তাহার সমস্তই সত্য। আবার কতকগুলি শক্তির বিকাশও দেখা যায়,—এই উন্মাদ ব্যক্তি মন আকৃষ্ট করে, তাহার কথায় দগ্ধ হৃদয়ে শান্তি আসে, মৃত্যুভয় দূর হয়, এ এক অদ্ভুত পাগল। এ পাগল যথায় যায়, তথায় ইষ্ট। গ্রাম মাতায়—দেশ মাতায়—ইষ্ট ব্যতীত ইহার দ্বারা অনিষ্ট হয় না।

যে ছবি আমরা দিলাম, কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এ কি সত্য?—সত্য। আমরা এ পাগল দেখিয়াছি, এবং যে পাগল তাহাকে পাগল করিয়াছে, তাহাকেও দেখিয়াছি। বিবেকানন্দের সহিত রামকৃষ্ণের যিনি সম্বন্ধ জানেন, তিনি আর আমাদের বর্ণনা অলীক বিবেচনা করিবেন না। বোতলের মকরধ্বজ প্রস্তুত হইয়াছিল, বৈদ্য বোতল ভাঙ্গিয়া বাহির করিয়া লইয়াছে।

তবে কি আমাদেরও দেহবোতলে মকরধ্বজ প্রস্তুত হইবে? পরমহংসদেব বলিতেন, 'নিশ্চিত।' সে কথায় নিশ্চিত ধারণা কেন না করিব?—যে কথায় যমভয় দূর হয়, যে কথায় সংসার-সাগর-তরঙ্গে বিচলিত করে না, যে কথার ফলিত দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি,—সে কথায় কেন না নির্ভর করিব? যাহাতে সমস্ত যন্ত্রণা দূর হয়, সে পথে কেন না চলিব? আরে বাতুল, তুমি আমায় বাতুল বল? অহঙ্কার করিয়া বলিব,—অহং তাঁহার—আমার নয়; অহঙ্কার করিয়া বলিব—আমি বাতুল নই। মনুষ্যত্ব লাভের উপায় পাইয়াছি—মনুষ্যত্ব লাভ করিব।—মকরধ্বজ প্রস্তুত হইবে, বোতল যাক্ না।—জয় রামকৃষ্ণ পরমহংসের জয়!

[১লা অগ্রহায়ণ, ১৩১০ সাল, 'উদ্বোধন' পাক্ষিক পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়]

নিশ্চেষ্ট অবস্থা

সন্ন্যাসী ও গৃহীর সাধন সম্বন্ধে কথা উত্থাপন হইলে, পরমহংসদেব বলিতেন, যিনি গৃহে থাকিয়া সাধনা করিতে পারেন, তিনি বীরভক্ত। আমরা তখন বুঝিয়া ছিলাম যে, ইহা একটি উত্তেজনা বাক্য, গৃহীদিগের উৎসাহ দিবার নিমিত্ত। কিন্তু এখন অনুভব হয়—তাহা নয়, তিনি সত্যই বীরভক্ত। সন্ন্যাস গ্রহণে সাধক নিরাশ্রয় হইয়া পড়ে, আপনাকে নিরাশ্রয় জ্ঞান করে, বার বার দুর্গম কান্তার হইতে উদ্ধার পাইয়া ভাবে—আমার রক্ষাকর্তা পশ্চাৎ পশ্চাৎ আছে। সন্ন্যাস গ্রহণে এই উচ্চ শিক্ষা লাভ হয়। এই উচ্চ শিক্ষাই ঈশ্বর-লাভের প্রথম সোপান। এই অবস্থায় সাধনা আরম্ভ হয়, এত দিনে তীর্থ ভ্রমণের ফল সম্পূর্ণ হয়, দিবারাত্র বলে—"ভগবান, আমি নিরাশ্রয়, তুমি আমার রক্ষাকর্তা, তুমি এখন কোথায়?" এই উচ্চ শিক্ষা গৃহে অতি কঠিন। কখনো জনশূন্য তুষারাবৃত উচ্চ শৃঙ্গে, নিরাশ্রয় অবস্থায় কেহ আহার দেয় নাই; তাঁহার অর্জ্জিত অর্থে প্রত্যহ পোলাও কালিয়া মেলে, কখনো পথহীন কান্তারে প্রবেশ করেন নাই; সে কান্তারে রক্ষাকর্তা আছেন কিনা, তাহা তিনি জানেন না; রাজশাসিত রাজপথে সুখময় যানে বসিয়া যাতায়াত করেন; পীড়ার সময় ডাক্তার আছে, নারায়ণ বৈদ্য ও গঙ্গোদক ঔষধ, এ অবস্থা তিনি উপলব্ধি করেন নাই; বৈষয়িক কার্যে কৌন্সলি আছে, সর্ব্বস্বান্ত হইবার সম্ভাবনা—ভাল কৌন্সলি দিয়াছেন,—তিনি যে নিরাশ্রয়, এ কথা তাঁহার উপলব্ধি হওয়া অতি কঠিন।

কিন্তু যদি আমরা স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখি যে, ঘোর তরঙ্গে সাগর-নিমগ্ন ব্যক্তির ন্যায় আমরা প্রত্যেকেই নিরাশ্রয়; তুঙ্গ শৃঙ্গে যিনি সন্ন্যাসীকে আহার দিয়াছেন, তিনিই আমাদের নিত্য আহার দিতেছেন। অর্থ সম্পদ্ সকলই তাঁহারই দান, জলবুদ্বুদের ন্যায় এখনই লয় হইবার সম্ভাবনা; প্রতি মুহূর্ত্তে জীবন নাশের সম্ভাবনা; চতুর্দ্দিকে বিপদ্-জাল, বিপদ্‌কালে আশ্রয় নাই, তিনিই একমাত্র আশ্রয়;—তাহা হইলে সন্ন্যাসীর সহিত আমাদের কিঞ্চিৎমাত্র প্রভেদ থাকে না। কিন্তু বিষয়-বিজড়িত মলিন বুদ্ধি কিছুতেই বুঝিতে দেয় না যে, সাগর-নিমজ্জিত ব্যক্তির ন্যায় আমরা নিরাশ্রয়। চক্ষের উপর বজ্রাঘাত, সর্পাঘাত, পক্ষাঘাত প্রভৃতি নিত্যই দেখিতেছি। এই আছে এই নাই—যেন ভাসিতে ভাসিতে সাগরের জলে ডুবিয়া গেল। এই ঐশ্বর্য রহিয়াছে, পদ্মা ভাঙ্গিয়ে নিলে, রাজা ছিল—ভিখারী। এই স্বজন দাসদাসী-পরিবেষ্টিত—মৃত্যু সময় জল দিতে সকলে ব্যস্ত, শয্যাপার্শ্বে শুশ্রূষার নিমিত্ত কেহই নাই। দারুণ রোগের যন্ত্রণা, বিচক্ষণ ডাক্তার বসিয়া আছে, উপশম হইতেছে না। তথাপি নিরাশ্রয় জ্ঞান হয় না। ঘোর বিপদে বিদ্যুৎ-চমকের ন্যায় জ্ঞান উদয় হয় বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ ঘোর অন্ধকারে আবৃত। আবার ভুলিয়া যায়, আমি নিরাশ্রয়, এই মহাজ্ঞান লাভ হয় না। কিন্তু যদি কেহ ভাগ্যবান, এই সংসারে থাকিয়া সেই দিব্য জ্ঞান লাভ করেন, তিনি পরমহংস, তাঁহার পক্ষে সংসার-গৃহ নাই।

কেহ বলিতে পারেন, এই অবস্থা কি হয়? পরমহংসদেব বলিতেন—'হয়'। আমরা দেখিয়াছি,—হয়। পরমহংসদেবের ভক্তের মধ্যেই দেখিয়াছি। এ মহাপুরুষ-চরিত্র বর্ণনা করা আমার কতদূর সাধ্য জানি না, কিন্তু সত্যই সেই মহাপুরুষ দেখিয়াছি। তাঁহার নাম ছিল দুর্গাচরণ নাগ,—ইনি পূর্ব্ববঙ্গের অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্ত্তী দেওভোগ গ্রাম নিবাসী,—ইনি যখন পরমহংসদেবের নিকট যান, শুনিয়া-ছিলেন যে, ডাক্তার, উকীল, দালাল, এদের ঈশ্বর লাভ হওয়া কঠিন। নাগ মহাশয় (আমরা সকলে তাঁহাকে 'নাগ মহাশয়' বলিয়া ডাকিতাম) হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার ছিলেন। বাটীতে ফিরিয়া আসিয়া ঔষধের বাক্সটি গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন। ইতিপূর্ব্বে ডাক্তারি করিতে গিয়া, দর্শনীর পরিবর্ত্তে রোগীর পথ্য অনেক সময় নিজে দিয়া আসিতেন, কোন দ্রব্য ক্রয়ের প্রয়োজন হইলে, দোকানদারকে করজোড়ে বলিতেন, "কৃপা করিয়া এক টাকার সন্দেশ দেন।" দোকানদার যাহা দিল—তাই। ঘরের বাঁশ-বাঁকারি ভাঙ্গিয়া অতিথিকে কাট দেওন,—গৃহ আছে, স্ত্রী আছে—ইনি গৃহী। কিন্তু ইঁহার সন্ন্যাসী হইতে কিছু প্রভেদ নাই। সন্ন্যাসীর ন্যায় আত্মচেষ্টা রহিত। একদিন তাঁহার গৃহের পার্শ্বে অপর গৃহে আগুন লাগিয়াছে, তাঁহার পরিবার যাহা জিনিষ-পত্র ছিল, বাহিরে আনিতেছেন। তিনি নিবারণ করিয়া বলিলেন,—"কি করিতেছ? গৃহে লইয়া যাও। যদি অগ্নিদেব দগ্ধ করেন, কে রক্ষা করিবে? আইস—আমরা অগ্নিদেবের স্তব করি, যাহাতে রক্ষা হয়।" সত্যই রক্ষা হইল। ইহা বায়ুর গতি পরিবর্ত্তনে হউক বা যাহাতেই হউক, কিন্তু সত্যই রক্ষা হইল। এইরূপ পরম নিশ্চেষ্ট মহাপুরুষ দর্শন করিয়াছি।

এস্থলে তর্ক উঠিতে পারে, আমাদের কি নিশ্চেষ্ট হওয়া উচিত? না, কখনই নয়। সাধারণের পক্ষে কখনই নয়। আলস্য বশতঃ যদি কখনও নিশ্চেষ্ট হইবার চেষ্টা পাও, দেখিবে, সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট হইতে পারিতেছ না। নিশ্চেষ্ট হওয়া একটী অবস্থা। অলস হইয়া চুপ করিয়া ঘরে বসিয়া থাকা নয়। তোমার বাসনা—তোমায় চেষ্টা করাইবে। নিরন্তর সৎ চেষ্টায় নিযুক্ত থাকিয়া যদি নিশ্চেষ্ট হইতে পার। কায়মনোবাক্যে ভগবানের কৃপা প্রার্থনা করিয়া তবে নিশ্চেষ্ট হইতে পারিবে। পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া বুঝিবে যে, আমি সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়—তবে নিশ্চেষ্ট হওয়া সম্ভব। নতুবা আমি নিশ্চেষ্ট হইয়াছি—এই ভাণ জীবনে বিড়ম্বনা। যাহারা অপদার্থ, কার্য্যে উদ্যমশূন্য, তাহারাই অদৃষ্টে যাহা আছে বলিয়া (প্রকৃত নিশ্চেষ্ট হয় না) কার্য্যে বিরত থাকে। নিয়ত দৈবজ্ঞের নিকট কখন সুসময় আসিবে, তাহা জানিতে ব্যগ্র হয়; বিপদে অধীর ও সম্পদে উল্লসিত, নিশ্চেষ্ট ভাণে তাহাদের জীবনযাত্রা একটি বিড়ম্বনা, তাহারা তমোগুণের আদর্শ। সংসারে এই সকল ব্যক্তি লক্ষ্মীছাড়া; কিন্তু যিনি পঞ্চম পুরুষার্থ সম্পন্ন, ভগবানের উপর আত্মনির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট,—তিনি মহা ক্ষমতাশালী। মা লক্ষ্মী তাঁহার পশ্চাতে বনে অন্ন লইয়া যান, লক্ষ্মীর বরপুত্র ভূপতি তাঁহার দর্শনে অবনতশির হন। তিনি সুখ-দুঃখে অটল, সঞ্চয়-বুদ্ধি-রহিত, সমস্ত সংসার তাঁহার পিতৃ-সংসার জ্ঞানে নির্ভয়ে বিচরণ করেন। এই নিশ্চেষ্ট অবস্থা লাভ

করা সন্ন্যাসী অপেক্ষা গৃহীর শতগুণে কঠিন। সন্ন্যাসীরা তো ফক্কড়, ফাঁকি দিয়াছে। আমরা সেয়ানা হইয়া সকলের কাছে ফাঁকে পড়িতেছি। গুরুর নিকট প্রার্থনা যে, সেয়ানা বুদ্ধি দূর হইয়া যেন আপনাকে "সম্পূর্ণ নিরাশ্রয়" জ্ঞান লাভ করিতে পারি। যেন 'তুমি একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা' এই বোধ সকল অবস্থায় অচল থাকে, নিদ্রা জাগরণে সমান থাকে, যেন অকপট হৃদয়ে একবার তোমায় ডাকিতে পারি।

['উদ্বোধন' পাক্ষিক পত্রে (৬ষ্ঠ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১লা মাঘ, ১৩১০ সাল) প্রথম প্রকাশিত]

রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী

অনেকেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন—"রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী কিরূপ?" কেহ বা বিদ্রূপ করিয়া 'কলির সন্ন্যাসী' বলেন। বলেন—"রামকৃষ্ণ পরমহংস ভাল লোক ছিলেন বটে, কিন্তু এঁরা কেমন, তা বুঝতে পারলেম না! জুতো পায়—জামা গায়—দিব্যি বাড়ীতে থাকে—খাবার-দাবার বাচ্-বিচার নাই—এখন সন্ন্যাসী বলিলেই সন্ন্যাসী। ব্যাস্! সব স্বামী-স্বামী!" এঁদের কৌতূহল নিবারণের জন্য দুই একটি কথা বলিব।

যেমন জামা-জুতো দেখিয়াছেন, তেম্নি যে পল্লীতে এই জামাওয়ালা সন্ন্যাসী থাকেন, তাঁহারা কি করেন, তাহার যদি বিশেষ অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে দেখিবেন—কাহারও ঘরে রুগ্ন শয্যায় গভীর রাত্রে রোগীর আত্মীয়দের বিশ্রাম করিবার অবকাশ দিয়া, এই জামাগায়ে দেওয়া সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। রোগীর পথ্য নাই—সন্ন্যাসী, ভিক্ষার্জ্জিত পথ্য সামগ্রী রোগীর উপযোগী রন্ধন করিয়া, কোনও ভগ্নবাসে প্রবেশ করিতেছেন! প্লেগের সময়, যে বস্তীতে প্লেগ বলবান—ধাঙ্গড় লইয়া সেই বস্তির সঙ্কীর্ণ গলিঘুজি যাহা মিউনিসিপ্যালিটির চক্ষে পড়ে নাই, সেই সকল স্থান প্রাতঃকালে উঠিয়া পরিচ্ছন্ন করিতেছেন! দরিদ্রের শিক্ষা দিতেছেন, যথাসাধ্য দরিদ্রের দুঃখ মোচন ও জনহিতে রত আছেন। যদি কেহ কাশীধামে গমন করেন, তথায় দেখিতে পাইবেন যে, কাশীবাসী সমাজ পরিত্যক্ত হইয়া যে অসহায় ব্যক্তি মুমূর্ষু অবস্থায় ঘাটে পড়িয়া আছে, তাঁহাকে এই জামা-গায়ে সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা ভিক্ষা-স্থাপিত অনাথ-আশ্রমে লইয়া গিয়া সেবা করিতেছেন এবং অনেক মুমূর্ষুর জীবনদান করিতেছেন। কনখলে যাইলেও এইরূপ দৃশ্য দেখিতে পাইবেন। বহরমপুরে অনাথ-বালক-আশ্রমে কতকগুলি অভিভাবকহীন বালক দুর্ভিক্ষের করাল-বদন হইতে গৃহীত হইয়া সু-শিক্ষিত ও পালিত হইতেছে। যথায় বন্যা, দুর্ভিক্ষ, প্লেগ, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক পীড়ার উপদ্রবে বনের বানর পর্য্যন্ত স্থান ত্যাগ করিতেছে, দূর হইতেই এই জামাওয়ালা সন্ন্যাসীর বিচারক দেখিতে পাইবেন যে, তাঁহাদের আলোচ্য সন্ন্যাসী কি করিতেছেন!

ভারতবর্ষের নানা স্থানে দেখিতে পাইবেন, এই সন্ন্যাসীদল শিক্ষাদান, অন্নদান, রুগ্নসেবা প্রভৃতি কঠোর সন্ন্যাস-ব্রত সাধনে রত আছেন। এই সন্ন্যাসীরা যে পর্বত-গুহায় বা নির্জন স্থানে বাস করেন না, তাহার কারণ—তাঁহারা গুরুপদেশে বুঝিয়াছেন —নরসেবা অপেক্ষা ঈশ্বরের উচ্চ সাধন নাই। উক্ত সমালোচক শ্রেণী ব্যতীত যাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণকে ভক্তি করেন, তাঁহারা সামান্য দুইটি কথা বুঝিয়া দেখিবেন—কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ পরমহংসদেবের আদেশ ছিল। যিনি এই দুইটি ত্যাগ করিবার কখনও চেষ্টা করিয়াছেন,—তিনি উপলব্ধি করিবেন যে—এ ত্যাগ সামান্য ত্যাগ নয়। কেহ বলিতে পারেন—"ভাল, ইহাদের সঙ্গে কামিনীর সংস্রব দেখিতে পাই না বটে, কিন্তু কাঞ্চন?—কাঞ্চনের সহিত তো ইহাদের সংস্রব দেখিতে পাই?" উত্তরে আমাদের বক্তব্য যে কাঞ্চনের সহিত ইহাদের নির্লিপ্ত সম্বন্ধ; যে রৌপ্যখণ্ড এই শ্রেণীর কোনও সন্ন্যাসীর হাতে দেখিতেছেন, তাহা তাঁহার নিজের ব্যয়ের নিমিত্ত নয়। উপরোক্ত সমাজ-হিতসাধন কার্য্যে অর্থের প্রয়োজন, যে রৌপ্যখণ্ড দেখিতেছেন, তাহা সেই প্রয়োজনীয় অর্থ। যাঁহারা সাধক—তাঁহাদের নির্জন স্থান আবশ্যক। মহাত্মা বিবেকানন্দ পৃথিবী পর্য্যটন করিয়া বুঝিয়াছেন যে, এরূপ সাধনার স্থানের অত্যন্ত অভাব, সেই নিমিত্ত তিনি বিদেশীর নিকট ভিক্ষার্জ্জিত অর্থে মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ও সেই মঠ যে ফণ্ড দ্বারা চালিত, তাহা অধিক নয়—মঠবাসী প্রতি ব্যক্তির প্রতি তিন টাকা কুলায় কিনা সন্দেহ! যদি স্বরূপ অবস্থা কেহ অবগত হন, তাহা হইলে এই সন্ন্যাসীদের অর্থলোলুপ জ্ঞান না করিয়া যথাসাধ্য তাঁহাদের সাহায্যে অগ্রসর হইবেন।

আমরা অপরকে এই কথা বুঝাইবার চেষ্টা পাইলাম; কিন্তু অন্তরে বুঝিতেছি যে, এই সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে আমাদেরও অনেক বুঝিবার আছে। এই সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে অনেককে তাঁহাদের বাল্যাবস্থায় পরমহংসদেবের সেবায় নিযুক্ত দেখিয়াছিলাম! তখন আমরা বিজ্ঞ, ইহারা বালক। পরমহংসদেব আনন্দের সহিত পরিচয় দিতেন যে, এই বালকেরা আমার এক বলকের দুধ; ইহাদের শেষ জন্ম—আর জন্ম হইবে না। বার বার এই কথা শুনিতাম, কিন্তু ভাবিতাম, তিনি আদর করিয়া এইরূপ বলেন। কিন্তু এখন পরমহংসদেবের কৃপায় কিঞ্চিৎ অনুভব হইতেছে। পরমহংসদেবকে সমাধি-অবস্থায় দেখিতাম—এই বালকেরা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে সক্ষম হইয়াছে। তিনি সকলের দ্রব্য স্পর্শ করিতে পারিতেন না; কিন্তু এই বালকদের হস্তে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিতেন। পীড়িত অবস্থায় এই বালকেরাই তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকিত; রোগের যন্ত্রণা এই বালকদিগকে জানাইতেন, কখনও কখনও ইহাদের উপর স্নেহপূর্ণ অভিমান করিতেন। এখন বুঝিতেছি—এ সকল তো অন্তরঙ্গের লক্ষণ। এই বালকেরাই তাঁহার অন্তরঙ্গ ছিল! এখন বুঝিতেছি—এইরূপ গুরুসেবার ন্যায় উচ্চ সাধনা—কয়জন ভাগ্যবানের অদৃষ্টে ঘটে? পুরাণপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, গুরুগৃহে শিষ্য যাইলে গুরু তাহাকে গরু চরাইতে দিতেন, গৃহকার্য্য ও নিজের সেবায় নিযুক্ত রাখিতেন। যে শিষ্য এই সকল কার্য্যে মনোযোগী হইতেন, গুরু তাঁহাকে একদিনে 'তত্ত্বমসি' বুঝাইয়া

*ব্রহ্মজ্ঞান দান করিতেন এবং সেই লব্ধকাম শিষ্য তাঁহারও সেবারত শিষ্যকে ব্রহ্মজ্ঞান ঐরূপ একদিনেই দিতেন। এখন ভাবি—পরমহংসদেবের সেবা কি তাঁহার শিষ্যগণের নিষ্ফল হইয়াছে? এরূপ চিন্তা মনে স্থান দিলে পরমহংসদেবের প্রতি বিশ্বাসের অভাব প্রমাণ হয়।

পরমহংসদেবের লীলা সংবরণের কিছু পরে বিবেকানন্দ গাজীপুরের পাওহারী বাবার নিকট যান। তিনি পাওহারী বাবার নিকট একটি অমূল্য উপদেশ লাভ করেন। পাওহারী বাবা বলিয়াছিলেন—'গুরুভাইকো গুরুসে অভেদ জান্ না।' এই উপদেশ বিবেকানন্দের হৃদয়ে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত ছিল। যখন বিবেকানন্দ হিমালয়ে সাধন করিতে যান, আমাদের নিকট যোড় হাতে বিদায় লইয়াছিলেন। দীন ভিক্ষুকের মত বলিয়াছিলেন—"ভাই আশীর্ব্বাদ করো—আমার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হোক।"

বিবেকানন্দের গৌরব যখন জগতে প্রকটিত হইল, যখন তিনি অনেকের নিকট জগৎগুরু বলিয়া বাচ্য হইলেন, যখন শত শত গৃহে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি পূজা হইতে লাগিল,—তখনও তিনি তাঁহার নিরক্ষর গুরু ভাই হইলেও তাঁহার নিকট শিক্ষাপ্রার্থী হইতেন। গুরু ভাইয়ের কথা গুরুর আদেশের ন্যায় পালন করিতেন। কিন্তু দেখিতে পাই, এরূপ উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও আমাদের শিক্ষা হয় নাই। গুরু ভাইদের নিকট আমাদের দীনতা কোথায়? পশু-বুদ্ধির পরবশ হইয়া কখনও কখনও তাঁহাদের বিচারক হইয়া থাকি। তাঁহাদের দেখিয়া বুঝিতে পারি না যে, গুরুদেবই তাঁহাদের অন্তরে থাকিয়া লীলা করিতেছেন! জীবন্মুক্ত হইবার আমাদের বাসনা আছে, কিন্তু সহজ উপায় উপেক্ষা করিতেছি। একবার যদি হৃদয়ে ধারণা করিতে পারি যে, গুরুদেব তাঁহার শিষ্যে বিরাজিত, তাহা হইলে জীবন্মুক্ত হইবার বাকী কি থাকে? গুরুদেবের ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ হয়। সর্ব্বজীবে-সর্ব্বস্থানে তাঁহার দর্শন পাই।

[৪ঠা ভাদ্র, ১৩৩১ সাল, সাপ্তাহিক 'বসুমতী' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়]

প্রথম প্রবন্ধ

স্বামী বিবেকানন্দ

(প্রবন্ধ-চতুষ্টয়)

পরমহংসদেবের কৃপালাভ করিয়া যে সময় তাঁহার ভক্তবৃন্দ পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে দেখিতে লাগিলেন, সেই সময় ভক্তেরা কথা-প্রসঙ্গে, কে কিরূপে তাঁহাকে প্রথম দর্শন করেন, তাহার আলোচনা হইত। সে সকল কথা বার বার বলিয়া ও শুনিয়া পুরাতন হইত না। পরস্পর পরস্পরকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতাম ও মুগ্ধচিত্তে বক্তা বলিতেন এবং শ্রোতারা শুনিতেন। এরূপ প্রসঙ্গ বিবেকানন্দের সহিত আমার অনেক বার হইয়াছিল। পরমহংসদেবের সহিত বিবেকানন্দের প্রথম মিলন কিরূপে ঘটিয়াছিল, তাহা বার বার শুনিয়াও আমার তৃপ্তি লাভ হইত না, এবং পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিতাম। যাহা শুনিয়াছিলাম, তাহা যেন আজ শুনিয়াছি, এইরূপ আমার স্মৃতিতে জাগরিত আছে; এবং সেই ঘটনা আমার যেরূপ মধুর বোধ হয়, আমার প্রকাশ-শক্তির অভাব সত্ত্বেও "উদ্বোধনে"র পাঠকের সে সকল কথা মধুর হইবে, এই ভরসায় প্রবন্ধ লিখিতেছি। আমার প্রকাশ-শক্তির অভাব, তাহা সৌজন্য সহকারে দীন ভাবে প্রবন্ধ লিখিবার পূর্ব্বে বলিতে হয় বলিয়া যে বলিলাম, তাহা নহে। আমি সত্যই অভাব অনুভব করিতেছি। হৃদয়ভাবে উৎফুল্ল বিবেকানন্দের মুখ-কান্তি আমি দেখাইতে পারিব না। তাঁহার জগৎ-মুগ্ধকারী কণ্ঠস্বর—মসী-চিত্রিত অক্ষরে নাই। তাঁহার বলিবার ছটার অভাব। প্রতি কথায় গুরুর প্রতি অচলা ভক্তি রসের স্রোত পাঠক পাইবেন না। তথাপি আমার ভরসা, সে মধুর ঘটনা আমার নীরস ভাষা সরস করিবে।

ভক্ত চূড়ামণি ৺রামচন্দ্র দত্তের কথায়, রামচন্দ্র দত্তের সমভিব্যাহারে বিবেকানন্দ প্রথম দক্ষিণেশ্বরে যান। রামচন্দ্র দত্ত সম্বাদে তাঁহার ভাই এবং বাল্যকালে শিক্ষক ছিলেন। বিবেকানন্দের সাংসারিক নাম নরেন্দ্র ছিল এবং বীরেশ্বর মহাদেবকে মানত করিয়া তাঁহার জন্ম হওয়ায়, তাঁহার মাতা ও নিকট আত্মীয়েরা বীরেশ্বর বলিতেন; ক্রমশঃ বীরেশ্বর নাম "বিলে" নামে পরিণত হয়। রামচন্দ্র তাঁহাকে "বিলে" বলিতেন। বিবেকানন্দের মুখে শুনিতাম, একদিন রাম দাদা বলিলেন—"বিলে, কি এদিক ওদিক ব্রাহ্ম সমাজে ঘুরে বেড়াস্—যদি ধর্ম্ম-কর্ম্ম ক'র্‌বার ইচ্ছা থাকে, দক্ষিণেশ্বরে চল। —এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালে কিছু হবে না।"

রাম বাবুর সহিত বিবেকানন্দ দক্ষিণেশ্বরে আসিলেন। তিনি পরমহংসদেবের গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র, পরমহংসদেব ব্যস্ত হইয়া, তাঁহার নিকটে আসিলেন এবং

বিবেকানন্দ যেন তাঁহার বহুদিনের পরিচিত, এইরূপ ভাব প্রদর্শন করিলেন। বিবেকানন্দকে ধরিয়া তাঁহার ঘরের পশ্চিম দিকের চাতালে লইয়া গেলেন, বলিতে লাগিলেন, "তোর অপেক্ষায় রহিয়াছি, তুই আসিতে এত দেরী করিলি? গৃহী লোকের সহিত কথা কহিয়া, আমার ওষ্ঠ দগ্ধ হইতেছে, এখন তোর সহিত আলাপ করিয়া জুড়াইব।" বিবেকানন্দ বলিতেন, "আমি ভাবিতে লাগিলাম, এ কি উন্মাদ! রাম দাদা আমায় কার নিকট আনিল? বুদ্ধি—উন্মাদ বলিতেছে, কিন্তু প্রাণ আকৃষ্ট! অদ্ভুত খ্যাপা—অদ্ভুত তাঁহার আকর্ষণ—অদ্ভুত তাঁহার প্রেম। খ্যাপাও ভাবিলাম, মুগ্ধও হইলাম। সে এক অপূর্ব্ব অবস্থা।' বিবেকানন্দ যখন বাড়ী ফিরিলেন, পরমহংসদেব তাঁহাকে আসিবার নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বাড়ী আসিয়া বিবেকানন্দ ঐ খ্যাপার কথাই ভাবেন। এ কি—এরূপ তিনি কখনো দেখেন নাই! কিছুই বুঝিতে পারেন না—অথচ আকৃষ্ট!

খ্যাপার কথা রাম দাদাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—পরিচয় পাইলেন,—খ্যাপা কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী। এই পরিচয়ে তাঁহার আকর্ষণ শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। আশৈশব তিনি কামিনী-বিদ্বেষী, শিশুকালে মৃণ্ময় শ্রীরাম-মূর্ত্তি কিনিয়া আনিয়া খেলা করিতেন; কিন্তু যে দিন শুনিলেন, তিনি সীতাকে বিবাহ করিয়া গৃহী হইয়াছিলেন, সে দিন হইতে সে পুতুল তাঁহার ভাল লাগিল না। যোগীশ্বর মহাদেবের পুতুল আনিলেন, একটা বড় কল্‌কে কিনিয়া আনিলেন, সেইটি মহাদেবের গাঁজার কলিকা হইল এবং সেই গাঁজার কলিকা লইয়া তিনি গাঁজা টানিবার ভাণ করিয়া, বাল্যখেলা করিতেন। সন্ন্যাসী শিবের প্রতি বাল্যকালে বড়ই শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার পিতামহ সন্ন্যাসী হইয়া গৃহ ত্যাগ করেন, সেই আদর্শে তাঁহার শৈশবকাল হইতেই সন্ন্যাসী হইবার সাধ জন্মে। পরে ইংরাজী শিক্ষার প্রতাপে যদিচ শিব-উপাসনা পৌত্তলিকতা মনে করিতেন, কিন্তু যোগের প্রতি অনুরাগের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। এই অবস্থায় যখন তিনি শুনিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরের পাগল কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী, তখন সেই পাগলের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, কামিনী-কাঞ্চন-ত্যাগী পুরুষ কখনই সামান্য ব্যক্তি নন। তাঁহার সহিত মতের বিরোধ হইতে পারে, কিন্তু এ উচ্চ ত্যাগের আদর্শ আর কোথাও নাই! স্বভাবজাত ত্যাগী বিবেকানন্দ, সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষের দ্বারা প্রগাঢ়রূপে আকৃষ্ট হইলেন। পুনঃ পুনঃ দক্ষিণেশ্বরে না গিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। প্রেমের শৃঙ্খল দিন দিন তাঁহাকে প্রগাঢ় রূপে আবদ্ধ করিতে লাগিল। খ্যাপার অমানুষিক প্রেম—এ প্রেম জগতে তিনি কোথাও পান নাই, গুরুর প্রেমে বিবেকানন্দ একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন। এই অবস্থায় দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করেন। একদা পরমহংসদেব উপদেশ প্রদান করিতেছেন, উপদেশের প্রতি বিবেকানন্দের লক্ষ্য নাই। পরমহংসদেব ডাকিলেন, বলিলেন—"শোন্ না, কথা শোন্ না।" বিবেকানন্দ উত্তর করিলেন—"কথা শুনিতে আসি নাই।" পরমহংস জিজ্ঞাসা করিলেন—"তবে কি করিতে আসিস্?" বিবেকানন্দ উত্তর দিলেন, "তোমাকে ভালবাসি, তোমাকে দেখিতে

আসি।" তন্ত পরমহংসদেব উঠিয়া, বিবেকানন্দকে আলিঙ্গন করিলেন, উভয়ে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ হইয়া অনেকক্ষণ স্থির রহিলেন।

এইরূপে গুরু-শিষ্যে প্রেমের লীলা চলিতে লাগিল। ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, বাদানুবাদ, তর্ক-বিতর্ক প্রায়ই হয়। বিবেকানন্দ সমাধি প্রভৃতি মানেন না। সমাধিকে বলেন,—"ও তোমার মাথায় ব্যারাম!" দেব-দৃষ্টিতে পরমহংস যাহা দর্শন করেন, তাহা তার্কিক বিবেকানন্দ বলেন—"ও তোমার মস্তিকের ভ্রম! অন্ধবিশ্বাসে সাকার মূর্তিমান।" বিবেকানন্দ বলিতেন, "এইরূপে তো তর্ক-বিতর্ক করি। একদিন পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাল, তুই অন্ধের বিশ্বাস কাকে বলিস্?" (পরমহংসদেব অন্ধবিশ্বাসকে অন্ধের বিশ্বাস বলিতেন) গদগদ হইয়া বিবেকানন্দ বলিতেন, "সেই দিন বিষম দায়ে ঠেকিলাম!" বলিতেন,—"অন্ধবিশ্বাস বুঝাইবার চেষ্টা করা দূরে থাক, আমি স্বয়ং অন্ধ-বিশ্বাস কাহাকে বলে, যত বুঝিবার চেষ্টা করি, ততই দেখি একটি অর্থহীন কথা ব্যবহার করি মাত্র। অন্ধ-বিশ্বাসের লক্ষণ যতই দেবার চেষ্টা করি, সব লক্ষণই অযৌক্তিক হয়। বিদ্যা-বুদ্ধি যত ছিল, সব নাড়াচাড়া করিতে লাগিলাম, অন্ধ বিশ্বাসের লক্ষণ আর হয় না। এইরূপে শিক্ষিত বিবেকানন্দ অশিক্ষিত খ্যাপার নিকট আপনাকে পরাজিত জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

বৈজ্ঞানিক তর্ক-যুক্তি, সিদ্ধবিশ্বাসের নিকট কোন রূপে অগ্রসর হইতে পারে না। পরাস্ত হইয়া বিবেকানন্দ, গুরুর নিকট যাহা শুনেন, তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে চান। গুরু বলেন—"না, এ তোমার পথ নয়,—সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া বিশ্বাস করো। আমি বলিয়াছি বলিয়াই বিশ্বাস করিও না।" কিরূপে দেখিয়া শুনিয়া লইতে হয়, তাহা বিবেকানন্দ জানেন না। দেখিবার শুনিবার উপায় দিন দিন গুরুর নিকট বুঝিতে লাগিলেন। নিত্য নিত্য শিষ্য দেখিতে পান যে—সমস্ত প্রত্যক্ষ। জড়-বিজ্ঞানে যেরূপ প্রত্যক্ষ করা যায়, আধ্যাত্মিক বৈজ্ঞানিক সত্যও সেইরূপ প্রত্যক্ষের বিষয়। গুরুর উপদেশে ও সাধনায় চক্ষু উন্মীলিত হইলেই প্রত্যক্ষ করা যায়। ক্রমে আভাস পাইলেন, সমাধি—মস্তিষ্কের বিকার নয়,—গুরুর নিকট সমাধি-লাভের প্রার্থী হইলেন—বলিলেন—'আমায় পরম পদার্থ নির্বিকল্প সমাধি দান করুন। আমি আপনার কৃপায় সমাধিস্থ হইয়া থাকিব।" গুরু তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—"এই নির্বিকল্প সমাধি পাইলেই তুমি পরিতৃপ্ত?" ইহাতো পূর্ব্বে একদিন তুমি দক্ষিণেশ্বরে আসিবার সময় তোমার বক্ষে হস্ত দিয়া দিতে প্রস্তুত ছিলাম। তুমি ভয় পাইয়া বলিলে,—"করো কি গো, আমার যে বাপ আছে, মা আছে!" দক্ষিণেশ্বরের এ ঘটনা কি পাঠকের জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে? বিবেকানন্দের নিকট শুনিয়াছিলাম, একদিন দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেব তাঁহার কোমল হস্ত বিবেকানন্দের বক্ষে প্রদান মাত্রই সমস্তই শূন্যাকার হইয়া যাইতে লাগিল। তিনি মহাভয়ে ব্যগ্র হইয়া বলিলেন,—"কর কি গো! আমার যে বাপ আছে—মা আছে!"

সমাধিলাভের প্রার্থী হইলে, আমরা বলিতেছিলাম, গুরু, শিষ্যকে তিরস্কার

করিলেন, বলিলেন—"জীবের যাহা পরম বস্তু, তাহা তোমার নয়। তুমি কেবল স্বার্থপর হইয়া আপনার নিমিত্ত জগতে আস নাই। তবে কেন সমাধিস্থ হইয়া থাকিবে—প্রার্থনা করিতেছ? সংসারে আসিয়াছ, সংসারের কার্য্য কর। জীবের নির্ব্বিকল্প সমাধি হইলে পর, তাহার আর ফিরিবার শক্তি থাকে না। একবিংশতি দিবস গতে শরীর ত্যাগ হয়। তুমি শক্তিমান্, সমাধি-লাভের পরও ফিরিবে, তোমার মহাকার্য্য পড়িয়া রহিয়াছে। কার্য্য সমাধা না করিয়া জগত ত্যাগ করিতে পারিবে না। সমাধি চাও, সমাধি পাইবে।"

অকস্মাৎ একদিন কাশীপুরের বাগানে বিবেকানন্দের একটি অবস্থা হইল, যে সকল ভক্তেরা তাঁহার নিকটে ছিলেন, তাঁহার মৃতবৎ অবস্থা দর্শনে ভীত হইলেন। ক্রমে বিবেকানন্দ সংজ্ঞা লাভ করিলেন। গুরুর নিকট সংবাদ গেল, গুরু হাসিতে লাগিলেন। বিবেকানন্দও উপস্থিত হইলেন। গুরু বলিলেন, "যাহা চাও, তাহা এই, এই নির্ব্বিকল্প সমাধি! তোমার নিমিত্তই তুলিয়া রাখিলাম, কিন্তু উপস্থিত বাক্সে আবদ্ধ রহিল, চাবি আমার নিকট থাকিবে। কার্য্য করো, কার্য্যান্তে পাইবে।"

কি কার্য্যে বিবেকানন্দ গুরু কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছিলেন, তাহা সসাগরা পৃথিবী দেখিয়াছে। বিবেকানন্দ কার্য্য করিতেন, বলিতেন, তাঁহার গুরুর কার্য্য করিতেছেন। কেহ কেহ এ বিষয়ে সন্দিহান চিত্ত,—পরমহংসদেবের ভাবের সহিত বিবেকানন্দের ভাবের পার্থক্য অনুভব করেন—সম্পূর্ণ ভ্রম। এইমাত্র প্রভেদ, পরমহংসদেবের মহাজ্ঞান—সাধারণের চক্ষে মহাভক্তি—আবরণে আবরিত ছিল, বিবেকানন্দের ভক্তি জ্ঞান-আবরণে আবরিত! উভয়ের একই ভাব, কার্য্যে ভিন্ন ভাবধারণ। মহা মহা বৈজ্ঞানিকের সহিত বিবেকানন্দের সংঘর্ষ হইবে, সেই নিমিত্তই তিনি কঠিন জ্ঞান-আবরণে আবরিত হইতেন। কিন্তু যদি কেহ ভাগ্যক্রমে তাঁহাকে গান করিতে শুনিয়া থাকেন, তাঁহার চক্ষে প্রেমাশ্রু দেখিয়া থাকেন, কণ্ঠরোধ হইয়া গদগদ—ভক্তি বিভোর মহাপুরুষ দর্শন করিয়া থাকেন—তিনি হৃদয়ে অনুভব করিবেন, জ্ঞানভক্তির পার্থক্য—লোকে অজ্ঞান বশতঃ করিয়া থাকে। জ্ঞানভক্তি এক, জ্ঞান বিবেকানন্দ,—ভক্তি পরমহংস অভেদ। এই অভেদ জ্ঞান-লাভে তিনি বুঝিবেন, পরমহংসদেব যে বলিতেন, "ভাগবত-ভক্ত ভগবান" তাহা সত্য।

["উদ্বোধন" পাক্ষিক পত্রিকায় (৭ম বর্ষ, ১৫ই মাঘ, ১৩১১ সাল) প্রথম প্রকাশিত]

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধ

রামকৃষ্ণ পরমহংস ও বিবেকানন্দের গুরু-শিষ্য-ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতে হইলে, রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনে উদ্দেশ্য কি ছিল, তাহা বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাওয়া উচিত। এ উদ্দেশ্য স্বয়ং বিবেকানন্দই তাঁহার "My Master" নামক প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছেন। উপস্থিত আমার বর্ণনা উক্ত প্রবন্ধের ছায়ামাত্র। সে জীবন্ত ভাষা, জ্বলন্ত গুরু-ভক্তি ও হৃদয়ের মিল উচ্ছ্বাসের অভাব নিশ্চয় হইবে। যাঁহারা পরমহংস-দেবের পাদস্পর্শ করিয়াছেন, পরমহংসদেবের শ্রীমুখে তাঁহার ধর্ম্মানুরাগের কথা শুনিয়াছেন, এবং বিবেকানন্দের "My Master" প্রবন্ধে তাহার প্রতিরূপ ছবি পাইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রথম শুনিয়া যাহা সম্পূর্ণ ধারণা করিতে পারেন নাই, যে ধারণা তাঁহার অস্ফুট ছিল, বিবেকানন্দের বর্ণনায় তাহা উজ্জ্বলরূপে বিকাশ পাইয়াছে। দেখিতে পাওয়া যায় যে, পরমহংসদেব তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য তাঁহার বাল্যাবস্থাতেই অবগত ছিলেন, যে কার্য্যভার লইয়া তিনি অবতীর্ণ হন, তাহা বাল্যাবস্থাতেই তাঁহার গোচর হইয়াছিল। তিনি কে, কি আধারে গঠিত, তাহা তিনি বাল্যাবস্থায় সম্পূর্ণ জানিতেন। যাহা জানিতেন তাহা কল্পনা বা সত্য—ইহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তিনি তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিলেন। জড় বৈজ্ঞানিক যেরূপ প্রত্যক্ষবাদী, যাহা পরীক্ষিত নয়, তাহা যেরূপ অগ্রাহ্য করেন, অন্তর্বিজ্ঞান সম্বন্ধে পরমহংসদেবও সেইরূপ প্রত্যক্ষবাদী ছিলেন। পরীক্ষায় যাহা প্রত্যক্ষীভূত না হইত, তাহা পুস্তকে বা লোক-মুখে বর্ণিত হইলে, তিনি প্রত্যয় করিতেন না। তিনি স্বয়ং দেখিবেন, এই তাঁহার সংকল্প ছিল। কঠোর সাধনায় সংকল্প সিদ্ধ হয়। সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া দিন দিন তাঁহার অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ পাইতে লাগিল। জড়বিজ্ঞানে যে সমস্ত জড় সম্বন্ধ দেখা যায়, তাহার অন্তর্নিহিত একটি অবিনাশী সম্বন্ধ রহিয়াছে, এক তারে সংবদ্ধ একটি অপরিবর্ত্তনশীল নিয়মে সংযোজিত, সমস্তই এক, একের বিকাশ মাত্রই বৈচিত্র্য, তিনি দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন—ঈশ্বর কথার কথা নন, সত্য—প্রত্যক্ষের বিষয়,—তাঁহার সহিত আলাপ করা যায়, কথা কওয়া যায়, তাঁহার শরণাপন্ন হইলে গুরুরূপে শিক্ষা দেন, তাঁহার উপদেশে জীবনের উদ্দেশ্য প্রকাশ পায়, জীবন নিরর্থক নয়—বোঝা যায়, জড়ানন্দ তুচ্ছ হইয়া পরমানন্দ লাভ হয়। পরমহংসদেব উৎকট সাধনে এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিলেন। যেরূপ আমরা পরস্পর পরস্পরের সহিত কথাবার্ত্তা কই, জগন্মাতার সহিত তাঁহার সেইরূপ কথাবার্ত্তা চলিল। তিনি বাল্যাবস্থায় তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, তাহা কল্পনা নয়, জগন্মাতার কথায় নিশ্চিত হইল। জগতের হিত-সাধনায় তাঁহার আবির্ভাব—তিনি বুঝিলেনও—মহাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

একদিন এক বালকশিষ্য আসিয়া পদতলে প্রণাম করিল। শিষ্যের প্রথম কাতর প্রশ্ন—"আপনি কি ঈশ্বর বিশ্বাস করেন?" গুরু বলিলেন,—"হাঁ।" শিষ্য জিজ্ঞাস

করিলেন,—"প্রমাণ করিতে পারেন?" আবার উত্তর—"হাঁ"। পুনর্ব্বার প্রশ্ন—"কিরূপে?" গুরু বলিলেন,—"তোমায় যেমন দেখিতেছি, তদপেক্ষা ঘনিষ্ঠভাবে তাঁহাকে সম্মুখে দেখিতেছি। তুমিও যদি দেখিতে চাও, দেখিতে পাও।" সেই শিষ্য—আমাদের বিবেকানন্দ। লোকে তখন তাঁহাকে 'নরেন্দ্র' বলিয়া ডাকিত।

গুরুসহবাসে নরেন্দ্র দিন দিন দেখিতে লাগিলেন (আমি নরেন্দ্রের ভাষা অনুবাদ করিয়া বলিতেছি) যে, ধর্ম্ম—কল্পনা নয়, জড়বস্তু অপেক্ষা অধিকতর প্রত্যক্ষীভূত হইবার বস্তু. তাহা আদান-প্রদান করা যায়, মহাপুরুষের দৃষ্টি বা স্পর্শে জীবন পরিবর্ত্তিত হয়। বুদ্ধ, যিশুখৃষ্ট ও মহম্মদের জীবনীপাঠে শিষ্য দেখিয়াছিলেন যে, উক্ত মহাপুরুষদিগের কথায় মানব পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছিল,—এক্ষণে তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন। ধর্ম্ম—জড়-বস্তুর ন্যায় প্রদান করা যায়, তাঁহার গুরু তাঁহাকে বলিলেন ও শিষ্য তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন। গুরুর কৃপায় দিন দিন তাঁহার প্রবল ধর্ম্ম-পিপাসা মিটিতে লাগিল, তিনি পূর্ণত্বলাভের প্রার্থনা করিলেন, বলিলেন,—"যতদিন দেহ থাকে, আমি পূর্ণত্ব লাভ করিয়া, সমাধিস্থ হইয়া জীবন অতিবাহিত করি—আজ্ঞা করুন।" তখন গুরু বলিলেন,—"কেবল তোমার নিমিত্তই তোমার জীবন নহে,—তোমার জীবনে মহৎ উদ্দেশ্য,—তুমি আমার সহকারী, জগতের হিতসাধন তোমার কার্য্য,—তুমি তোমার নও, তুমি জগতের। পূর্ণ হইবার প্রার্থনা করিতেছ কি—তুমি পূর্ণ।"—পরমহংসদেবের অনেক শিষ্যই জানেন যে কাশীপুরের বাগানে নরেন্দ্রের নির্ব্বিকল্প সমাধি হইয়াছিল।

উক্ত প্রকারে গুরুর নিকট মহাকার্য্যের ভারপ্রাপ্ত হইয়া, সেই মহাভার কিরূপে বহন করিবেন, তন্নিমিত্ত চিন্তান্বিত হইলেন। এই মহাভারবহনে কতদূর তিনি সক্ষম, তাহাও তিনি তৎকালে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক, এই গুরুভার তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইল। গুরু লীলাসংবরণ করিলেন। লীলাসংবরণের পূর্ব্বে কয়েকটি শিষ্যের ভার তাঁহার উপরেই অর্পিত হইয়াছিল। নাবালক সন্তান থাকিলে, পিতা যেরূপ তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন, নরেন্দ্রের ধর্ম্ম-জীবনের পিতা, সেইরূপ তাঁহার অজ্ঞ সন্তানের ভার অর্পণ করিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন।

নরেন্দ্রের এই ভারগ্রহণের কিরূপ উপযোগিতা ছিল, তাহা সংক্ষেপ আলোচনা করা যাউক। গুরু যেরূপ বাল্যকাল হইতে কামিনীকাঞ্চনত্যাগী, নরেন্দ্রের বাল্যক্রীড়া দেখিলে অনুভূতি হয় যে, নরেন্দ্রও সেইরূপ স্বভাবসিদ্ধ কামিনীকাঞ্চনত্যাগী। বাল্যকালে শ্রীরামচন্দ্রের পুতুল লইয়া খেলা করিতেন, কিন্তু যখন শুনিলেন যে রামচন্দ্র বিবাহ করিয়াছিলেন, অমনি বালক সেই পুতুল পরিত্যাগ করিল,—যোগীশ্বর মহাদেবের পুতুল লইয়া ক্রীড়া-উপাসনা করিতে লাগিল। তাঁহার পিতামহ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, সেই দৃষ্টান্তে বাল্যকালে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুরাগ তাঁহার জন্মায়। পাঠ্যাবস্থায় হঠাৎ পিতৃবিয়োগে একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়েন। তাঁহার পিতা হাইকোর্টের উকিল ছিলেন, মক্কেলের অনেক কাগজপত্র তাঁহার জিম্মায় ছিল। সেই কাগজপত্র গ্রহণাভিলাষী হইয়া কোনও এক উকীল তাঁহাকে অর্থপ্রলোভন দেখান, নরেন্দ্র লোষ্ট্রবৎ সেই

কাঞ্চন পরিত্যাগ করেন। তাঁহার দয়ায় অসীম বিকাশ ছিল, পিতৃবিয়োগের পর তিনি একরকম একাহারী হইলেন। প্রায়ই জননীকে বৈকালে বলিতেন, "আমার নিমন্ত্রণ আছে।" মনের ভাব এই যে, তিনি বৈকালে আহার না করিলে, পরদিন কতক অন্নের সাশ্রয় হইবে। অনেক সময়েই উপবাস দিতেন। একদিন এই উপবাসবশতঃ দুর্ব্বলতায় পথে মূর্ছিত হইয়া পতিত হইতে হয়। যখন দিন চলে না, এইরূপ দৈন্য অবস্থাতেও তিনি দশটি টাকা পাইয়া, পাঁচটি টাকা এক নিঃস্ব গুরুভাইকে প্রদান করেন। এরূপ তাঁহার দয়ার দৃষ্টান্ত অনেক। মহাদুঃখে পতিত হইয়া, একদিন গুরুর নিকট বলেন,—"মহাশয়, আমার যাতে মাতা-ভ্রাতার অন্নের সংস্থান হয়, তাহা করুন। আপনি যদি আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করেন, তাহা হইলেই আমার অন্নসংস্থান হইবে।" গুরু আদেশ দিলেন, "কালীঘরে যাইয়া তুমি প্রার্থনা করো, তোমার মনোরথ সফল হইবে।" গুরুবাক্যে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল ; গুরুদেব সিদ্ধসংকল্প, নরেন্দ্র তাহা ভূয়োভূয়ঃ পরীক্ষায় জানিয়াছেন। মহাপুরুষের আদেশানুসারে দৈন্য নিবারণার্থ কালীঘরে উপস্থিত হইলেন। কালীঘর হইতে ফিরিয়া আসিলে পর, গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, প্রার্থনা করিয়াছ?" নরেন্দ্র উত্তর করিলেন,—"হ্যাঁ, বিবেক বৈরাগ্য লাভের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছি,—জগন্মাতার নিকট অন্নের প্রার্থনা আমার মুখে আসিল না।"

আর একদিন পরমহংসদেব তাঁহাকে নিরিবিলি বলেন,—"তুমি অষ্টসিদ্ধি লাভ করিতে ইচ্ছা করো? আমি তোমায় অষ্টসিদ্ধি প্রদান করিতে পারি।" নরেন্দ্র জানিতেন যে তাঁহার গুরুর ইঙ্গিতে, স্পর্শে, আজ্ঞায়—ঘোরতর কলুষিত জীবন পরিবর্ত্তিত হইয়া, লোকে পরম পবিত্রতা লাভ করিতে পারে। তাঁহার গুরুর অসাধ্য কিছুই নাই। গুরু তাঁহাকে অষ্টসিদ্ধি তখনই প্রদান করিতে পারিবেন। গুরুকে অষ্টসিদ্ধি প্রদানে উৎসুক দেখিয়া, নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"অষ্টসিদ্ধিলাভে ঈশ্বর-লাভ হয় কি?" গুরু উত্তর করিলেন,—"অণিমা, লঘিমা প্রভৃতি অমানুষিক শক্তিসম্পন্ন হয়,—যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই করিতে পারে। কিন্তু ঈশ্বর-লাভের পথ স্বতন্ত্র।" শিষ্য করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন,—"গুরুদেব, আমি শক্তি-প্রার্থনা করি না, আমি ঈশ্বরলাভ করিতে চাই। আজ্ঞা করুন, আমার ঈশ্বর লাভ হোক।"

নরেন্দ্রের যেরূপ ঈশ্বর অনুরাগ, তাঁহার দয়াও সেইরূপ অসীম। যদি কাহাকে দেখিতেন যে, দুর্বুদ্ধিবশতঃ পরমহংসদেবের কৃপায় বঞ্চিত হইতেছে, নরেন্দ্র সেই অভাগার নিমিত্ত সাতিশয় ব্যাকুল হইতেন। যাহাতে সে কৃপাভাজন হয়, সেইজন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেন। যতক্ষণ না পরমহংসদেব তাহাকে কৃপা করিতে সম্মত হইতেন, ততক্ষণ গুরুর চরণ ছাড়িতেন না। কাহারও শাসনের নিমিত্ত যদি গুরু, শিষ্যদিগকে আজ্ঞা দিতেন, যে অমুক ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ করিও না, নরেন্দ্র সে নিষেধ শুনিতেন না। তিনি সেই ভাগ্যহীনের নিকট গিয়া তাহাকে টানিয়া আনিয়া গুরুর পদপ্রান্তে অর্পণ করিতেন। বলাবাহুল্য যে, সেই ভাগ্যহীন, দয়াল নরেন্দ্রের দয়াবলে পরমহংসদেবের দয়া লাভ করিয়া মহাভাগ্যবান হইত।

নরেন্দ্রের জগৎ-হিতকর কার্য্যসাধনের ভারগ্রহণ করিবার উপযোগিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম। সম্পূর্ণ পরিচয়—বৃহৎ পুস্তকাকারে পরিণত হয়। এক্ষণে দেখা যাউক, তাঁহার গুরুর কি কার্য্য এবং নরেন্দ্র কিরূপে তাঁহার সহকারী হইয়াছিলেন।

পরমহংসদেব যখন জগৎ সমক্ষে উদয় হন, তখন ঘোরতর ধর্ম্ম-বিপ্লব। জড়বাদী মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি,—"জড় হইতেই সমস্ত, জড়ের সংযোগেই আত্মা, জড় ব্যতীত আর কিছুই নাই।" খৃষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীরা প্রতিনিয়তই বলিতেছেন, "যদি অনন্ত নরকাগ্নি হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে চাহ, যিশুখৃষ্টের শরণাপন্ন হও।" প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাহ্ম বলেন, —"বেদ, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি কিছুই মানিবার আবশ্যক নাই, কোনটিই অভ্রান্ত নয়, কোনটিই ঈশ্বরবাক্য নয়। আপনার সহজজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া সকল ধর্ম্মের সারমর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক দিন দিন অগ্রসর হইতে থাক।" ইংরাজিশিক্ষায় শিক্ষিত-হৃদয় হইতে হিন্দুর দেব-দেবী অন্তর্হিত হইয়াছে। যাহাদের নিকট হিন্দুধর্ম্মের আদর আছে, তাহাদের মধ্যেও মহাদ্বন্দ্ব উপস্থিত। শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতির দ্বন্দ্ব তো চলিতেইছে,—এমনকি সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির মধ্যেও বিরোধ,—এইরূপে তিলক কাটিতে হয়, এইরূপে রক্তচন্দনের ফোঁটা কাটিতে হয়, এইরূপে এই কার্য্য, এইরূপে ওই কার্য্য সম্পন্ন না করিলে নরকগ্রস্ত হইতে হইবে,—এই ঘোরতর বিবাদ। প্রকৃত ধর্ম্মাপিপাসুর তৃপ্তির স্থান নাই,—মহা দ্বন্দ্বারণ্যের মধ্যে পতিত হইয়া পন্থাহারা! এমন সময়ে পরমহংসদেব প্রচার করিলেন,—"কোন ধর্ম্ম—কোন ধর্ম্মেরই বিরোধী নয়। বাহ্যদৃষ্টিতেই বিরোধ, কিন্তু সকল ধর্ম্মই ঈশ্বর-লাভের ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র। অজ্ঞান-দৃষ্টিতে যে সকল ধর্ম্ম পরস্পর বিরোধী, পরমহংসদেব, সেই সেই প্রত্যেক ধর্ম্ম সাধন করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, সমুদ্রগামী নদ-নদীর ন্যায় সকল ধর্ম্মের গতি ঈশ্বরাভিমুখে ও সকল ধর্ম্মের চরম ঈশ্বরলাভ।" মহা সত্য প্রচার করিলেন, বিতণ্ডা রহিল না।

পরমহংসদেব যখন প্রচার-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তখন যে কেবল ধর্ম্মযাজকেরা তাঁহার বিরোধী হইয়াছিল, তাহা নয়। পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানীরাও খড়্গহস্ত হন। এই শিক্ষাভিমানীদের মতে "ধর্ম্ম ধর্ম্ম" করিয়াই ভারতের অধঃপতন হইয়াছে। ধর্ম্মের কার্য্যকারিতা-শক্তি তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। স্বার্থত্যাগ যে ধর্ম্মের ভিত্তি, তাহা তাঁহারা বোঝেন নাই। জড়তাপ্রাপ্তির নাম ধর্ম্ম—তাঁহারা জানিতেন। স্বার্থত্যাগ ব্যতীত যে কখনো কোন দেশে কোন জাতি বা ব্যক্তি উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই, এই ইতিহাসের সারমর্ম্ম তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। স্বার্থপর ধর্ম্মযাজক-পরিচালিত ধর্ম্মের পরিণাম—জড়তা। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মসাধন যে মহা কর্ম্মশীলতা, তাহা তাঁহাদের অভিমানী বুদ্ধি বুঝিতে দেয় নাই। স্বার্থত্যাগে পরস্পরের ভ্রাতৃভাব যে জাতীয়তার প্রকৃত ভিত্তি, এ জ্ঞান স্বার্থ-জড়িত হৃদয়ে প্রবেশ করে না। গুরু-উপদেশে নরেন্দ্র এই ভিত্তির উপর তাঁহার উচ্চ জীবন গঠন করিলেন।

আমরা এ পর্য্যন্ত 'নরেন্দ্র' বলিয়া আসিতেছি, 'বিবেকানন্দ' বলি নাই। তাহার কারণ এই, গুরুদেব অন্তর্দ্ধান হইলে, নরেন্দ্রের উপর মহাভার পড়িল। তিনি উচ্চ কার্য্য সাধনের নিমিত্ত নানাস্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। যথায় যান, অচিরে

বিখ্যাত হন। তিনি আত্মগোপনের জন্য, নানা স্থানে নানা নামে পরিচয় দিতে লাগিলেন। দীন-কুটীরে প্রবেশ পূর্ব্বক দীনের সম্যক্ অবস্থা জানিবার তাঁহার সংকল্প, কিন্তু যে নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, সে নামে পরিচিত হইলে, তিনি দীন-কুটীরে অবস্থান করিতে পারিবেন না, আদরে অট্টালিকাবাসী তাঁহাকে লইয়া গিয়া অট্টালিকায় স্থান দিবে, দরিদ্র ব্যক্তি তথায় যাইতে পারিবে না,—দরিদ্রসহবাস হইবে না,—এই কারণে তাঁহার আত্মগোপন ও নাম পরিবর্ত্তন। 'বিবেকানন্দ' নাম গ্রহণের পর, ঘরে ঘরে তাঁহার মূর্ত্তি পূজা হইতে লাগিল, আর আত্মগোপনের উপায় রহিল না।

বিবেকানন্দ (এখন বিবেকানন্দ বলিব) গুরুর শিক্ষায় কি জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি উপরোক্ত "My Master" নামক প্রবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম —সকল ধর্ম্মের সমন্বয়। এই সত্যপ্রচারে ব্রতী হইয়া, তিনি ঘরে ঘরে বুঝাইতে লাগিলেন,—"চিত্তশুদ্ধি, আত্মত্যাগ, পরহিতব্রত—ঈশ্বর লাভের উপায়। এই উপায় অবলম্বন করিলে মনুষ্যত্ব লাভ হয়। একমাত্র ত্যাগী ব্যক্তিই জাতীয়তা স্থাপনে সক্ষম। ত্যাগই জাতির আর্থিক ও পরমার্থিক উন্নতির একমাত্র উপায়। স্বার্থত্যাগ মাত্রেই মানব মহাকর্ম্মশীল হইয়া উঠে,—কার্য্যে, দৃষ্টান্তে, উপদেশে—অপরকে স্বার্থ-ত্যাগী করিতে সক্ষম হন, এবং যে জাতি পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে ব্রতী, সে জাতির উন্নতিসাধনের আর বিলম্ব কি থাকে!

বিবেকানন্দের কার্য্য কতদূর ফলবতী হইয়াছে, তাহা যিনি বিবেকানন্দের নাম শ্রুত আছেন, তাঁহার অগোচর নাই। কিন্তু নিন্দুক এক আশ্চর্য্য সৃষ্টি! বোধ হয় সকল মহাকার্যেই তাহাদের প্রয়োজন। নিন্দুক সীতার বনবাস দিয়াছিল, প্রেমের বৃন্দাবনলীলায় জটিলা কুটিলা ছিল, বিবেকানন্দের লীলায়ও নিন্দুকের অভাব নাই। নিন্দুক পরমহংসকে পরিত্যাগ করিয়া, বিবেকানন্দকে ধরিল। তাঁহার স্বদেশ-বিদেশের কার্যে কোনও উল্লেখ করিল না,—মহা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তিনি যে বিদেশীকে সনাতন ধর্ম্ম প্রদান করিয়াছেন, সেই বিদেশীরা আসিয়া, ভারতের সন্তানের ন্যায়, ভারতবর্ষের উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহা দেখিল না, স্বদেশে ক্রিশ্চান দমন ও মিথ্যা ধর্ম্মযাজকের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করিয়া, বেদের মাহাত্ম্য স্থাপনের প্রতি লক্ষ্য রাখিল না; স্বদেশে দীন-গৃহে, রুগ্ন-গৃহে বিবেকানন্দ দ্বারা কার্যে প্রবর্ত্তিত নির্ভীক সন্ন্যাসীদিগের কার্য্য দেখিল না, আত্মীয়-পরিত্যক্ত মুমূর্ষুর সেবা দেখিল না, অনাথ-বালক-আশ্রম দেখিল না, কেবল সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষকে আচারভ্রষ্ট বলিয়া উল্লেখ করিল। নিন্দুক তাহার নিন্দা লইয়া থাকুন, তাহাদের জীবন কাহারও লক্ষ্য করিবার বা ঈর্ষা করিবার নহে, কিন্তু যাঁহারা পরমহংসদেবের মতের সহিত বিবেকানন্দের মতের পার্থক্য দেখেন, তাঁহাদের নিকট আমার সবিনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা একটু স্থির দৃষ্টিতে দেখিলেই বুঝিবেন যে, পরমহংসদেবকেই বিবেকানন্দ প্রচার করিয়াছেন, যথাসাধ্য বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি।

কামিনীত্যাগী শ্রীচৈতন্যদেব-প্রতিষ্ঠিত ভক্তি-ধর্ম্ম কলুষিত হইয়া, নেড়া-নেড়ীর বামাচারে পরিণত হইয়াছে। ভাগবতের মর্ম্ম, যে কামবর্জ্জিত ব্যতীত

রাসলীলাপাঠের কেহই যোগ্য নয়। নিষ্কাম ব্যতীত রাধাকৃষ্ণের প্রেমের লীলা অনুভব করা দুঃসাধ্য। বিবেকানন্দ তাহা বুঝিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে ভক্তি-গান শ্রবণে অনেকে পরিজন ত্যাগ করিয়া কঠোর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে। ত্যাগী ব্যতীত ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত হওয়া বিড়ম্বনামাত্র। এই নিমিত্ত তিনি কর্ম্ম-সাধন প্রচার করিয়াছেন। আবালবৃদ্ধবনিতাকে তিনি উপদেশ দিয়াছেন, "কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও, নচেৎ চিত্তশুদ্ধি হইবে না।" বঙ্গীয় যুবার উপর তাঁহার সমস্ত আশা-ভরসা নির্ভর ছিল। বঙ্গীয় যুবককে তিনি বার বার বলিয়াছেন,—'কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া পতিত ভারতের উন্নতি সাধন করো,—আত্মোন্নতি পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইবে। কার্য্যই ধর্ম্মজীবন, ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কার্য্য কর। —কার্য্য—কার্য্য!—সকল স্বার্থ বিসর্জ্জন দাও, কার্য্যশীল ব্যক্তির নিকট মুক্তি-কামনাও তুচ্ছ,—কার্যের অধিকারী হও।" আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, বিবেকানন্দ যখন তাঁহার গুরুর নিকট সমাধি বা পূর্ণত্ব প্রার্থনা করেন, তখন তাঁহার গুরু তাঁহাকে সেই স্বার্থ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়া, কার্য্যে প্রবৃত্ত করেন। বিবেকানন্দ তাঁহার গুরুদেবের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিয়াছিলেন এবং যিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে চান, তিনি কেবল বহুপৃষ্ঠাব্যাপী রামকৃষ্ণের জীবনী বা উপদেশ পাঠে বুঝিতে পারিবেন না; বিবেকানন্দের জলন্ত দৃষ্টান্ত তাঁহার সম্মুখে প্রতিনিয়ত রাখিতে হইবে।

যাঁহারা বলেন, বিবেকানন্দ ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করেন নাই, তাঁহাদের—"ভক্তিধর্ম্ম কাহাকে বলে"—জিজ্ঞাসা করিলে, উত্তর খুঁজিয়া পাইবেন না। যে মহাত্মা সর্ব্বভূতে ভগবানকে দেখেন, যিনি কায়মনোবাক্যে সেই সর্ব্বভূতব্যাপী ভগবানের সেবায় নিযুক্ত থাকেন, যিনি আপনার অন্তরে যে ভগবান স্থাপিত, তাঁহার সর্ব্বভূতে সর্ব্বব্যাপী ভাব দর্শন করিয়া মুগ্ধচিত্তে তাঁহার উপাসনা করেন,—যদি সেই মহাপুরুষ না ভক্ত হন, তাহা হইলে ভক্ত কে? কেবল ধেই ধেই নাচিয়া একবার চক্ষের জল ফেলিলে যদি ভক্তি হইত, তাহা হইলে ভক্তি অতি অনায়াসলভ্য বস্তু বলিতাম। ভক্তচূড়ামণি পরমহংসদেব তরুণ তৃণের উপর পদবিক্ষেপ করিয়া কেহ চলিয়া গেলে ব্যথা পাইতেন, সকলের মঙ্গলার্থে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য বিবেকানন্দ জনসেবা পরম ধর্ম্ম প্রচার করিয়া কি সেই ভক্ত চূড়ামণি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রীচরণ অনুসরণ করেন নাই? বিবেকানন্দ ভক্তির ভাণের বিরোধী ছিলেন। তিনি পরম ভক্ত পর-সেবার উপদেশ দিয়া তিনি ভক্তিধর্ম্মের সারমর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। যিনি ভক্তিলাভের প্রয়াসী, তিনি গুরুভক্ত—বিবেকানন্দকে জীবনের ধ্রুবতারা স্বরূপ চক্ষের উপর রাখিয়া—পর-সেবায় ব্রতী হইয়া দিন দিন ভক্তি-পথে অগ্রসর হোন, এবং বিবেকানন্দের ন্যায় পরম ভক্তি-ধর্ম্মের অধিকারী হইয়া ভক্তিধর্ম্ম প্রচার করুন। এ আমার উৎসাহ বাক্য নয়, ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব,—বিবেকানন্দ ইহা তাঁহার জীবনে প্রমাণ করিয়াছেন। যে সময় পরমহংসদেব অন্তর্দ্ধান হন, শিষ্যমণ্ডলী ব্যাকুল, তখন বিবেকানন্দ তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করেন, বলেন,—"ভাই, ভয় কি? শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের হৃদয়ে রহিয়াছেন, তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমরা জনে

জনে সেইরূপ হইব।” রামকৃষ্ণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের সহকারী হইয়াছিলেন। যিনি বিবেকানন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন, তিনি বিবেকানন্দের সহকারী নিশ্চয় হইবেন; বিবেকানন্দ সেই মহাপুরুষের উপরেই সমস্ত কার্য্যভার অর্পণ করিয়া অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন।

বিবেকানন্দের কথা আলোচনা করিতে করিতে, আমার প্রতি তাঁহার ভালবাসা মনে পড়িতেছে, সে ভালবাসার প্রতিদান হয় না, কিন্তু স্মৃতি-পথ হইতে তাহা বিলুপ্ত হইবার নহে। তাঁহার মধুর আলাপ, যত্ন, মধুর বাগ্‌যুদ্ধ দ্বারা উপদেশ প্রদান, আমার ন্যায় অমানীকে মান দান,—সে সমস্ত উল্লেখ করা যায় না। একটি দৃষ্টান্ত দিই,—তিনি বিদেশ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, শ্রীমান পশুপতিনাথ বসুর বাটীতে আহূত হইয়া আসেন। তিনি বাটীতে প্রবেশমাত্র অনেকেই তাঁহার চরণ স্পর্শ করিল,—আমিও চরণ স্পর্শ করিতে সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। আমি অবনত হইতেছি, অমনি তিনি আমার বাহুদ্বয় ধারণ করিয়া বলিলেন,—“কি করো, ঘোষজা, আমার যে অকল্যাণ হবে!” এরূপ অমানীকে মান দান ও নিরভিমানীর দৃষ্টান্ত যদি কেহ দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি বিবেকানন্দকে দেখিয়াছেন। এরূপ নিরভিমান ও লোকাতীত কার্য্য বিবেকানন্দতেই সম্ভব।

পরিশেষে আমার বিবেকানন্দের ভক্তমণ্ডলীর নিকট সবিনয় নিবেদন যে, এই প্রবন্ধে আমার যাহা ত্রুটি হইল, তাহা তাঁহারা মার্জ্জনা করুন। আমার বিবেকানন্দকে ভয় নাই,—অসীম ভ্রাতৃপ্রেমে তিনি বার বার আমার ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়াছেন, এখনও করিবেন। ভয়—তাঁহার ভক্তমণ্ডলীকে,—তাঁহারা আমার ত্রুটি গ্রহণ না করেন—এই আমার প্রার্থনা।

[২৩শে মাঘ, ১৩১১ সাল, রবিবার, বেলুড়মঠে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব-উপলক্ষ্যে পঠিত; এবং “তত্ত্বমঞ্জরী” মাসিক পত্রিকায় (৮ম বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩১১ সাল) প্রথম প্রকাশিত।

বিবেকানন্দের সাধন-ফল

যদি কোন সংসারী ব্যক্তি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে জানাইতেন যে, পুত্র-কলত্র লইয়া সংসারে বিজড়িত হইয়াছি, আমাদের উপায় কি? শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন যে, যে পুত্রের মমতায় ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছ না, সেই পুত্রকে রাম জ্ঞান করিয়া লালন-পালন করিও, তোমার ঈশ্বরলাভ হইবে। আপত্তি উঠিত যে, রাম-জ্ঞানে সেবা করিলে পুত্র অবাধ্য হইবে, স্বেচ্ছাচার হইয়া যাহা ইচ্ছা করিবে, অশিক্ষিত থাকিবে, অতএব যে পুত্রের মমতায় তিনি সংসারে আবদ্ধ হইয়াছেন, পুত্রের ভাবী মঙ্গলকামনায় সেই মমতাই তাঁহাকে রামজ্ঞানে পূজা করিতে বিরত রাখিবে।

তাহার উত্তর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্বোধনে "শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা প্রসঙ্গে" বর্ণিত আছে যে, কোন এক সন্ন্যাসীর নিকট হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ রামলালা ঠাকুর পান। রামলালা অর্থে বালক রাম। সেই বালক রাম যেন তাঁহার পুত্র হইল, তাঁহাকে লালন পালন করেন, সঙ্গে লইয়া ফেরেন, বেয়াদব হইলে ধমক দেন, এমন কি, তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি যে, "একদিন কথা না শুনিয়া রামলালা জলে সাঁতার দিতেছিল, আমি তাহাকে শাসিত করিবার জন্য জলে চুবাইয়া ধরিয়াছিলাম।" বলিতে বলিতে সহস্র ধারায় শ্রীরামকৃষ্ণের বুক ভাসিয়া গেল। অবশ্য সন্ন্যাসী-প্রদত্ত রামলালা একটি ক্ষুদ্র বিগ্রহ, যেটি অদ্যাবধি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীকালীর মন্দিরে আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের 'রামলালা' ভাবের রামলালা, ভাবে তাহাকে প্রতিপালন করিতেন এবং ভাবে শাসিত করিতেন। যিনি এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া স্বীয় পুত্রকে রামলালার ন্যায় প্রতিপালন করিবেন, পুত্রকে রামজ্ঞানে প্রতিপালন করিলে পুত্র অবাধ্য হইয়া পরিণামে মন্দ হইয়া পড়িবে, এরূপ আশঙ্কা করিতে পারেন না। কেননা, অপার প্রেমে পুত্রকে যশোদার ন্যায় শাসন-মানসে বন্ধনও করিতে পারেন এবং যশোদাও যেরূপ একমাত্র গোপালকে প্রতিপালন করিয়া পরমজ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, যে সংসারী রামজ্ঞানে পুত্রকে প্রতিপালন করিবেন, তিনিও সেইরূপ পরমজ্ঞানের অধিকারী হইবেন। পুত্রকে রামজ্ঞানে প্রতিপালন করিলেই বুঝিবেন, রাম ক্ষুদ্র নয়; পুত্র রামে তাঁহার ধ্যানজ্ঞান হইলে দেখিতে পাইবেন যে, রাম অতি বৃহৎ; দেখিবেন—সর্ব্বভূতে রাম, বিশ্বব্যাপী রাম জানিয়া রামে লয় হইবেন। সংসারীকে শ্রীরামকৃষ্ণ এইরূপ প্রকৃতি অনুসারে ঈশ্বরলাভের পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন।

আবার যে ব্যক্তি তীব্র বৈরাগ্যে ঈশ্বরলাভ আশায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন, তাঁহাকে তাঁহার প্রকৃতি অনুসারে নির্জ্জনে ধ্যানারূঢ় হইতে উপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁহারও প্রথমে ইষ্টধ্যান একটি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি, সেই মূর্ত্তি বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া বিশ্বব্যাপী ভাবে সাধককে বিশ্বের সহিত মিলাইয়া লইত। এরূপ সাধনার বিরুদ্ধে কেহ কেহ আপত্তি তুলিয়া বলেন যে, জড়বৎ সংসারে কোনও কার্য্য না লইয়া থাকা কখনই ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়। সংসারে আসিয়া যদি সংসারের কার্য্য না করিলাম, সে তো একপ্রকার অকর্ম্মণ্য জীবনভার বহনমাত্র। এ আপত্তিরও প্রতিবাদ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন। দ্বাদশ বৎসর ধ্যানারূঢ় থাকিয়া সেই বিশ্বপ্রেমিকের কার্য্য রামকৃষ্ণমিশনরূপ ধারণ করিয়া সুদূর আমেরিকা পর্য্যন্ত বিকাশ পাইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "পদ্ম প্রস্ফুটিত হইলে ভ্রমর আপনিই আসে।" শ্রীরামকৃষ্ণ-নাম-প্রফুল্লসরোজে মধু-লোভে দলে দলে সাধকরূপ ভ্রমর আসিতেছে।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ব্বোক্ত সাধনের দুইটি পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং প্রকৃতি অনুসারে তাঁহার শিষ্যেরা নিজ নিজ পন্থায় সিদ্ধিলাভ করিতেছেন। শ্রীশ্রীবিবেকানন্দ এই উভয় সাধনেই সিদ্ধ ছিলেন। ঈশ্বরলুব্ধচিত্ত বালক নরেন্দ্রনাথ ঈশ্বরলাভের উপায় জানিবার জন্য কলিকাতাস্থ সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ে উপস্থিত হইয়া উপদেশ যাচ্ঞা করিয়াছিলেন—

কিরূপে ঈশ্বরলাভ হইতে পারে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই সাম্প্রদায়িক মত তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, কিন্তু কোন সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি তাঁহার একটি উদার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন নাই। প্রশ্ন—"ঈশ্বর দেখিয়াছেন কি?" এ প্রশ্নের উত্তরে কেহই 'হ্যাঁ' বলিতে সক্ষম হন নাই। এ প্রশ্নের উত্তর নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে পান।

ভক্তচূড়ামণি ৺রামচন্দ্র দত্ত নরেন্দ্রনাথের সুবাদে দাদা ছিলেন। তাঁহারই সহিত তিনি দক্ষিণেশ্বরে যান। যেরূপ অন্যান্যস্থলে জিজ্ঞাসা করিতেন, শ্রীরামকৃষ্ণকেও সেইরূপ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন?" শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তর করিলেন, —"হ্যাঁ, যেরূপ তুমি আমার সম্মুখে বসিয়া আছ, ঈশ্বর ইহা হইতেও অধিক প্রত্যক্ষের বস্তু। আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি, ইচ্ছা কর, তুমিও প্রত্যক্ষ করিতে পারো।" ঈশ্বর-লুব্ধচিত্ত একেবারে আকুল হইয়া পড়িল। কিরূপে ঈশ্বরলাভ করিবেন, এ নিমিত্ত তাঁহার যেরূপ ব্যাকুলতা, তাঁহার গুরুও সেইরূপ শিক্ষা প্রদান। গুরুর উপদেশে বুঝিয়াছিলেন, নির্ব্বিকল্প-সমাধিলাভ অতি উচ্চ অবস্থা। তাঁহার মনে বাসনা জন্মে যে, যতদিন দেহ থাকে, তিনি সেই নির্ব্বিকল্প অবস্থায় থাকিবেন এবং মধ্যে মধ্যে সমাধিভঙ্গ হইলে দেহ-রক্ষার্থে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া আবার সমাধিস্থ হইবেন। এই অবস্থা তিনি গুরুর নিকট প্রার্থনা করেন। তাহাতে তাঁহার গুরু বলেন,—"এরূপ স্বার্থপর হইও না, তুমি নির্ব্বিকল্প-সমাধিলাভ করিবে, কিন্তু পরহিতসাধন তোমার জীবনের কার্য্য হোক। তোমায় ঈশ্বর বৃহৎ বটবৃক্ষের ন্যায় সৃজন করিয়াছেন, যাহার স্নিগ্ধ-ছায়ায় বহুপ্রাণী শীতল হইবে।" এই উপদেশ হৃদয়ে অটল ধারণা রাখিয়া নরেন্দ্রনাথ 'বিবেকানন্দ' হইয়াছিলেন। যে বিবেকানন্দ জগৎ-প্রেমে জগৎকে জ্ঞান দানের নিমিত্ত কৌপিনধারী হইয়া দেশদেশান্তরে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই বিবেকানন্দ-সৃষ্টির ভিত্তি—উপরোক্ত আদেশ।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংসারী ও ত্যাগীকে দুই ভাবে উপদেশ দিতেন, দুই ভাবের সাধনেই ঈশ্বরলাভ হয়। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যেরাও সেই দুইভাবে উপদেশ পাইয়াছেন। স্বামীজীর উপদেশে কেহ বা সকল মূর্ত্তি নারায়ণের মূর্ত্তি-জ্ঞানে নারায়ণ-সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া সেবাশ্রমে সাধন করিতেছেন, আবার কেহ বা ধ্যানে জগৎব্যাপী শ্রীবিশ্বনাথের দর্শন-আশায় অদ্বৈতাশ্রমে অদ্বৈত-জ্ঞান লাভে প্রবৃত্ত। প্রবৃত্তি অনুসারে অদ্বৈত ও সেবাশ্রম চলিতেছে। দুই আশ্রমের উপদেষ্টা স্বামী বিবেকানন্দ। দুই আশ্রমই তাঁহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সাধন-পথে অগ্রসর। কারণ, পূর্ব্বে বলিয়াছি, দুই সাধনেই তিনি সিদ্ধ ছিলেন।

কথা আছে, চন্দন ও বিষ্ঠায় সমজ্ঞান হইলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু সে অবস্থা যে কি, তাহা অনুভব করা অতি কঠিন। কিন্তু রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে সেবক স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যগণের নিকট সে অবস্থা উপলব্ধি করা কঠিন নয়। যে সকল উৎকট রোগাক্রান্ত ব্যক্তির নিকটে সাধারণে ঘৃণায় যাইতে পারে না, স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যেরা অনায়াসে নারায়ণ-জ্ঞানে তাহাদের মলমূত্র পরিষ্কার করিতেছেন,—পুত্রকে মাতা যেরূপ পরিষ্কার করেন—সেইরূপে। কারণ, তাঁহাদের শিক্ষাদাতা স্বামী

বিবেকানন্দ—নিজ জীবনে অনুষ্ঠান করিয়া উহা শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। একদা বিবেকানন্দ তাঁহার গুরুভ্রাতা ৺নিরঞ্জনানন্দের সহিত ৺পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে অতিথি হন। একদিন ভ্রমণ করিতে গিয়া দেখেন, এক ব্যক্তি রক্তামাশয় পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পথে পড়িয়া আছে, দারুণ শীত, অঙ্গে সামান্ত বস্ত্র মাত্র, মলদ্বার বহিয়া মল নিঃসৃত হইতেছে,—যন্ত্রণায় অধীর,—আর্ত্তনাদ করিতেছে। মুমূর্ষু ব্যক্তিকে কিরূপে আশ্রয় দিবেন, বিবেকানন্দের চিন্তা উপস্থিত হইল। পরের বাটীতে অতিথি হইয়াছেন, আমাশয় দুরন্ত রোগ, যে গৃহে সে রোগী থাকে, সে গৃহ বিষ্ঠাময় হইয়া যায়। রোগী লইয়া গেলে যদি পূর্ণবাবু বিরক্ত হন! যাহা হউক, দুই ভ্রাতায় পরামর্শ করিয়া রোগীকে তুলিলেন, উভয়ে মিলিয়া ধীরে ধীরে পূর্ণবাবুর বাসায় লইয়া আসিলেন, রোগীকে পরিষ্কার করিয়া দিয়া অগ্নিদ্বারা সেক দিতে লাগিলেন। উভয়ে যেরূপ সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন, এরূপ সেবা যদি কেহ পিতার করেন, তাহাও প্রসংশনীয়। উচ্চ কার্য্যের এমনি আশ্চর্য মহিমা, যে পূর্ণবাবু বিরক্ত হইবেন বলিয়া তাঁহারা আশঙ্কা করিয়াছিলেন, সেই পূর্ণবাবুই তখন সন্ন্যাসীদ্বয়ের কার্য্য দর্শনে মুগ্ধ। পূর্ণবাবু ভাবিলেন —কি আশ্চর্য্য সন্ন্যাসীদ্বয়! সন্ন্যাসীরা স্বতন্ত্র থাকে, অন্তের স্পর্শ অপবিত্র জ্ঞান করে— একি অপূর্ব্ব সন্ন্যাস-বৃত্তি—এরূপ রোগীসেবা যাহার অন্তর্গত! তদবধি পূর্ণবাবু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসীগণকে অন্য প্রকার দৃষ্টিতে দেখিতেন। আমাদের কেহ যেরূপ সমালোচনা করেন যে, সংসার পরিত্যাগ করিয়া গেরুয়া ধারণ করাটা অলস ব্যক্তির কার্য্য, যাহারা পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ, তাহারাই ঐরূপে গেরুয়াধারী হয়, পূর্ণবাবুরও কতকটা সেরূপ সংস্কার ছিল, সে ধারণা তদবধি তাঁহার সমূলে উৎপাটিত হইল।

সর্ব্বভূতে নারায়ণ-দৃষ্টি সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে আর এক দৃষ্টান্ত বলিব —ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন তাঁহার তাম্রকূট সেবনে ইচ্ছা হয়, দেখিলেন, এক বৃক্ষতলে কয়েকজন ব্যক্তি বসিয়া ধূমপান করিতেছে, তিনি তাহাদের নিকট কলিকা প্রার্থী হইলেন। সন্ন্যাসীর বেশ দেখিয়া তাহাদের মধ্যে একজন উত্তর করিল,— "মহারাজ, হাম লোক ভঙ্গী হ্যায়।" ভঙ্গী অর্থে মেথর। বিবেকানন্দের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, ইহা শুনিয়া তাঁহার মন একবার পশ্চাদগামী হইল, কিন্তু পরক্ষণেই তিনি আত্ম-তিরস্কার করিয়া ভাবিলেন যে, আমি কি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যের উপযুক্ত নই যে, 'ভঙ্গী' নাম শুনিয়া আত্মাভিমানে পশ্চাৎপদ হইতেছি? যে শ্রীরামকৃষ্ণ অভিমান দূরকরণার্থ স্বহস্তে আবর্জ্জনা-স্থান ধৌত করিয়া আপন লম্বিত কেশ দ্বারা উহা মুছিয়া দিতেন, সেই রামকৃষ্ণের পদাশ্রিত হইয়া আমার এতদূর অভিমান! বিদ্যুদ্বেগে এই সকল চিন্তা তাঁহার হৃদয়ের ভিতর দিয়া চলিয়া গেল এবং তিনি ছিলিম লইয়া ধূমপান করিলেন। আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদস্পর্শ করায় স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের সহিত সমভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন; আমি তাঁহার নিকট হইতে পূর্ব্বোক্ত কথা শুনিয়া পরিহাস করিয়া বলিলাম,—"তুই গাঁজাখোর, তামাক খাবার ঝোঁকে মেথরের কল্‌কে টেনেছিলি।" বিবেকানন্দ উত্তর করিলেন, "না হে, ইহাতে গুরুদেব আমাকে জীবন-রক্ষাপ্রদ শিক্ষা দিয়াছিলেন, আমি আর কাহাকেও ঘৃণা করিতাম না।" দৃষ্টান্তস্বরূপ

বলিলেন—'আমি একস্থানে আছি, তথায় আমার নিকট উপদেশ লইবার জন্ম দলে দলে লোক আসিতে লাগিল। তিন দিন অনবরত লোকসমাগম, আলাপ করিয়া সকলে উঠিয়া যায়, কিন্তু আমার আহার হইয়াছে কি না, তাহা কেহ একবার জিজ্ঞাসাও করে না। তৃতীয় রাত্রে যখন সকলে চলিয়া গিয়াছে. এক দীন ব্যক্তি আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, 'মহারাজ, আপনি তিন দিন তো অনবরত কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, কিন্তু জলপান পর্য্যন্ত করেন নাই, ইহাতে আমায় ব্যথা লাগিয়াছে।' আমি ভাবিলাম, নারায়ণ স্বয়ং দীনবেশে আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কিছু আমাকে আহার করিতে দিবে?' সে ব্যক্তি অতি কাতরভাবে বলিল, 'আমার প্রাণ চাহিতেছে, কিন্তু কিরূপে আমার প্রস্তুত করা রুটি দিব? যদি বলেন, আমি আটা, ডাল, আনি, রুটি ডাল প্রস্তুত করিয়া লউন।' সে সময় আমি সন্ন্যাসীর নিয়মানুসারে অগ্নিস্পর্শ করি না। তাহাকে বলিলাম, 'তোমার প্রস্তুত করা রুটি আমাকে দাও, আমি তাহাই আহার করিব।' শুনিয়া সে ব্যক্তি ভয়ে অভিভূত! সে খেতড়ীর রাজার প্রজা, রাজা যদি শোনেন যে চামার হইয়া সন্ন্যাসীকে তাহার প্রস্তুত করা রুটি দিয়াছে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে গুরুতর শাস্তি প্রদান করিবেন এবং তাহাকে স্বদেশ হইতে দূর করিয়া দিবেন। আমি তাহাকে বলিলাম, 'তোমার ভয় নাই, রাজা তোমাকে শাস্তি দিবেন না।' এ কথায় তাহার সম্পূর্ণ প্রত্যয় জন্মিল না। কিন্তু বলবান্ দয়াপ্রভাবে ভাবী অনিষ্ট উপেক্ষা করিয়া ভোজ্য বস্তু আনিয়া দিল। বিবেকানন্দ বলেন—"সে সময় দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্ণ-পাত্রে সুধা আনিয়া দিলে সেরূপ তৃপ্তিকর হইত কি না সন্দেহ।" বিবেকানন্দের নয়ন-ধারা নির্গত হইতে লাগিল। ঐ ব্যক্তির দয়া দেখিয়া স্বামীজি সেদিন মনে মনে ভাবিয়াছিলেন,—এরূপ শত সহস্র উচ্চচেতা ব্যক্তি কুটীরে অবস্থান করে, আমরা তাহাদিগকে হীন বলিয়া ঘৃণা করি। স্বামী বিবেকানন্দের নীচজাতির প্রতি অসীম সহানুভূতি উদ্দীপিত করিবার ঐ ঘটনা একটি বিশেষ কারণ। তিনি বলিতেন, তাঁহাকে নিরভিমান করিবার জন্ম ঐ শিক্ষা উপস্থিত হইয়াছিল।

অভিমান যে কিরূপ দৃঢ়মূল, তাহা বুঝাইয়া দিবার জন্ম দৃষ্টান্তস্থলে তিনি আমাদের নিকট আর একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। যখন তিনি খেতড়ীর রাজার অতিথি, তখন খেতড়ীর রাজা একদিন জনৈক প্রৌঢ়া স্ত্রীলোককে গান গাহিতে আনিলেন। বিবেকানন্দ ভাবিলেন, সঙ্গীত ব্যবসায়ী স্ত্রীলোক কখনও সুচরিত্রা হইতে পারে না, বিশেষতঃ তিনি স্ত্রীলোকের গান শোনেন না। সে স্থান হইতে চলিয়া যাইবেন ভাবিয়া উঠিলেন—খেতরীর রাজা তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া গান শুনিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করিলেন। বিবেকানন্দ ভাবিলেন—অনুরোধ করিতেছেন, একটা গান শুনিয়াই উঠিব। গায়িকা গান ধরিল;—আমাদের সে গানের এক ছত্র মাত্র মনে আছে,—"প্রভু, মেরা অওগুণ চিত না ধরো. সমদরশী হ্যায় নাম তুম্হারো।" গানের ভাব এই যে, "প্রভু, তুমি তো দোষ গুণ বিচার করো না, গঙ্গায় অপবিত্র জল আসিলে সেও গঙ্গাজল হইয়া যায়।" বিবেকানন্দ বলেন, "আমি

গান শুনিয়া ভাবিলাম যে, এই আমার সন্ন্যাস! আমি সন্ন্যাসী—এ সামান্যা বনিতা—এ জ্ঞান আজও আমার রহিয়াছে! বিশ্বব্যাপিনী জগদম্বার দর্শন আজও আমি পাইলাম না!" তদবধি সেই গায়িকাকে মাতৃ-সম্বোধন করিতেন এবং যখন খেতড়ীর রাজবাটীতে যাইতেন, তখনই তাহাকে ডাকাইয়া গান শুনিতেন এবং সেই গায়িকা বিবেকানন্দের মাতৃসম্বোধনে মাতৃভাবাপন্না হইয়া মাতৃচক্ষে বিবেকানন্দকে দেখিতেন। এই ঘটনা সাধন-অভিমানীর একটি অঙ্কুশস্বরূপ। ঈশ্বর কোন্ পথে কাহাকে লইয়া যান, তাহা মানব-বুদ্ধির অতীত। যদি কোন সাধনাভিমানী এই গায়িকাকে যৌবনাবস্থায় দেখিয়া নারকী বলিয়া ঘৃণা করিতেন, এই ঘটনা দেখিলে নিশ্চয় বুঝিতেন যে, তাঁহার ধারণা ভ্রান্তিমূলক ছিল। ঈশ্বরকৃপাই মূল, সামান্য গায়িকা অনায়াসে বাৎসল্য-প্রেমের অধিকারিণী হইয়াছিল।

এস্থলে ধুনী কামারণী—যাঁহাকে আমরা দেবী-জ্ঞানে প্রণাম করি, তাঁহার শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত সম্বন্ধ মনে পড়িতেছে. রামকৃষ্ণদেব যখন যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন, তখন তিনি একেবারে ধরিয়া বসিলেন যে, তিনি ভিক্ষা অপর কাহারও কাছে লইবেন না, ঐ ধুনী কামারণীর নিকট গ্রহণ করিবেন। তাঁহার মহাজ্ঞানী পিতা অদ্ভুত পুত্রের ইচ্ছায় বাধা প্রদান করিলেন না। কারণ, সকলেই অবগত আছেন যে, যে সময় শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম গয়াধামে গমন করেন. তিনি স্বপ্নে দেখিয়াছিলেন যে. গদাধর তাঁহার পুত্র হইবেন—বলিতেছেন। ইহার বিস্তৃত বর্ণনা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন-চরিতে আছে। সেই জন্যই তিনি তাঁহার পুত্রের নাম গদাধর রাখিয়াছিলেন। গদাধর ধুনীর নিকট ভিক্ষা লইলেন ও ধুনীর 'গদাই' হইলেন। এস্থলে মাতাপুত্রের একটি আশ্চর্য্য প্রেমের ঘটনা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কামারপুকুর অঞ্চলে অর্থাৎ পরমহংসদেবের জন্মস্থানে চিংড়ি মাছ প্রায় পাওয়া যায় না। একদিন কামারণী চিংড়িমাছ পাইয়াছিলেন, যদিও কামারণী তাঁহার গদাইকে যেখানে যা উত্তম সামগ্রী পাইতেন, খাওয়াইতেন, কিন্তু তাঁহার বড়ই ক্ষোভ ছিল, ব্রাহ্মণের পুত্রকে রন্ধন করা দ্রব্য দিতে পারিতেন না। চিংড়িমাছ পাইয়াছেন, কিন্তু ক্ষুদিরাম প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ ন'ন, ব্রাহ্মণেরও দান গ্রহণ করিতেন না। কামারণী চিংড়িমাছ দিলে ত গ্রহণ করিবেন না! চিংড়িমাছ রন্ধন করিয়া কলসীকক্ষে বারি আনিবার নিমিত্ত দোরে শিকল দিয়া যাইতেন, হঠাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখেন, গদাই শিকল খুলিয়া চিংড়িমাছ নিয়া পালাইতেছে। দেখিবামাত্র ধুনী চীৎকার করিতে লাগিলেন, "ও গদাই, খাস্ নে—খাস্ নে!" গদাই তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া খাইতে খাইতে চলিল। ধুনী ভয়ে অভিভূত,—ক্ষুদিরাম ব্রাহ্মণ, এ কথা শুনিলে আর গদাইকে তাহার নিকট আসিতে দিবে না। কিন্তু এ মাতাপুত্রের বিচ্ছেদ কে করিবে! ধুনী পুত্রের সেবা করিয়া অন্তকালে পুত্রের সম্মুখে "হরি" বলিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-মাতা ধুনীর চরণে শত সহস্র প্রণাম!

আমরা উপরোক্ত খেতড়ী'র চামারের কথাটির শেষকথা এখনও বলি নাই। চামার ভয় করিয়াছিল, বিবেকানন্দ স্বামীকে আহার প্রদান খেতড়ীর রাজা শুনিলে

তাহার সর্ব্বনাশ হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ চামারের সে ভয়ের কথা জানিয়াও খেতড়ীর রাজার নিকট ঐ চামারের চরিত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিলেন। কাজেই কয়েকদিন পরেই খেতরীর রাজার নিকট চামারের ডাক পড়িল। চামার কাঁপিতে কাঁপিতে উপস্থিত। কিন্তু রাজপ্রসাদলাভে চামারকে আর চামারের বৃত্তি করিতে হইল না। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, দান বিফল হয় না। চামার নিষ্কাম ছিল, কিন্তু কামনা করিয়া ঈশ্বরোদ্দেশে দানে একগুণে শতগুণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—এই চামার-বিবেকানন্দ-সংবাদ।

আমরা নারায়ণ-জ্ঞানে নর-সেবার উল্লেখ করিতেছিলাম—যে সেবার আদর্শ স্বামী বিবেকান্দের নিকট গ্রহণ করিয়া আশ্রমের যুবকবৃন্দ সেবাকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। আমরা অত্যাশ্চর্য্য সেবা দেখিয়া যতই প্রশংসা করি, কিন্তু তাঁহারা যে দ্রুতপদে মুক্তির নিকট অগ্রসর হইতেছেন, এ কথা উপলব্ধি করা আমাদের কঠিন হয়। প্রশংসার সঙ্গে সঙ্গেই বলি, "হ্যাঁ, খুব উচ্চ কার্য্য করিতেছে বটে, কিন্তু যুবাবয়সে ঐরূপ একটা ঝোঁকে কার্য্য করিতেছে আর কি। পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া, বাপ-মাকে ত্যাগ করিয়া যে অধঃপাতে যায় নাই, ইহাই প্রশংসার বিষয়।" ঐরূপে যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছে, তাহা যে তাহারা অতি যত্ন সহকারে সমাধা করে এ কথা শত্রুর মুখেও নিঃসৃত হয়। কিন্তু ভ্রমবশতঃ বুঝিতে বিলম্ব হয় যে, যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজের নেতাস্বরূপ হইয়া ভারতবর্ষে ভ্রাতৃভাব সংস্থাপনার্থ নানা প্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন, সেই মহৎকার্য এই সকল বালকেই দ্বারাই সুসম্পন্ন হওয়া একমাত্র সম্ভব। মুসলমান, ক্রিশ্চিয়ান, পার্শি, বৌদ্ধ প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্ন জাতি ইহাদের অদ্ভুত সেবা-দৃষ্টে পরস্পর জাতীয় বিদ্বেষ ত্যাগ করিতে নিশ্চয় বাধ্য হইবে। সেবাশ্রমভুক্ত সেবাগ্রাহিগণ যে জাতিই হোক, সেবাশ্রমে আসিয়া বুঝিবেন যে, এই সকল বালকদের তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষভাব নাই। কারণ, সেব্য ও সেবকদিগের ভিতর বর্ণগত, জাতিগত এবং ধর্ম্মগত প্রভেদ থাকিলেও ইহারা তাঁহাদিগকে সমভাবে সেবা করে। তাঁহারা নিশ্চয় অবাক্ হইয়া ভাবিবেন, ইহারা কারা? ইহারা কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী?—যে ধর্ম্মাবলম্বীই হোক, আর যাহারা সেবা গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহাদের মতে ইহাদের ধর্ম্ম ভ্রান্ত ধর্ম্মই হৌক, কিন্তু এ বালকেরা যে তাঁহাদের ধর্ম্মের সারমর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে—এ কথা তাঁহাদের বুঝিতে হইবে নিশ্চয়। কেন না, তাঁহাদের মতেও তো নর-সেবা প্রধান ধর্ম্ম। প্রেমের অদ্ভুত প্রভাবে প্রেম দৃষ্টে প্রেম লাভ হয়, এই অদ্ভুত সেবার সেবকের প্রেম দৃষ্টে যিনি সেবা পাইতেছেন, তাঁহারও হৃদয়ে ঐরূপে প্রেমের উদ্দীপনা হইবে নিশ্চয়। তাঁহার জাতিগত ধর্ম্মগত বিদ্বেষ—উচ্চ দৃষ্টান্তে মলিন হইবে। সেবাগ্রহীতা সুস্থশরীরে সেবাশ্রম হইতে ফিরিয়া এই উচ্চাশয় যুবকবৃন্দের পরিচয় নিজ সমাজমধ্যে প্রচার করিবেন এবং তাহা সেই সমাজে যিনি যিনি শুনিবেন, তাঁহাদেরও বিদ্বেষভাবে আঘাত লাগিবে। বিদ্বেষশূন্যতাই একতার মূল। এই সকল যুবক যদিচ বিদ্যালয়ের শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তথাচ বিদ্যালয়ে উচ্চ-শিক্ষার ফলে যে কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া উচ্চচেতা ব্যক্তিগণ প্রাণপণ করিতেছেন, বক্তৃতা,

সভা, প্রবন্ধ প্রভৃতিতে যাহা না হয়, যুবাগণের সেবায় তাহা হইতেছে। একতা স্থাপনের বিঘ্নবাধা সমূলে উচ্ছেদপ্রাপ্ত হইতেছে। বিদ্যালাভের ফল বিদ্যালাভের কার্য্য—এই সেবাকার্য্যে যে দেদীপ্যমান—ইহা স্থূলদৃষ্টিতে লক্ষ্য হয়। যাঁহারা সূক্ষ্ম-দৃষ্টিসম্পন্ন, তাঁহারা আবার দেখিতে পাইবেন যে, এই যুবকেরা সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান লাভ করিতেছেন, যে জ্ঞানলাভে আর ঈশ্বরলাভে প্রভেদ নাই। এই বিশ্বপ্রেম-লাভে সক্ষম হইলে পর প্রতি ব্যক্তি তাহার দৃষ্টান্তে শত শত ব্যক্তিকে প্রেমিক করিবে। প্রেমজননী ভারতে প্রেমের বিকাশ হইবে এবং সেই প্রেমে জগৎ মুগ্ধ হইয়া ভারতবর্ষকে তীর্থজ্ঞানে ভারতের ধূলি মস্তকে ধারণ করিবে। দূরে আমেরিকায় সেই তীর্থজ্ঞান অঙ্কুরিত হইয়াছে! ইংলণ্ডেও সেই তীর্থজ্ঞান উপ্ত, ভারতের সকল স্থানেই রামকৃষ্ণ-মিশন সেই তীর্থজ্ঞান বপন করিবার জন্য নিযুক্ত আছে। যথায় যথায় রামকৃষ্ণ-মিশন, সেইখানেই প্রকাশ যে, ভারত পুণ্যভূমি। পুণ্যভূমি কাশীধামের সেবা-শ্রমের যুবকেরা ধীরে ধীরে শিক্ষাদান করিতেছে,—'দেখিয়া যাও—ভারত পুণ্যভূমি!'

উল্লেখ করিয়াছি, স্বামী বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-নির্ণীত দুই পন্থারই চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার সেবাপন্থায় সিদ্ধিলাভের ফলস্বরূপ এই যুবকবৃন্দকে দেখাইবার চেষ্টা পাইলাম। আবার অপর দিকে অদ্বৈতাশ্রম দেখুন:—স্বামীজি শ্রীগুরুর নিকট নির্ব্বিকল্পসমাধি লাভ করিয়া কিরূপ ধ্যান-পন্থার পথিক সকল সৃজন করিয়াছেন, তাহা অদ্বৈতাশ্রমে লক্ষ্য হইবে। ঐ যে অদ্বৈতাশ্রমে বালক সন্ন্যাসীগণ দেখেন, উঁহাদের ক্রিয়াকলাপ—আত্মত্যাগ, সেবাশ্রমের বিবেকানন্দের শিষ্যগণ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নয়। বিষয়-মমতা-বর্জ্জিত হইয়া প্রশংসা ও প্রতিষ্ঠার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কঠোর তিতিক্ষায় আত্মোন্নতি সাধনে নিযুক্ত। সন্ন্যাস-অভিমান নাই; পবিত্র বস্ত্র দেবসেবার উপযোগী—এই নিমিত্ত গৈরিকবস্ত্র ধারণ; সন্ন্যাসীর বেশে নীচ-চিন্তা দমন হয় এবং নীচ-চিন্তায় আত্মগ্লানি জন্মে, এইজন্য মস্তক মুণ্ডন করিয়া কমণ্ডলু ধারণ। পরীক্ষা ব্যতীত রত্ন চেনা কঠিন, পরীক্ষা করিলে অদ্বৈতাশ্রমের বালকবৃন্দকে কতক চেনা যায়। এ বালকগণ সংসারত্যাগী, কিন্তু সংসার-কর্ত্তব্যত্যাগী নহে। অদ্বৈতাশ্রমে উপস্থিত হইলে তাঁহারা কিরূপ অতিথিসৎকার করেন, বুঝিতে পারা যায়। গৃহীর যেরূপ অতিথির প্রতি কর্ত্তব্য, এই বালকেরাও সেরূপ কর্ত্তব্যকার্য্য প্রদর্শন করেন। অতিথিকে স্থানদান, পরিচর্য্যা, আত্মবঞ্চনা করিয়া ভিখারীদিগের যতদূর সাধ্য, অতিথির তৃপ্তির জন্য সমস্ত কার্য্যই করিয়া থাকেন। সংসারে যেরূপ বয়োজ্যেষ্ঠের সম্মান, ইঁহারাও এখানে তাঁহাদিগকে আনত মস্তকে সেই সম্মান প্রদর্শন করেন। এদিকে কঠোর তপস্বী,—বিরামহীন তপস্যা, দেবসেবা একমাত্র কার্য্য! ধ্যান জ্ঞান সমস্তই দেবতায় অর্পিত; দৈহিক ক্লেশ, রোগ-তাড়না, এমন কি নিজ নিজ দেহে পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ উপেক্ষা, এবং অটল অচল থাকিয়া কোন অবস্থাতেই ইঁহারা কাতর নহেন।—ইঁহাদের উপাসনা, উপাসনার নিমিত্ত—কোনও আর্থিক অবস্থার নিমিত্ত নয়। প্রতিষ্ঠালাভে ইঁহাদের তীব্র ঘৃণা।—পরমলাভ ঈশ্বরলাভই লক্ষ্য এবং সকল কার্য্যই সেই লক্ষ্যের অন্তর্গত।

অনেকেই তাঁহাদের প্রতি উপহাস-দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। অনেকেই বলেন—ইদানীং সন্ন্যাসী হওয়া একটা ঢং! দূর হইতে বলিতে পারেন, কিন্তু অদ্বৈতাশ্রমে আসিয়া সমস্ত পরিদর্শন করিয়া, একথা মুখে আনিতে তাঁহাদের জিহ্বা জড়িত হইবে। দেবকার্য্যে অষ্টপ্রহর নিযুক্ত থাকা যাইতে পারে, এ কথা আমাদের অনেকেই সম্ভবপর বিবেচনা করেন না এবং কঠোর তপস্যার কথা শাস্ত্রেই পড়িয়াছেন, অদ্বৈতাশ্রমে আসিয়া তাহা প্রত্যক্ষ করিতে পারিবেন। অদ্বৈতাশ্রমের বালকেরা কঠোর তপস্বী। যে কঠোর তপস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ অদ্বৈতজ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, সেই কঠোর তপস্যায় এই বালকবৃন্দ নিযুক্ত। শরীর, মন, প্রাণ সমস্ত ঈশ্বরে অর্পিত। ইহাদিগের কার্য্য—সমালোচকের দৃষ্টির বহির্ভূত। সেবাশ্রমের যুবাগণ প্রশংসাপ্রার্থী না হইয়াও প্রশংসা পান, কিন্তু এ বালকগণ কেবল উপহাসভাজন। তাহারা কাপড় পরে—তাহাতেও উপহাস; তাহারা শীতবস্ত্র গায়ে দেয়—তাহাতেও উপহাস; তাহারা শিক্ষা ত্যাগ করিয়াছে—এইজন্য নিন্দা; গৃহ ত্যাগ করিয়াছে—এইজন্য নিন্দা; পিতামাতা ত্যাগ করিয়াছে—এইজন্য ক্রোধ! তাহাদের আদর্শে অন্যান্য বালকগণ খারাপ হইবে—এইজন্য ক্রোধ! এ সমস্তই তাহারা সহ্য করে। কেহ বলিতে পারেন,—'হইতে পারে, তুমি ইহাদের সম্বন্ধে যাহা বলিতেছ, তাহা সত্য, কিন্তু ইহাদের দ্বারা সংসারের কি উপকার হইল?' কিন্তু ভাবুক বুঝিবেন, ভারতবর্ষের অবনতির কারণ—ধর্ম্মের অবনতি! কপট ব্যক্তির কপটাচারে ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা জন্মিয়াছে। পাশ্চাত্য আদর্শে আত্মসুখার্জ্জনই জীবনের উদ্দেশ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। যে কার্য্যফলে দৈহিক সুখসাচ্ছন্দ্যে থাকা যায়, সেই কার্যই প্রকৃত কার্য্য বলিয়া গণ্য হইতেছে। যে ব্যক্তি সহৃদয় বলিয়া আত্ম-পরিচয় দেন, তিনিও—যাহারা ঈশ্বরোদ্দেশে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহাদিগকে ভ্রান্ত বলেন। যখন দেখিবেন, এই যুবাবৃন্দ ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইয়া চরম অবস্থায় উপস্থিত হইয়াছে, যখন দেখিবেন, আনন্দময়ের আশ্রয়ে পরমানন্দ লাভ করিয়াছে, যখন রোগ-শোক-তাড়নায় ও চতুর্দ্দিকে মারীভয়ে বিচলিত হইয়া আভাস পাইবেন যে, যাহার জন্য আজীবন বিব্রত ছিলাম, তাহাতে কেবল চিন্তাজ্বরে জীর্ণ হইয়াছি; সম্মুখে মৃত্যুচ্ছায়া দেখিয়া যখন বিকল হইবেন, তখন বুঝিবেন—এ বালকেরা কি পন্থা অবলম্বন করিয়াছিল! তখন বুঝিবেন, হৃদয়ে শান্তি লাভের একমাত্র উপায়ই ধর্ম্ম। রোগ-শোক-মৃত্যু-সঙ্কুল ধরায় স্থির থাকিবার অপর উপায় নাই। এই বালকগণের দৃষ্টান্তে বুঝিবেন, ধর্ম্ম ভাণ নয়, ধর্ম্ম হৃদয়ের বস্তু—অর্জ্জন করা যায় এবং সেই অর্জ্জনই সার অর্জ্জন! তখন ভারতে ধীরে ধীরে ধর্ম্মের পূর্ব্ব-মাহাত্ম্য ভারতবাসীর অনুভূত, হইলে, তাহারা সকলে বুঝিতে পারিবে—ধর্ম্মেই ভারতের উন্নতি, ধর্ম্মেই ভারতের প্রাধান্য—ধর্ম্মই ভারতের জীবন।

সাধারণ ব্যক্তির মনে আপত্তি উঠিতে পারে যে, ভারতের ধর্ম্মজীবন হইয়াই তো ভারতের সর্ব্বনাশ হইয়াছে! ধর্ম্মজীবন হওয়ায় ভারতের বিজ্ঞান নাই, শিল্প নাই, ভারত হীনতেজা ও পরাধীন। এরূপ যাঁহারা বলেন, তাঁহারা ধর্ম্ম কি, জানেন না। ভারতের যে সকল পূর্ব্বকীর্ত্তি শুনিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হন, পাশ্চাত্যের যে সকল

বৈজ্ঞানিক কার্য্য দেখিয়া তাঁহারা স্পর্দ্ধা করিয়া বলেন, "ভারতেরও এ সকল ছিল," —জানিবেন, সেই সকল কীর্ত্তি ভারতের ধর্ম্মবলে। যাহা জাতীয় জীবন, তদবলম্বন ব্যতীত জাতীয় উন্নতি সাধন হইতে পারে না। ইংলণ্ডের অর্থোপার্জ্জন এবং ফরাসীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা যেরূপ জাতীয় উন্নতির ভিত্তি, ভারতের ধর্ম্মও সেইরূপ। ধর্ম্মাশ্রয় ব্যতীত ভারতের উন্নতির প্রত্যাশা বিফল, ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের ধর্ম্মের উন্নতি ভিন্ন কদাচ উন্নতি হইবে না। আমরা যথার্থ ধর্ম্মপ্রাণ হইলে আজই দেখিতে পাইব, ভারতও পূর্ব্বের ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীপরমহংসদেব-প্রতিশ্রুত দ্বিবিধ পন্থার উল্লেখ করিয়া দ্বিবিধ ফললাভ বর্ণনা করিবার চেষ্টা পাইয়াছি এবং সংক্ষেপে দেখাইয়াছি যে, স্বামী বিবেকানন্দ উভয় সাধনেই সিদ্ধ। কিন্তু উভয় সাধনার ফল যাহা বর্ণনা করিয়াছি, তাহা সকলের চক্ষে পড়ে নাই।

আমাদের জাতীয় উন্নতির নিমিত্ত বিদেশে যাইয়া কলকব্জা শিক্ষা করা উচিত— আমাদের নেতারা বলেন। কেহ বা বলেন, বৈজ্ঞানিকতত্ত্বে উন্নত হও, বিজ্ঞানই জাতীয় উন্নতি সাধন করিবে। রাজনৈতিক আন্দোলনই কাহারও মতে উন্নতির নির্দ্দিষ্ট পথ। কিন্তু এই সকল নেতারা যদি এ কথাটি বিবেচনা করেন যে, কে ঐ সকল আমাদিগকে শিখাইবে আর কেনই বা শিখাইবে? বিনা স্বার্থে কেহ কোনও কাজ করিয়া থাকে কি? আমরা ঐ সকল শিখিয়া তাহাদের অপেক্ষা উন্নত হইব, এইজন্যই কি তাহারা আমাদিগকে শিক্ষা প্রদান করিবে?—ইহা কদাচ হইতে পারে না। পাশ্চাত্যজাতি সকলের মধ্যে পরস্পরে নানা বিষয়ে আদান-প্রদান চলে, এইজন্য পাশ্চাত্য জাতিরা পরস্পরের সহকারী। আমরা ঐ উন্নত জাতি সকলের সহিত কি আদান-প্রদান করিব? আমাদের দিবার বস্তু কি আছে? সকলই ত গিয়াছে। এক বস্তু আছে—ধর্ম্ম, অবশ্য এ বেদমূলক ধর্ম্মের তুলনা নাই—কিন্তু সেই ধর্ম্মও তো এ সময় অতি ক্ষীণ অবস্থায় অবস্থিত। ধর্ম্মোন্নতির জন্য ভারতবাসীর অন্যের মুখাপেক্ষী হইতে হয় না সত্য এবং ভারতবাসী-প্রদত্ত শিক্ষাই ভারতবাসীকে ধর্ম্মোন্নত করিতে পারে। ভারত নিজে ধর্ম্মোন্নতি করিয়া যদি অপর জাতি সকলের সহিত আবার আদান-প্রদানে প্রবৃত্ত হয়, তবেই আনত-মস্তকে অপর উন্নত জাতিসকল ভারতকে সাংসারিক বিদ্যা গুরুদক্ষিণাস্বরূপ প্রদান করিয়া প্রকৃত সত্য লাভাশায় ভারতকে আশ্রয় করিবে। 'সাম্য—সাম্য' এই কথা সকলের মুখেই শুনি, বাস্তবিক সমস্ত মানব একপরিবার-স্বরূপ বাস করে, এইরূপ উন্নত অবস্থা লাভই মনুষ্য সমাজের চরম। কিন্তু সে চরম অবস্থা পাইবার সম্ভাবনা কি? কাহারও মস্তিষ্কে উদ্ভূত হইয়াছে, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত থাকিলেই পৃথিবীতে যুদ্ধবিগ্রহ রহিত হইবে। অতএব নরঘাতী অস্ত্রসকল সৃজন করিয়া সংসারে শান্তিস্থাপনের চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু দেখা যায়, পরস্পরের প্রতি ঈর্ষাবুদ্ধিই অস্ত্রবৃদ্ধির একমাত্র কারণ। কেহ আবার বলেন, দার্শনিক শিক্ষার দ্বারাই মানব একপরিবারস্থ হইবে। কিন্তু দর্শন ত নানাবিধ—কোন্ দর্শন-বলে একপরিবারস্থ হইবে? যদি এরূপ কোনও দর্শন থাকে,

যাহার শিক্ষায় বুঝিতে পারা যায় যে, তুমি আমি এক, তোমায় ক্লেশ দিলে আমি ক্লেশ পাইব—যদি ঐরূপ একত্ব স্থাপন কোনও দর্শনের দ্বারা সম্ভব হয়—তা হ'লেই জগতে সাম্য প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, নচেৎ নয়। সে সাম্যস্থাপক দর্শন—বেদান্ত দর্শন। কিন্তু বেদান্ত দর্শন—কেবলমাত্র পাঠে তাহা হয় না, বেদান্ত দর্শন উপলব্ধি করিতে হয়। যেমন আমি আমাকে জানি, সেইরূপ তুমি আমি অভেদ ইহা জানিতে হয়। পড়া বা শোনা কথায় উপলব্ধি হয় না। ঐ উপলব্ধি সাধন-সাপেক্ষ এবং ঐ সাধন সম্পন্ন করিবার জন্যই এই অদ্বৈত-সেবাশ্রম। যথার্থ সাম্যের ভিত্তিস্বরূপ এই আশ্রমদ্বয়কে ঐ জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ-শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ স্থাপন করিয়াছেন। অতএব, এস ভাই, সকলে মিলিত হইয়া বলি, 'জয় রামকৃষ্ণের জয়! জয় বিবেকানন্দের জয়!'

[৺কাশীধামে "রামকৃষ্ণ অদ্বৈত'শ্রমে" স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে (১৯শে জানুয়ারী, ১৯১০ খৃ) পঠিত এবং 'উদ্বোধন' পত্রিকায় (১৩দশ বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৮ সাল) প্রথম প্রকাশিত]

বিবেকানন্দ ও বঙ্গীয় যুবকগণ

আজ আমরা বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে একত্রিত হইয়াছি। বিবেকানন্দ একটি অতুল সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি সন্ন্যাসী, তাঁহার ধন ছিল না, যশ মান তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন। সাধারণ জনসমাজে যে সম্পত্তির আদর করেন, সে সম্পত্তি তাঁহার নাই। তাঁহার সম্পত্তি—প্রেম। বঙ্গীয়যুবকবৃন্দকে সেই সম্পত্তির অধিকারী করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গীয় যুবকবৃন্দের উপর তাঁহার সম্পূর্ণ আশা-ভরসা ছিল; সেই নিমিত্ত তাঁহার এই অতুল সম্পত্তির অধিকারী তাঁহাদিগকেই করিয়াছেন। তাঁহার এই কষ্টার্জ্জিত সম্পত্তি কিরূপে রক্ষা করিতে হইবে, তাহারও তিনি উপায় নির্ণয় করিয়াছেন। অতি যত্নে এই সম্পত্তি রক্ষিত হয়। অপর সম্পত্তি রক্ষার নিমিত্ত নানা জনের সাহায্য প্রয়োজন হয়, কিন্তু এ সম্পত্তির রক্ষক সম্পত্তির অধিকারী স্বয়ং। মনে স্থির বিশ্বাস রাখ, মনুষ্যত্বের একমাত্র উপায়—হীন স্বার্থত্যাগ। এই হীন স্বার্থত্যাগ করিলেই পরকার্য্য-মহাব্রতে অগ্রসর হইতে পারিবে। "অগ্রসর হও, পশ্চাৎপদ হইও না"—বিবেকানন্দ বার বার উচ্চৈঃস্বরে এই উপদেশ প্রচার করিয়াছেন। এই প্রচার-কার্য্য ভারতমাতার কার্য্য,—দীন, হীন, সন্তাপিত, পদদলিত ভারতমাতার সন্তানের কার্য্য, যে কার্য্য সাধনের নিমিত্ত বিবেকানন্দ অনলস হইয়া জীবন উৎসর্গ করিয়া সমস্ত পৃথিবী পর্য্যটন করিয়াছেন। ভারতের উন্নতি সাধন তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এবং তাঁহার শিষ্যদিগকে সেই উদ্দেশ্যে সাহায্যের নিমিত্ত বারবার উত্তেজিত করিয়াছেন। ভারতের পুনরুত্থান কিরূপে সাধিত হইবে, এই নিমিত্ত আজীবন তিনি ব্যাকুল ছিলেন। যে মহাত্মা তাঁহার সেই মহাব্রত গ্রহণ

করিবেন, তিনি বিবেকানন্দের আজীবন কার্য্য সমালোচনা করুন। বিবেকানন্দ বলিতেন, "প্রত্যেক জাতীয় জীবনের একটি মেরুদণ্ড আছে, এই মেরুদণ্ড ভগ্ন হইলে, জাতীয় জীবন বিনষ্ট হইবে।" তিনি তাঁহার পত্রে তিনটি জাতির বিষয় বলিয়াছেন, —ফরাসী, ইংরাজ ও হিন্দু। ফরাসী-জীবনের কেন্দ্র—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, রাজ্যশাসনে সকলের অধিকার—এই তাহাদের মূলমন্ত্র ; তাহাদের উপর যে অত্যাচারই হোক, তাহা তাহারা বিনা বাক্যে সহ্য করিবে, কিন্তু তাহাদের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিলে উন্মাদবৎ আচরণ করিবে, ভালমন্দ কিছুই বিচার করিবে না। নগর ভস্মসাৎ করিবে, অট্টালিকা চূর্ণ করিবে, নরহত্যা করিবে। যতদিন না তাহারা সেই স্বাধীনতা পুনঃ প্রাপ্ত হয়, তাহারা নিবৃত্ত হইবে না। ব্যবসায়ী ইংরাজ-জীবন লাভালাভ হিসাবের উপর স্থাপিত. তাহাদের যাহা যাহা করিতে বলো—করিবে ; কিন্তু যদি তাহাদের নিকট অর্থ চাও, তাহার হিসাব চাহিবে! রাজসম্মান দিতে তাহারা সম্পূর্ণ উৎসাহিত, কিন্তু রাজাকে বিনা হিসাবে এক কপর্দ্দক দিবে না। তাহারা হিসাবনিকাশ না পাইলে একেবারে দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইবে। এই দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য অবস্থায় রাজাকেও হত্যা করিয়াছে। হিন্দুর জীবন—ধর্ম্ম। হিন্দুকে অর্দ্ধাশনে রাখো, আবাসহীন করো, কিছুতেই দ্বিরুক্তি করিবে না,—কিন্তু তাহার ধর্ম্মের উপর একবার হস্তক্ষেপ করো, তাহা কোনরূপেই সহ্য করিবে না। পাঠানেরা রাজা হইয়া ধর্ম্ম চাসনা করিয়াছিল, এই নিমিত্ত হিন্দু কর্ত্তৃক তাহাদের সিংহাসন বার বার চালিত হইয়া একজাতীয় পাঠানের পরিবর্ত্তে অপর জাতীয় পাঠান স্থাপিত হইয়াছিল, এবং পাঠানের কোনও বংশধারা ভারত-সিংহাসনে স্থায়ী হয় নাই। মোগলেরা ভারত-অধিকার প্রাপ্ত হইল, আকবর হইতে ক্রমান্বয়ে সম্রাটেরা কেহই হিন্দুর ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করেন নাই, তাঁহাদের সাম্রাজ্যও অটলভাবে চলিল, কিন্তু যখন আওরংজেব হিন্দুর ধর্ম্মের প্রতি হস্তক্ষেপ করিলেন, অমনি মোগলসাম্রাজ্য ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। 'কার্ত্তুজ' কাটায় ধর্ম্মনষ্টের আশঙ্কায় সিপাহীবিদ্রোহে ইংরাজ রাজ্য টলটলায়মান হইয়াছিল। ধর্ম্ম—হিন্দুজীবনের কেন্দ্রস্বরূপ। যদি হিন্দুর জাতীয় জীবন উন্নত করিতে হয়, বিবেকানন্দের মতে তাহা ধর্ম্মের দ্বারাই হইবে। এস্থলে তর্ক উঠিতে পারে, জাতীয়-জীবন ধর্ম্মের উপর স্থাপিত, হিন্দুর তো ধর্ম্মনাশ হয় নাই ; তবে এরূপ হীনাবস্থা কেন? তাহার উত্তর, সনাতনধর্ম্ম একবারে বিলুপ্ত হইবার নয়, কিন্তু স্বার্থচালিত ধর্ম্মযাজকেরা তাহাদের স্বার্থপোষণে কৃতসংকল্প হইয়া হিন্দুধর্ম্ম অতি মলিন করিয়াছে। এই হীন অবস্থা সেই মালিন্যের ফল। বিবেকানন্দ বলেন,—"অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ গীতায় যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, ধর্ম্মযাজকের ব্যাখ্যায় সেই গীতার স্বরূপ অর্থ লুপ্ত হইয়াছে। গীতার মতানুসারে এক্ষণে দেখা যায়, ক্রিশ্চান-ধর্ম্মাবলম্বী পাশ্চাত্য-প্রদেশ চালিত।" বিবেকানন্দ বলেন, ক্রিশ্চান-ধর্ম্মের উপদেষ্টা যিশু বলিয়া গিয়াছেন, "যদি তোমার একগালে আঘাত করে, তোমার অপর গাল ফিরাইয়া দাও, যীশু আসিতেছেন, সকলে পোঁটলাপুঁটলি বাঁধিয়া প্রস্তুত হইয়া থাক।" গীতায় ভগবান বলিয়াছেন—"বীর-বীর্য্য প্রকাশপূর্ব্বক পৃথিবী ভোগ কর ; বীর-বীর্য্য প্রকাশে

চতুর্ব্বর্গ লাভ করিতে পারিবে।" দেখা যাইতেছে,—গীতার উপদেশ গ্রহণ করিয়া ইংরাজ পৃথিবী ভোগ করিতেছে, আর ভারতবাসী পোঁটলাপুঁটলি বাঁধিয়া বসিয়া আছে।" কেহ বলিতে পারেন, "সাংসারিক কার্যে ব্রতী হওয়া ত সন্ন্যাসধর্ম্মের বিরুদ্ধ।" বিবেকানন্দ বলেন,—"সন্ন্যাসধর্ম্ম সকলের নয়। বুদ্ধদেব সকলের জন্য সন্ন্যাস-ধর্ম্ম নির্দ্দেশ করায় অনেক ভণ্ড সন্ন্যাসী হইয়াছিল, তাহাদের দ্বারাই ভারতের অবনতি হইয়াছে।" যাঁহারা সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, বিবেকানন্দ তাঁহাদের নিমিত্ত কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—তাঁহাদের কার্য্য সকলকে শিক্ষা প্রদান। সন্ন্যাসীদের তিনি বলেন,—"দেশে, দেশে, গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া দীনহীন সকলকে শিক্ষা প্রদান করো, যাহাতে জনে জনে স্বধর্ম্মপালনে সক্ষম হয়, এরূপ উপদেশ দাও, গৃহীকে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম শিক্ষা দাও।" উপস্থিত হিন্দুধর্ম্মের প্রধান মালিন্য এই যে, তমোগুণকে আমরা সত্বগুণ বলিয়া গ্রহণ করিতেছি। ক্ষমা অতি উচ্চশক্তি। আমার প্রতি একজন অত্যাচার করিয়াছে, আমি তাহাকে ইচ্ছা করিলেই ধ্বংস করিতে পারি, তথাপি তাহাকে দণ্ড প্রদান করিলাম না, ইহার নাম ক্ষমা। কিন্তু বলবান ইংরাজের লাথি খাইয়া আসিলাম, ভয়ে কিছু বলিলাম না, বাড়ী আসিয়া বলিলাম, ক্ষমা করিয়াছি। ইহার নাম ক্ষমা নয়, ইহার নাম জড়ত্ব। এই জড়ত্ব—কুরুক্ষেত্রে অর্জ্জুনের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। ভগবান-প্রমুখাৎ গীতা শ্রবণে অর্জ্জুনের জড়ত্ব দূর হইল ও তিনি সতেজে গাণ্ডীব ধারণ করিলেন। আমরা এক্ষণে সেই জড়ত্বের উপাসনা করিতেছি, যে যার গৃহের কোণে বসিয়া আছি। কোন্ জাতি কিরূপে উন্নতিলাভ করিতেছে, তাহা দেখিবার অবকাশ নেই, ধর্ম্মযাজকের কুপ্রথা মতে ভ্রমণ করিলে জাতি যাইবে, আমরা ঘরের ভিতরই বসিয়া থাকিব, কিছুই দেখিব না—শুনিব না, মুখে এক একবার উন্নতি উন্নতি করিব,—জড়ত্বের এই অধঃসীমা।

জাপান-ভ্রমণে বিবেকানন্দ দেখিয়াছিলেন, জাপান সকল সভ্যজাতির নিকট উপদেশ গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু তাহার জাপানীত্ব বজায় রাখিয়াছে। ইংরাজের যে সকল শিক্ষা পাইয়াছে, তাহার আড়ম্বর পরিত্যাগপূর্ব্বক ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। বিবেকানন্দ বলেন, "আমরাও সেইরূপ মর্ম্ম গ্রহণ করিব, কিন্তু আড়ম্বরে প্রয়োজন নাই। ইংরাজ পুষ্টিকর আহার করে, আমরাও পুষ্টিকর আহার করিব, টেবিল চেয়ারের আড়ম্বরে প্রয়োজন নাই। ইংরাজ—ইংরাজিরকমে চলে, আমরা হিন্দুরকমে চলিব। যেখানে যা ভাল পাইব—লইব, কিন্তু সর্ব্বদাই মনে রাখিব—আমরা হিন্দু, অন্তরে বাহিরে হিন্দু, হিন্দুর স্বতন্ত্রতা নষ্ট করিব না। এই স্থলে একটি আপত্তি উঠিতে পারে। অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি বলেন যে, ধর্ম্ম-ভিত্তি করিলে ভারতের উন্নতি-সাধন হইবে না। কারণ, ভারতবাসী সকলে এক-ধর্ম্মাবলম্বী নহে। ভারতে মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন, অগ্নি-উপাসক, পার্শী প্রভৃতি নানাজাতি আছে, তাহারা সকলে একপ্রাণ না হইলে—ভারত উন্নত কিরূপে হইতে পারে? এই প্রশ্নের বিবেকানন্দ একটি চমৎকার উত্তর প্রদান করেন। বিবেকানন্দ বলেন,—"নর-সেবা তোমার এক মাত্র ব্রত করো। এই সেবাধর্ম্ম প্রকৃত হিন্দু-ধর্ম্ম। মনুষ্যমাত্রেই পরমাত্মার মূর্ত্তিস্বরূপ। ব্রহ্মের বিকাশই মনুষ্য। এই

মনুষ্যের সেবাই হিন্দুর পরম ধর্ম। প্রকৃত বৈদান্তিক সমস্ত বস্তুতেই ব্রহ্ম দর্শন করেন, সেই ব্রহ্মের সেবার নিমিত্ত নরসেবায় নিযুক্ত থাকেন। আমরা সেই ব্রহ্মের স্বরূপ জানিয়া যদি প্রত্যেক মানবের সেবায় নিযুক্ত থাকি, তাহা হইলে মুসলমান, বৌদ্ধ প্রভৃতি পার্থক্য কোথায় থাকিবে? সেই সেবায় মুগ্ধ হইবে না, এমন মানবদেহধারী কে থাকিতে পারে? অহিন্দু বলিয়া ঘৃণা করিলে পার্থক্য জন্মিবে, কিন্তু সেবাধর্মে পার্থক্য কোথায়?" বিবেকানন্দ যে সকল সেবাশ্রম স্থাপন করিয়াছেন, সেই সকল আশ্রম দেখিলে এই যে সংশয়—আর কাহারো মনে থাকিবে না। তিনি বুঝিবেন যে প্রকৃত হিন্দুধর্ম, এই সেবাধর্ম অবলম্বনই—ভারতের একতার একমাত্র ভিত্তি। সেই ভিত্তির উপর স্থাপিত হইয়া ভারত একপ্রাণ হইবে। ইহাতে ঘৃণা-বিদ্বেষ তিরোহিত হইবে; যিনি সেবাধর্ম গ্রহণ করিবেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন যে, তিনি মনুষ্য—ব্রহ্ম তাহাতে বিরাজমান। সেই ব্রহ্ম প্রত্যক্ষ করিয়া অপরের সেবা করিবেন ও সেবা দ্বারা সেই সেব্য ব্যক্তিরও ব্রহ্ম উদ্দীপিত হইবে। আপত্তি হইতে পারে, ইহা কঠিন পন্থা,—কঠিন পন্থাই বটে, সেই কারণে বিবেকানন্দ ধনী বা বড়লোকের দ্বারস্থ হন নাই, বিলাসী হইতে শত হস্ত দূরে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত বঙ্গীয় যুবকগণকে তাঁহার কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছেন। তাঁহারা উদ্যমশীল, তাঁহারা মনুষ্য, তাঁহারাই বিবেকানন্দের কার্য্যভার গ্রহণে সক্ষম। তিনি বার বার বলিয়াছেন,—"বঙ্গযুবক, বিশ্বাস করো—তোমরা মনুষ্য, বিশ্বাস করো—তোমরা অপরিসীম কার্য্যক্ষম। বিশ্বাস করো—ভগবান তোমাদের সহায়, বিশ্বাস করো—ভারত তোমাদের মুখাপেক্ষী, বিশ্বাস করো—জনে জনে তোমরা ভারত উদ্ধারে সক্ষম। অগ্রসর হও—পশ্চাৎপদ হইও না, তোমরাই আত্মবলিদানে ভারতমাতার প্রীতি সাধন করিতে পারিবে, বিশ্বাস করো—তোমাদের সার্থক জন্ম। বিশ্বাস করো—কখনই নিষ্ফল হইবে না; তোমাদের বিশ্বাসে মেরু টলিবে, সাগর শুষিবে, ভারতের পুনরুদ্ধারে তোমরাই একমাত্র কৃতী।" কাহাকে ঘৃণা করিও না, ভগবান রামকৃষ্ণের মানা—বিবেকানন্দের গুরুদেবের মানা। বিশ্বাসে শুষ্ক স্বতন্ত্রতা আসিতে পারে, ভক্তিতে সেই স্বতন্ত্রতা দূর করে। ভক্তির কোমলতা জ্ঞানের দ্বারা দৃঢ় করো। রামকৃষ্ণের জীবনে ভক্তি, জ্ঞান ও বিশ্বাসের সমন্বয় দেখো,—কল্পিত নৈতিক ধর্মে আবদ্ধ থাকিও না, কাহারো স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিও না, আত্মত্যাগপূর্ব্বক উৎসাহিত হইয়া কার্য্যভার গ্রহণ করো। ত্যাগ অর্থে সংসার ত্যাগ নয়, দশকর্ম্মান্বিত প্রকৃত সংসারী হও, প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করো। বিবেকানন্দের জন্মোৎসবে আসিয়াছ, প্রাণে প্রাণে সকলেরই বাসনা—সেই মহাত্মার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন করিবে। কিন্তু বোঝো, গগনস্পর্শী স্বর্ণচূড় স্তম্ভ স্থাপন করিয়া দেশে দেশে, পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে তাঁহার চিত্রপট স্থাপন করিয়া—সেই মহানুভবের স্মৃতি-স্থাপনে সক্ষম হইবে না, কিন্তু জনে জনে তাঁহার স্মৃতি স্থাপন করিতে পারিবে। তোমরা নিঃস্ব—আরও ভালো, তোমাদের উদ্যম ও উৎসাহ অপরিসীম! মনুষ্যত্ব লাভ করো,—তোমরা মনুষ্য, এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ় করো; ভগবান রামকৃষ্ণ তোমাদের আশীর্ব্বাদ করিবেন ও কার্য্যশীল বিবেকানন্দ

তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিয়া তোমাদের উৎসাহ প্রদান করিবেন। "বিশ্বাস করো"—বিবেকানন্দের এই শেষ কথা। এই বিশ্বাস দ্বারাই বিবেকানন্দের স্মৃতি স্থাপনা করিবে।

[স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে (২০শে জানুয়ারী, ১৯০৯ খৃঃ) 'বেলুড়মঠে' পঠিত এবং "উদ্বোধন" পাক্ষিক পত্রিকায় (৯ম বর্ষ, ১লা মাঘ, ১৩১৩ সাল) প্রথম প্রকাশিত।]

রাম দাদা

(ভক্ত-চূড়ামণি স্বর্গীয় রামচন্দ্র দত্ত)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণসেবক ৺রামচন্দ্র দত্তের পরিচয় অনেকেই পাইয়াছেন। তাঁহার ভক্ত-জীবন কিরূপে গঠিত হইয়াছিল, তাহাও রামচন্দ্রের ভক্তের দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে "তত্ত্ব-মঞ্জরী"তে প্রকাশিত হইয়াছে। কিয়ৎপরিমাণে বলিলাম, তাহার কারণ এই, যিনি যতই লিখুন, ভক্তের প্রভুর সহিত সম্যক্ আন্তরিক সম্বন্ধ কেহই প্রচার করিতে সক্ষম নয়। ভক্তের হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে ভক্তি-রত্ন গোপনে রক্ষিত থাকে, তাহার বর্ণনা সেই ভক্তই করিতে সক্ষম। কারণ, সে হৃদয়ভাব বর্ণনার উপযোগী অদ্যাবধি কোন ভাষা হয় নাই। সে ছবি ভক্তের হৃদয়ে থাকে, মুগ্ধচিত্তে কেবল ভক্তই তাহা দেখেন, আর কাহারও সে স্থলে প্রবেশ অধিকার নাই। সে প্রভুর মন্দির, প্রভুই বিরাজ করেন। সেই মন্দিরে ভক্তের সহিত প্রভুর অনন্ত লীলা। আমি কেবল, আমি যে ভাবে রামচন্দ্রকে দেখিয়াছিলাম, তাহা উল্লেখ করিবার প্রয়াস পাইতেছি।

রামচন্দ্রের সিমলায় বাটীতে রামচন্দ্রের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ। সে দিন তেজচন্দ্র মিত্র নামে একজন ভক্ত ষ্টার থিয়েটারে (ষ্টার থিয়েটার তখন বিডন স্ট্রীটে) একটু চিরকুট লিখিয়া যান যে, সিমলা মধুরায়ের গলিস্থিত রামচন্দ্র দত্তের বাটীতে প্রভু উদয় হইবেন। ভক্ত আমার বিনা অনুরোধে সেই চিরকুট রাখিয়া আসিয়াছিলেন। পরে শুনিয়াছি, ঐ ভক্ত পরমহংসদেবের আদেশে চিরকুট লিখিয়া গিয়াছিলেন। থিয়েটারে গিয়া তাহা পাঠ মাত্রেই আমি আকর্ষিত হইলাম। ধীরে ধীরে চলিলাম, প্রতি পদবিক্ষেপে ভাবিতে লাগিলাম, বিনা আহ্বানে কেন যাইব! দাঁড়াই, ফিরিব মনে করি, কিন্তু চলিলাম। এমন কি, রামচন্দ্রের বাটীর গলিতে আসিয়াও ইতস্ততঃ করিলাম। অবশেষে তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইলাম। রামচন্দ্র তখন তাঁহার বাটীর দ্বারদেশে ছিলেন। বোধ হয় আমায় চিনিতেন, আমাকে দেখিবামাত্র আমায় পরম যত্নে আহ্বান করিলেন এবং সামাজিক শিষ্টাচার না করিয়া প্রভুর গুণানুবাদ করিতে লাগিলেন। অতিশয় আগ্রহ, যেন তাঁহার মনে ভয় হইতে লাগিল, হয় তো এটা কি

খেয়ালে আসিয়া পড়িয়াছে. স্বর্গের দ্বারে আসিয়া আবার পাছে ফেরে! রামচন্দ্র বিশেষ যত্নে প্রভুর মাহাত্ম্য-বর্ণন করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে প্রভু দুইবার থিয়েটারে আসিয়াছিলেন। প্রভুর নিকট পরিচিত ছিলাম বটে, কিন্তু যে পতিতপাবন আমায় আশ্রয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারি নাই। পরে প্রভুকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার আশ্বাস-বাক্য পাইয়া ফিরিলাম।

প্রভু যেখানে যাইতেন, রামচন্দ্র প্রায়ই সঙ্গে থাকিতেন। কিন্তু প্রভু যখন থিয়েটারে আসিয়াছিলেন, প্রভুর নিমিত্ত রামচন্দ্র ভোগ পাঠান, তথাপি স্বয়ং আসেন নাই। থিয়েটার তিনি কলুষিত-ভূমি জ্ঞান করিতেন। কিন্তু তাঁহার বাটীতে আমার প্রতি প্রভুর কৃপা দেখিয়া, তিনি তাঁহার বন্ধু রামকৃষ্ণাশ্রিত শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মজুমদারের নিকট আক্ষেপ প্রকাশ করেন যে, হায়! আমি কি নির্ব্বোধ যে, প্রভু যে স্থলে পদার্পণ করিয়াছেন, যেখানে পতিতকে কৃপা করিতে উদয় হইয়াছেন, সে স্থান আমি কলুষিত জ্ঞান করিলাম! প্রভুর লীলা প্রভুই জানেন, দীনদয়াময় থিয়েটার দর্শনচ্ছলে দীনকে দয়া করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা আমি মূঢ়, কিরূপে বুঝিব! দেবেন, শীঘ্রই দেখিবে, থিয়েটারের লোক আর সামান্য থিয়েটারের লোক থাকিবে না, প্রভুর কৃপায় সকলেই আমার আরাধ্য ব্যক্তি হইবে।

ইহার পর দক্ষিণেশ্বরে রামবাবুকে দর্শন করি। অতি দীনভাবে আমার নিকট উপস্থিত হইয়া পঞ্চবটীতে আমায় লইয়া গেলেন। তত্ত্বমঞ্জরীর পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন যে, রাম পরমহংসদেবকে অবতার জ্ঞান করিতেন। উপরোক্ত দেবেন বাবুর নিকট শুনিয়াছিলেন যে, আমারও ধারণা, প্রভু অবতার। আমার এই ধারণা শুনিয়া রাম বিভোর! "গিরিশ দাদা" বলিয়া সম্বোধন করিলেন। তদবধি আমিও "রাম দাদা" বলিতাম। পঞ্চবটীতে রামদাদা গদগদকণ্ঠ, হৃদয়াবেগে কথা আটকাইয়া যাইতেছে, বলিতে লাগিলেন, "গিরিশ দাদা, বুঝিয়াছ কি, এবার একে তিন,—গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ, অদ্বৈত—তিনের সমষ্টি পরমহংসদেব! তাঁহার ভাব এই যে, একাধারে প্রেম, ভক্তি ও জ্ঞান। গৌরাঙ্গ-অবতারে তিনাধারে তাঁহার বিকাশ ছিল।" রামদাদা যত পারিলেন, বলিতে লাগিলেন, ভাব কতক প্রকাশ পাইল, ভাবুকের ভাব কতক অন্তরে রহিয়া গেল। রামদাদার তখন আমি এরূপ আত্মীয় হইলাম যে, আমাকে অদেয় তাঁহার কিছুই রহিল না। পুনঃ পুনঃ করযোড়ে কহিতে লাগিলেন,—বোধ হয়, আমি নিবারণ না করিলে পঞ্চবটীতে লুণ্ঠিত হইতেন। আমাকে পবিত্র হইতে পবিত্র জ্ঞান করিলেন। তাঁহার পরমাত্মীয় হইলাম। নিত্যানন্দ প্রভুর উক্তি গানে আছে,—

"যে জন গৌরাঙ্গ ভজে
সেই আমার প্রাণ রে।"

আমি যেন রামদাদার প্রাণের অধিক প্রিয়তম হইলাম। সেদিন রামদাদা আনন্দে বিভোর! যেন তিনি কি অপূর্ব্ব বস্তু পাইয়াছেন। ইহার পর সর্ব্বদাই আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হইত। থিয়েটার যেন তাঁহার তীর্থস্থান হইল। থিয়েটারে না গেলে,

আমার সহিত ঠাকুরের কথা না কহিলে যেন তাঁহার দিন যাপন হইত না। আমি যে কথা বলিতাম, সে কথার বিরুদ্ধে যে কোনও কথা হইতে পারে, তাহা তাঁহার মস্তিষ্কে স্থান পাইত না। কেহ যদি কোন বিরুদ্ধ কথা কহিত, তিনি গর্জ্জন করিয়া বলিতেন,—"কি, গিরিশদাদার কথার উপর কথা, ঠাকুর বলিয়াছেন, ওর পাঁচসিকা পাঁচ আনা বুদ্ধি।" রাম দাদা অপেক্ষা আমি যে কোন অংশে বুদ্ধিমান্ বা বিবেচক, ইহা আত্মম্ভরিতা করিয়াও আমি বুঝিতে পারিতাম না। কেন না, পদে পদে আমি দেখিতে পাইতাম যে, রামদাদা অতি বিচক্ষণ। রামদাদার আর পরামর্শ কি, পরামর্শের বিষয় এক ঠাকুর! ঠাকুরকে লইয়া কি করিবেন, ঠাকুরকে কিরূপে প্রচার করিবেন, কিসে ঠাকুরের সেবা উত্তম হয়, দিবানিশি তাঁহার এই চিন্তাই ছিল। ঠাকুর বলিয়াছিলেন,—"রাম আমায় বড় ভক্তি করে।" ঠাকুর সম্বন্ধে ভক্তি-বলে রাম অভ্রান্ত ছিলেন। প্রায় অনেকের বাড়ী মহোৎসবের আয়োজন হইলে, তাঁহাকে রামদাদার সহিত পরামর্শ করিতে বাধ্য হইতে হইত। কারণ, ভক্তপরিবৃত ঠাকুরকে লইয়া রামদাদার বাড়ীতে হামাসা পরব ছিল। যাঁহারা ঠাকুরকে দর্শন করিতে রামদাদার গৃহে উপস্থিত হইতেন, প্রসাদ না পাওয়াইয়া রামদাদা তাঁহাকে আসিতে দিতেন না। সুতরাং মহোৎসবের আয়োজনে রামদাদার উপদেশ প্রয়োজন হইত। কিন্তু রামদাদার তাঁহার নিজ বাড়ীর মহোৎসবে কি কি ভোজ্যদ্রব্য আয়োজন করিবেন, সে পরামর্শ আমার সহিতই হইত। "কি বল গিরিশ দাদা, মালপো করা যাক,—জিলিপি ফরমাস দেওয়া যাক,—অমুক হোক—তমুক হোক।" বলা বাহুল্য যে, তিনি যেরূপ স্থির করিতেন, তাহার একটিও পরিবর্ত্তন করিবার শক্তি আমার ছিল না।

ভক্তের নানা ভাব, ভাবের অভাব পাষণ্ডেরও নাই। উন্মত্ততাবশতঃ একদিন থিয়েটারে ঠাকুরকে অকথ্য ভাষায় গালি দিলাম। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া যাইবার সময় সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রমাণও করিলাম। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে গিয়া যাকে তাকে বলেন, "শুনেছ গা! গিরিশ ঘোষ দেড়খানা লুচি খাইয়ে আমায় যা না তা বলে গালাগালি দিয়াছে।" অনেকেই বলিতে লাগিল,—"ওটা পাষণ্ড, আমরা জানি; ওর কাছেও আপনি যান?" আমার ব্যবহারে ব্যথা পাইয়া অনেকেই আমাকে তিরস্কার করিলেন। পরে রামদাদা উপস্থিত হওয়ায় ঠাকুর সমস্তই বলিলেন। রামদাদার চরিত্র এই ছিল যে, কোনওরূপ ঠাকুরকে যদি কেহ শ্লেষ-বাক্য প্রয়োগ করিত, তাঁহার শক্তি থাকুক, বা না থাকুক, তখনই তিনি সে ব্যক্তিকে দণ্ড দিতে অগ্রসর হইতেন। রামদাদা কলিকাতাতেই আমার গালাগালির কথা শুনিয়াছেন, শেষ প্রণাম করিয়াছি, তাহাও শুনিয়াছেন। তাহার পর ঠাকুর যখন তাঁহাকে সমস্ত বলিলেন, তিনি বলিলেন, "বেশ তো করিয়াছে।" ঠাকুর সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "শোন—শোন, রাম কি বলে শোনো, আমার মাতৃ-পিতৃ উচ্চারণ করিয়াছে, তবু বলে বেশ করিয়াছে!" রামদাদা অবিচল, বলিলেন,—"হ্যাঁ ত! কালীয়নাগকে যখন শ্রীকৃষ্ণ তাড়না করিয়া বলেন, 'তুমি কি নিমিত্ত বিষ উদ্গীরণ কর?' কালীয়নাগ বলিয়াছিল, 'ঠাকুর, তুমি আমায় বিষ দিয়াছ, সুধা উদ্গীরণ কিরূপে করিব?'

আপনি থিয়েটারের গিরিশ ঘোষকে যাহা দিয়াছেন, তাই দিয়া আপনার পূজা করিয়াছে।" কথা শুনিয়া প্রভুর মুখমণ্ডল আরক্ত হইল, তেজঃপুঞ্জ বহির্গত হইতে লাগিল, তথাপি হাস্য করিয়া বলিলেন, "যাই হোক, আর কি তার বাড়ীতে যাওয়া ভাল ?" অনেকেই বলিল, "না।" পতিতপাবন বলিলেন, "রাম, তবে গাড়ী আনিতে বল, চল, তার বাড়ী যাই।" পাঠক, এই আমার রাম দাদা! প্রণাম কেহ কাহাকে সহজে করিতে চায় না। কিন্তু রামবাবুর চরণে মস্তক অবনত হয় কি না হয়, পাঠক অনুমান করুন। পতিত ও পতিতপাবনকে রামদাদাই চিনিয়াছিলেন। ঠাকুর আমার বাড়ীতে আসিলেন। অনেক ভক্ত সঙ্গে আসিল, রামদাদাও আনন্দে গদগদ হইয়া হাস্যমুখে আমাকে সম্ভাষণ করিলেন। বিবেকানন্দও সঙ্গে ছিলেন। তিনি আমায় "ধন্য তোমার বিশ্বাস" বলিয়া আমার পায়ের ধূলা গ্রহণ করিলেন। অবশ্যই তাঁহার নিশ্চয় ধারণা হইয়াছিল, পতিতপাবন আমায় কৃপা করিয়াছেন।

কি নিমিত্ত গালাগালি দিয়াছিলাম, জানিবার জন্য পাঠকের কৌতূহল হইতে পারে। আমার মনে ধারণা ছিল, আমি ভক্তিহীন, আমি ঠাকুরকে সেবা করিতে পারিব না। কিন্তু ঠাকুর যদি আমার ছেলে হন, তাহা হইলে মমতাবশতঃ তাঁহার শুশ্রূষা করিতে পারিব। এই আমি মত্ততার বেগে ধরিয়া বসিলাম,—"তুমি আমার ছেলে হও।" ঠাকুর বলিলেন, "তা কেন,—তোর গুরু হব, তোর ইষ্ট হ'য়ে থাকবো।" তিনি ছেলে হইতে সম্মত হন না, এই আমি যা মুখে আসে—গালি পাড়ি।

রামদাদার কথা বলিতে অনেক আমার কথাই বলিয়া ফেলিতেছি, পাঠক মার্জ্জনা করিবেন। কতক অবস্থা বুঝাইব—এই আমার আকাঙ্ক্ষা, এই আকাঙ্ক্ষা কতদূর পূর্ণ হইতেছে, তাহা পাঠক বুঝিবেন।

ঠাকুর সম্বন্ধে বিশ্বাসী, অবিশ্বাসী অনেকেরই রামদাদার সহিত কথোপকথন হইত, বিস্তর, বাদানুবাদও হইয়া যাইত। বাদানুবাদে জয়ী হইব, এ প্রয়াস রামদাদার নাই। বাদী কিসে পরমহংসদেবের আশ্রিত হইবে, এই জন্যই রামদাদা ব্যাকুল। বাদানুবাদের পর যদি কেহ না বুঝিয়া চলিয়া যাইত, রামবাবু আক্ষেপ করিতেন,—"আহা, ঠাকুর আমায় ও ব্যক্তিকে বুঝাইবার শক্তি দিলেন না। আহা, ও বড় অভাগা! এমন দয়াল ঠাকুরের কৃপাপ্রার্থী হইল না।" রামদাদা উচ্চকণ্ঠে তর্ক করিতেন বটে, কিন্তু শেষে তাঁহার মনোভাব বুঝা যাইত। ইনি বাদীকে দাম্ভিক বর্ব্বর বলিয়া গালি দিতেন না। নিজ শক্তির ত্রুটি অনুভব করিতেন ও তাহার নিমিত্ত ঠাকুরের চরণে প্রার্থনা জানাইতেন। এরূপ ঘটনা অনেক সময়েই হইয়াছে। যে দিন পরমহংসদেব বলেন যে, "আমি আর বকিতে পারি না,—রাম প্রভৃতিকে শক্তি দে মা! উহারা যা বলিবার বলিয়া আমার নিকট আনিবে, আমি স্পর্শ করিয়া দিব।" রামদাদার উৎসাহ শতগুণে বৃদ্ধি হইল। আগ্রহ দেখিয়া অনেকে অনেক কথা বলিত, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও করিত; কিন্তু রাম দাদার উৎসাহ দিন দিন দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

"তত্ত্বমঞ্জরী"র পাঠক জানিয়াছেন, রামচন্দ্রের বৈষ্ণববংশে জন্ম, মৎস্য-মাংসের প্রতি

তাঁহার বিদ্বেষ ছিল। বাল্যকালে পল্লীগ্রামে কোনও কুটুম্বের বাড়ীতে তাঁহাকে মাংস খাইতে বলায়, তিনি বিনা সম্বলে একাকী সে বাটী পরিত্যাগ করিয়া বহুকষ্টে কলিকাতায় ফেরেন, এ ঘটনার উল্লেখ তত্ত্বমঞ্জরীতে আছে। নাস্তিক অবস্থাতেও বংশ-সংস্কারবশতঃ মাংস তিনি স্পর্শ করিতেন না। মাছ-মাংস তাঁহার বহুমূত্র রোগের পথ্য ছিল, চিকিৎসক ও আত্মীয়বর্গের বহু অনুরোধে—মৎস্য খাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু মাংস কখনও স্পর্শ করেন নাই—এত মাংসের প্রতি বিদ্বেষ। কিন্তু একদিন থিয়েটারে আমি মাংস প্রস্তুত করি; শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার উপস্থিত, রাম দাদাও উপস্থিত। সেই মাংস ঠাকুরকে মানসিক ভোগ দিলাম। ভোগ দিয়া বলিলাম, "রাম দাদা! এ তো প্রসাদ।" তিনি বলিলেন—"অবশ্য, যদি আমায় ধারণ করিতে বল, আমার মুখে দাও।" আমি বিপদগ্রস্ত হইলাম। অঙ্গুলী দ্বারা মাংস স্পর্শ করিয়া সে অঙ্গুলী তাঁহার জিহ্বায় দিলাম, রাম দাদা অবিচল রহিল। কেহ যদি সে সময় দেখিত, হয় তো মনে করিত, "ইনি যে মাংসে ঘৃণা বলেন, এ কথা মিথ্যা।" ঘৃণাভাব কিছুমাত্র লক্ষিত হয় নাই। প্রসাদ! রাম দাদার ঘৃণা নাই। কাঁকুড়গাছির উদ্যান হইতে অন্ন-প্রসাদ তিনি মুসলমান-চালিত গাড়ীতে লইয়া আসিতেন। প্রসাদ ব্যতীত কোনও অন্ন ধারণ করিতেন না। কোথাও নিমন্ত্রণ যাইলে তাঁহাকে যা দিবার একবারে দিতে বলিতেন ও নিবেদন করিয়া আহার করিতেন। আহারে বসিবার পর আর কোনও দ্রব্য তিনি গ্রহণ করিতেন না। জগন্নাথদেবের প্রসাদে লোকের যেরূপ শ্রদ্ধা, রামকৃষ্ণদেবের প্রসাদেও তাঁহার অবিকল সেইরূপ ছিল। প্রসাদ জানিলে নীচ লোকেরও উচ্ছিষ্ট খাইতেন।

কাশীপুরের বাগানে যে দিন পরমহংসদেব কল্পতরু হন, সে দিন যাহারা রামচন্দ্রকে দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্মৃতি হইতে রামচন্দ্রের ছবি কখনও তিরোহিত হইবে না। আমার ভ্রাতা শ্রীমান অতুলকৃষ্ণ বলেন,—"পরমহংসদেবের কৃপা আমি তো রামবাবুর কৃপাগুণে লাভ করিয়াছি। আমি এক পাশে দাঁড়াইয়া ছিলাম; রামবাবু হাত ধরিয়া টানিয়া আমায় প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত করেন।" এ কথার উল্লেখ করিতে করিতে অতুলকৃষ্ণ গদগদ হন। রাম বাবুর কৃপা-গুণ সে দিন অনেকেই অনুভব করিয়াছিলেন। আমার সহিত রামবাবুর অনেক দিন অনেক আলাপ হইয়াছে, কিন্তু কখনও তর্ক হয় নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি, রামবাবুই আমার নিকট উপদেশ চাহিতেন, কিন্তু আমার যখন পত্নীবিয়োগ হয়, সহানুভূতিবশতঃ অনেক ভক্তই আমার নিকট আসেন; রামবাবুও আসেন। সহানুভূতির কোনও কথা নাই, কেবল বলিলেন, "গিরিশ দাদা, এইবার তুমি মুক্ত, আর বন্ধন গ্রহণ করিও না।" আমি ভাবিলাম, বুঝি পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে নিষেধ করিতেছেন। রামবাবু আমার মনোভাব বুঝিয়া—"না না, আমি বিবাহের কথা বলিতেছি না, তাহার কল্পনামাত্র তোমার মনে উদয় হইবে না, তাহা আমি জানি; তোমার সন্তান-সন্ততি আছে, তাহাদের লইয়া একটা আড়ম্বর করিয়া সংসার করিও না। যাহারা অনন্তোপায়, তাহারা এইরূপে পত্নীবিয়োগজনিত কষ্ট সংবরণ করে। তোমার তো রামকৃষ্ণ রহিয়াছে, অন্য আড়ম্বরে তোমার প্রয়োজন কি?"

মহোদয় মহেন্দ্রলাল সরকারের বিজ্ঞানসভায় রামদাদা রাসায়নিক-শিক্ষক ছিলেন। তিনি রাসায়নিক-পরীক্ষায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তথায় আমি তাঁহার ছাত্র ছিলাম। আসিবার সময় একত্রে তাঁহার গাড়ীতে আসিতাম। সে সময় কোন রাসায়নিক পণ্ডিতের অনুমানে অম্লজান (Hydrogen) হইতে সমস্ত বস্তু উদ্ভব হইয়াছে। আসিবার সময় রামদাদার সহিত একত্রে আসিতাম। সেই সময়ে প্রায়ই অম্লজান লইয়া কথা হইত। কথায় একই ধুয়া, এক হইতে বহু; জড়-বিজ্ঞানেও ইহা প্রমাণ—এই আন্দোলন করিতে করিতে পরমহংসদেবের কথা উত্থাপন হইত। মুগ্ধ হইয়া রামদাদা বলিতেন,—"আশ্চর্য্য প্রভুর মহাত্মা! যে জড়-বিজ্ঞানে আমাকে নাস্তিক করিয়াছিল—প্রভুর কৃপায় দিব্য চক্ষু প্রস্ফুটিত হওয়ায় দেখিতেছি—প্রতি পরমাণু প্রকাশ করিতেছে—অনন্ত—অনন্ত—সকলেই অনন্ত—আদি-অন্তহীন! অনন্ত চৈতন্য প্রতি পরমাণুতে প্রত্যক্ষরূপে বিরাজিত। সভার রাসায়নিক আলোচনা—উচ্চজ্ঞান আলোচনায় পরিণত হইত এবং জ্ঞানাধার রামকৃষ্ণদেবের স্তুতিবাদের পর আমাদের সেই দিনকার মিলন সমাপ্ত হইত।

সকল কথা বর্ণনা করিলে প্রবন্ধের কলেবর অনেক বৃদ্ধি হইবে ও সর্ব্বসাধারণের ভাল না লাগিতে পারে। এক্ষণে আর একটি মাত্র ঘটনা বর্ণন করিয়া প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

পীড়িত-অবস্থায় প্রভু শ্যামপুকুরের একটি বাটী ভাড়া করিয়া আছেন। কালীপূজার দিন উপস্থিত হইল। ঠাকুর শ্রীমান্ কালীপদ ঘোষ নামক একজন ভক্তকে বলিয়াছিলেন, 'আজ কালীপূজার উপযোগী আয়োজন করিও।' কালীপদ অতি ভক্তির সহিত উদ্যোগ করিয়াছে। সন্ধ্যার সময় প্রভুর সম্মুখে পূজার উপযোগী সামগ্রী স্থাপিত হইল। একদিকে নানাবিধ ভোজ্য সামগ্রী, প্রভু অন্ন আহার করিতে পারিতেন না, তাঁহার জন্য বার্লিও আছে। অপরদিকে স্তূপাকার ফুল,—রক্তকমল, রক্তজবাই অধিক। পূর্ব্ব-পশ্চিমে লম্বা ঘর ভক্তে পরিপূর্ণ। ঘরের পশ্চিম প্রান্তে রামদাদা, আমি তাঁহার নিকট আছি। আমার অন্তর অতিশয় ব্যাকুল হইতেছে, ছটফট করিতেছে, প্রভুর সম্মুখে যাইবার জন্য আমি অস্থির। রামদাদা আমায় কি বলিলেন, ঠিক আমার স্মরণ নাই, আমার প্রকৃত অবস্থা তখন নয়, কি একটা ভাবান্তর হইয়াছে। রামদাদা যেন আমায় উৎসাহ দিয়া বলিলেন,—"যাও যাও!" রামদাদার কথায় আর সঙ্কোচ রহিল না, ভক্তমণ্ডলী অতিক্রম করিয়া প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। প্রভু আমায় দেখিয়া বলিলেন,—"কি কি—এ সব আজ ক'রতে হয়।" আমি অমনি—"তবে চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিই" বলিয়া, দুই হাতে ফুল লইয়া "জয় মা" শব্দ করিয়া পাদ-পদ্মে দিলাম। অমনি সকল ভক্তই পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগিলেন। প্রভু বরাভয়কর—প্রকাশ হইয়া সমাধিস্থ রহিলেন। সে দৃশ্য যখন আমার স্মরণ হয়, রামদাদাকে মনে পড়ে। মনে হয়, রামদাদা আমাকে সাক্ষাৎ কালীপূজা করাইলেন।

পরিশেষে একটি কথা—রামদাদার ভক্তের ভাল লাগিবে, এই জন্যই আমি উল্লেখ করিতেছি। রামদাদার দেহত্যাগের পর একদিন তাঁহাকে স্বপ্নে দেখি তপ্ত কাঞ্চন-

বর্ণের ন্যায় বর্ণ; গা খোলা, ঠ্যাং ঠ্যাংএ সাদা ধুতি পরণে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম —"রাম দাদা, এখন কি কর?" রামদাদা উত্তর করিলেন,—"যাহা করিতাম, তাহাই করি, প্রভুর সেবা করি।" পরমহংসদেব বলিতেন—"দেব-স্বপ্ন স্বপ্ন নয়—সত্য।" আমার ধারণা, দেবমূর্ত্তি রাম দাদাকে দেখিয়াছিলাম, তাহা সত্য; তিনি পরমহংস-দেবের সেবায় নিযুক্ত, তাহা সত্য; অনন্ত কাল তিনি পরমহংস দেবের সেবায় নিযুক্ত থাকিবেন সত্য।

["তত্ত্ব-মঞ্জরী" মাসিক পত্রিকায় (৯ম সংখ্যা, ১৩১১ সাল) প্রথম প্রকাশিত]

ধ্রুবতারা

ঈশ্বর সম্বন্ধে যেরূপ মতভেদ, এরূপ মতভেদ বোধ হয় আর কোনও বিষয়ে নয়। ঈশ্বর আছেন কি না, তিনি সাকার বা নিরাকার এবং কোন্ সাকার মূর্ত্তি তাঁহার স্বরূপ মূর্ত্তি, অজ্ঞানতা বশতঃ ইহা লইয়া বাদানুবাদ নিয়তই চলিতেছে। ম্যাক্সমূলার বলেন যে, প্রধানতঃ আট প্রকার ধর্ম্ম প্রচলিত আছে। অধিক থাকুক বা না থাকুক, দেখা যায় প্রত্যেক ধর্ম্মাবলম্বীর মধ্যে নানা প্রকার সম্প্রদায় ও প্রতি সম্প্রদায় যেন বিরোধী ধর্ম্মা-বলম্বী। প্রতি সম্প্রদায়ই অপর সম্প্রদায়ের জন্য নরক বন্দোবস্ত করিয়াছেন। হিন্দু-ধর্ম্মেও এইরূপ বিরোধ, আবার এক সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তির উপাসনা লইয়া পরস্পরে এইরূপই বিরোধ। কিরূপে ভগবান্ রামকৃষ্ণ পরমহংস এই সকল বিরোধ মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা যিনি পরমহংসদেব সম্বন্ধে কোন কথা কিছু শুনিয়াছেন, তাঁহার অগোচর নাই। কিন্তু সে বিষয় উপস্থিত আমাদের আলোচ্য নয়। পরমহংসদেব সকল প্রকার উপাসনার কথাই বলিয়াছেন, তাঁহার মতে মনুষ্য মাত্রেই স্বীয় আধ্যাত্মিক অবস্থা অনুসারে উপাসনা করিয়া থাকে এবং অকপটচিত্তে যেরূপই উপাসনা করে, সেই উপাসনাই প্রশস্ত। মনুষ্যের আধ্যাত্মিক অবস্থা সম্বন্ধে যাহা তিনি বলিতেন ও সে কথা আমরা যেরূপ বুঝিয়াছি, বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমি তাহাই প্রকাশ করিবার চেষ্টা পাইব।

ঈশ্বরলাভের উপায় সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন অভিপ্রায় প্রকাশিত করেন। কেহ মনে করেন, ঈশ্বর কি সহজে পাওয়া যায়? একজন বড় লোকের দেখা করিতে হইলে কত লোকের উমেদারী, কত প্রকার পরিশ্রম, কত লোকের কত প্রকার স্তব-স্তুতি করিতে হয়। এই সকল উমেদারী ও পরিশ্রমের ফলে সেই বড় লোকের দেখা পাইবে কি না সন্দেহ, কিন্তু এরূপ কষ্ট ব্যতীত যে দেখা পাইবে না, ইহা নিশ্চিত। কেহ মনে করেন, ঈশ্বর নির্গুণ, শত উপাসনা করো, কিছুতেই কিছু হইবে না। আপনাকে নির্গুণ

অবস্থায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করো, বহু সাধনার পর সেই নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্ত হইবে। কেহ মনে করেন, তাঁহার উপাসনার প্রথা সকল রহিয়াছে, সেই প্রথা-অনুসারে কার্য্য করো, পুষ্প, নৈবেদ্য প্রভৃতি দিয়া অর্চ্চনা করো, শুদ্ধরূপে মন্ত্র সকল উচ্চারণ করো, এই সকল কার্য্য করিতে করিতে যদি ত্রুটি না হয়, তাঁহার কৃপাদৃষ্টি পড়িলেও পড়িতে পারে। কেহ বা বলেন, ও সকল বাহ্য পূজায় কি ঈশ্বরের তৃপ্তি হয়? ও সকল বাহ্য পূজা নিম্ন অধিকারীর নিমিত্ত। তাঁহার নাম করো, ধ্যান করো, কীর্ত্তন করো, ক্রমে ক্রমে উন্নতি হইতে থাকিবে। কেহ বলেন, অতি শুদ্ধাচারে থাকিতে হইবে, প্রত্যহ স্নান করিয়া শুচি হও, সকাল বিকাল সন্ধ্যাহ্নিক করো, হবিষ্যান্ন আহার করো, আগে দেহ শুদ্ধি করো, তারপর সে কথা। কেহ বা বলেন, প্রাণায়াম করিয়া আগে মনস্থির করো, 'নেতি ধৌতি করিয়া দেহশুদ্ধি' করো,—উপাসনার কথা পরে। কেহ তাঁহাদের কথায় আপত্তি করিয়া বলেন যে, সংসারে থাকিয়া নানা সাংসারিক কার্য্য করিয়া—ও সকল কার্য্য কিরূপে হইবে? তাহার উত্তরে যোগপন্থী বলেন,—"সত্যই তো, তাহা হইবার নয়, অতএব সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করো।" সে কথার প্রত্যুত্তরে তাহার প্রতিবাদী বলেন, "কেন, গার্হস্থ্য ধর্ম্ম কি ধর্ম্ম নয়? গার্হস্থ্য ধর্ম্মে কি হয় না?" এই বাদ প্রতিবাদের অন্তর্ভূত একটি কথা আছে, হওয়া কাহার নাম, এ কথা তাঁহাদের উপলব্ধি হয় নাই। 'নিয়তই ঈশ্বরে মনোনিবেশ' তাহার নাম যদি হওয়া হয়, সংসারে যে সে পক্ষে পদে পদে বিঘ্ন, তাহার আর সন্দেহ নাই।

যাহাই হউক এই তো বাদানুবাদ। ঈশ্বরের সহিত আমাদের কি সম্বন্ধ, ইহা স্থির করিতে না পারাতেই এই সকল বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। ঈশ্বর বহুদূরে, এইরূপ ধারণাই এই বাদানুবাদের মূল। কিন্তু যে ভাগ্যবান্ গুরু-কৃপায় বুঝিয়াছেন যে, ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি দূরে নাই, আমার অন্তরের অন্তরে আছেন, অসহায় বাল্যকালে যে মাতৃস্নেহ পাইয়াছি, সে ঈশ্বরেরই স্নেহ,---সাকার মাতৃমূর্ত্তি হইতে আমার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল; তাঁহারই কৃপায় চলিতেছি, বলিতেছি, তাঁহার কৃপায় ডুবিয়া আছি, তিনি কোলে লইতে চান, আমরাই দূরে যাইতেছি; আমার কি মঙ্গল, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে স্থির করিতে পারিতেছি না, তিনি নিয়ত মঙ্গল বিধান করিতেছেন, এরূপ ভাগ্যবানের পূজা-পদ্ধতি স্বতন্ত্র। তিনি যখন পুষ্প-চন্দন লইয়া পূজা করিতে বসেন, তিনি কি হয় না হয়, তাহার প্রতি দৃষ্টি করেন না। ফুলগুলি সুন্দর, আমার মা'র পাদপদ্মে দিব না? এই ভাবিয়া পূজা করিতে বসেন। সুন্দর সুমিষ্ট ফল, সুস্বাদু আহার্য্য, সেই সকল দ্রব্য তিনি স্বয়ং বড় ভালবাসেন, তিনি তাঁহার মাকে আনিয়া দেন। তাঁহার মনে নিশ্চিতই ধারণা, তিনি শুধু মন্ত্র উচ্চারণ করুন বা না করুন, মা তাঁহার ফল-মূলাদি গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি মা'র গুণানু-কীর্ত্তন করেন, কেননা, তাঁহার প্রাণ টলিয়া উঠে, না করিলে মহা অশান্তি জন্মে। তাঁহার নিকট অপরাধ নাই, পাপ নাই, তিনি অপার স্নেহময়ী মায়ের সন্তান। তিনি নিজেকে যত ভালবাসেন, তার শতগুণে মা তাঁহাকে ভালবাসেন। এ মা'র কেন দেখা পাইতেছি না বলিয়া কাঁদিয়া অস্থির হন।

এরূপ ভাগ্যবান্ ব্যক্তির অবস্থা অতি প্রার্থনীয়। গুরুর কৃপায় এই প্রার্থনীয় অবস্থায় যাঁহার দৃষ্টি পড়ে, এই প্রার্থনীয় অবস্থা যিনি চান, তাঁহার ও কঠোর পন্থা নয়। সেই অবস্থা পাইবার ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাই একমাত্র পন্থা। হয় তো তিনি ভাবেন, আমার মন অতি দুর্ব্বল, এরূপ প্রার্থনা করিতেও পারি না। এই দুর্ব্বলের নিমিত্ত কৃপাময় রামকৃষ্ণদেব কি সহজ উপায়ই করিয়াছেন! তোমার এই মনের দুর্বলতা অকপট হৃদয়ে ঈশ্বরের নিকট জানাও, যতটুকু পারো জানাও, তিনি বিন্দুকে সিন্ধু করিয়া তোমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। তুমি দুর্বল—তিনি জানেন, তুমি একবার শরণাগত হইলে তিনি শরণাগতকে পরিত্যাগ করিবেন না,—তিনি শরণাগত দীনের পরিত্রাণ-পরায়ণ। এই রামকৃষ্ণের মহাবাক্য. কেহ এরূপ দীন নয়, কেহ এরূপ সাংসারিক হীন অবস্থাগত নয় যে. দিনান্তে একবার এইরূপ তাঁহার মনের অবস্থা ঈশ্বরকে জানাইতে না পারে।

হয় তো শাস্ত্রাভিমানী বলিবেন, একবার প্রার্থনা করিলেই যদি হইত, তাহা হইলে কেহ কি প্রার্থনা করে না? করে কি না করে, তাহা আমরা বিচার করিতে বসি নাই, কিন্তু আমাদের কথা এই যে, যিনি রোগ, শোক, মৃত্যু-সঙ্কুল সংসারে আপনার অসহায় অবস্থা, আপনার হীনতা, আপনার দুর্বলতা কিছু মাত্র উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি এই মহাবাক্য তাঁহার জীবনের ধ্রুবতারা করিবেন সন্দেহ নাই, এবং সেই ধ্রুবতারার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সংসার-সমুদ্রে নির্ভয়ে তাঁহার জীবন-তরণী সঞ্চালন করিতে পারিবেন। সন্দেহের ঝটিকা উদয় হইলে, অন্ধকারে দিক নির্ণয় করিতে না পারিলে. সেই ধ্রুবতারার প্রতি লক্ষ্য করিলেই সেই ধ্রুবতারা দেখিতে পাইবেন; দেখিতে পাইবেন, সেই উজ্জ্বল তারকার অলক্ষিত প্রভাবে ভীষণ তরঙ্গ-মাঝে তাঁহার ক্ষুদ্রতরণীখানি অটুট রাখিয়াছে, দেখিতে দেখিতে ঝটিকা শান্ত হইয়া যাইবে, আবার নির্ব্বিঘ্নে চলিবেন। যদি কেহ আমাদের ন্যায় হীন, আমাদের ন্যায় দুর্বলচিত্ত থাকেন, তাঁহার চরণে আমার সবিনয় নিবেদন, একবার এই মহাবাক্য হৃদয়ে স্থান দেন, এই মহাবাক্যের প্রভাব দিন দিন উপলব্ধি করিবেন। নিরাশ হৃদয়ে আশা আসিয়া বসিবে। বলবান্ আশা—কোনরূপ সংসার-তাড়নায় তাহা টলিবে না। যাহা বলিতেছি, যদি না উপলব্ধি করিতাম, এরূপ দৃঢ়বাক্যে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইতাম। একবার সেই ধ্রুবতারার প্রতি যাঁহার দৃষ্টি পড়িবে, তিনিও ক্রমে এইরূপ দৃঢ়বাক্যে রামকৃষ্ণদেবের কথামৃতের অতুল প্রভাব প্রকাশ করিবেন ও হৃদয় উচ্ছ্বাসে "জয় রামকৃষ্ণ" বলিয়া করতালি দিবেন।

['উদ্বোধন' মাসিক পত্রে (১০ম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫ সাল) প্রথম প্রকাশিত।]

শান্তি

যিনি যত বড় নাস্তিকতা প্রকাশ করুন, যতই তর্ক করিয়া ঈশ্বর উড়াইয়া দেন—রোগ, শোক, বিপদ, মৃত্যুভয়-পরিপূর্ণ সংসারে তাঁহার একবার না একবার একটা ঈশ্বরের প্রয়োজন হয়। যখন কোন বলবান্ শক্রর তাড়নায় ব্যাকুল হন, তখন তাঁহার একটা শক্রদমনকারী ঈশ্বর থাকিলে ভাল হয়। নিজের বা স্ত্রীপুত্রের অথবা আত্মীয়ের অতি সঙ্কটাপন্ন পীড়ায় সময় বৈদ্য ঈশ্বর খোঁজেন। ঈশ্বর থাকিলে ভাল হইত, একথা অতি দুষ্কর্ম্মান্বিত নাস্তিককেও একবার না একবার বলিতে হয়। ঈশ্বর নাই অথবা যদি থাকেন, তাঁহাকে জানা যায় না, তিনি দুজ্ঞের্য়—এ সকল তর্ক-বিতর্ক বিদ্যাভিমানে দার্শনিক পুস্তক লিখিবার সময় বা দার্শনিক তর্ক-বিতর্ক সভায় একরকম চলে, কিন্তু সাংসারিক একটা কঠিন বাঁকে পড়িয়া, যে সকল কথা মুখে বা পুস্তকে তর্কপাতি রূপে শোভা পাইয়াছিল, সে সকল তাঁহার শান্তিহীন হৃদয়ে ততটা শোভা বিকাশ করে না, সে সময় তাঁহার ঈশ্বর-বিরোধী তর্কের তত জোর থাকে না। সংসার-পাকে ঘূর্ণায়মান হইয়া তাঁহার নিজের বুদ্ধিমত্তার তত প্রশংসা নিজে করেন না।

মহাকৌশলী পরপীড়ক একবার না একবার বুঝিতে পারে যে, তাহার কৌশল বিফল করিবার জন্য একটা শক্তি কার্য্য কারণপ্রবাহে চলিয়া আসিতেছে, যাহাতে তাহার অতি সুকৌশলও বিফল হয়। যিনি আপনাকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মনে করেন, যিনি ভাবেন,—চেষ্টার দ্বারা সকল কার্য্য সফল করিব এবং অনেক কার্য্যই সফল করিয়া আসিয়াছেন, তিনিও অনেকবার দেখিতে পান যে, তাঁহার চেষ্টার অতিরিক্ত অপর কোনও শক্তির দ্বারা তাঁহার অধিকাংশ কার্য্যই সুসম্পন্ন হইয়াছে। যদি কখনও গুরুতর বাধা প্রাপ্ত হন, তখন দেখেন যে, তাঁহার গণনানীত কোন বিঘ্নকারী শক্তি তাঁহার চিরসফল চেষ্টা বিফল করিয়া পূর্ব্বচেষ্টার্জ্জিত ফল সকলকেও বিনষ্ট করিয়াছে। ইষ্ট বা অনিষ্ট শক্তি নিয়তই সংসারে প্রবাহিত হইতেছে, ইহা যিনি দেখিতে না পান, তিনি সংসার-ক্ষেত্রে নিদ্রাবস্থায় চলিতেছেন। এ অদৃষ্ট শক্তি কোথা হইতে আসে, তাহা তিনি স্থির করিতে অসমর্থ; কিন্তু এ শক্তি রহিয়াছে, সর্ব্বত্র বিরাজমান, ইহা অস্বীকার করিবার তর্ক আজিও সৃষ্টি হয় নাই।

এই ইষ্টানিষ্ট শক্তির দ্বারা প্রতি জীবনই চালিত। এ শক্তি রোধ করিবার উপায় নাই। সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান না হইলে রোধ করা অসম্ভব;—এটা কি? যখন সে শক্তি অনিষ্টরূপে সম্মুখে উপস্থিত হয়, তখন বোধ হয়, যেন নর-অহিতকর কোন দানবীয় শক্তি, আবার যখন হিতকারী হইয়া সেই শক্তি উদয় হয়, তখন তাহা দেবশক্তি বলিয়া বোধ হইতে থাকে। প্রতি জীবনে এই দেব-দানবীয় দ্বন্দ্ব চলিতেছে। এই দেব-দানবীয় শক্তির প্রতি দৃষ্টি পড়িলে, আপনাকে অতি দুর্ব্বল বলিয়া প্রতীতি হয়। এই টানাটানিতে কোনরূপে নিস্তার নাই, নিশ্চিন্ত হওয়া অসম্ভব। চারিদিকে আঁটাআঁটি করিয়া অনেক সময় দেখা যায়, বস্ত্র আঁটুনিতে ফস্‌কা গেরো পড়িয়াছে।

তবে উপায় কি? চিরদিন কি চিন্তায় যাইবে? এই চিন্তার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অনেক প্রকার উপায় নির্ধারণের চেষ্টা হইয়াছে। এক মতে যখন উপায় নাই, আজ ত আমোদ করি, কাল যা হয় হইবে। এ কথা সুসময়ে সহজ। "হাঁ বাবা এই ঠিক!" সুসময়ে এই কথা বলিয়া অনেকেই দম্ভ করিবেন, কিন্তু একটু কুবাতাসে তাঁহাকেই চঞ্চল করিয়া তুলিবে। কেহ বলেন, "এ পাগলের মত, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া না চলিলে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী, ও কথাই নয়, বুদ্ধি আছে, বিদ্যা আছে, হিতাহিত জ্ঞান আছে, এমন করিয়া চলো, যাহাতে ভবিষ্যতে দুঃখ পাইতে না হয়।"—এও সুসময়ের কথা—তেমন ঝড়-ঝাপটা লাগে নাই, তেমন বুদ্ধি-বিদ্যা ওলট-পালট করে নাই, তেমন হিতাহিত জ্ঞান বিঘূর্ণিত হয় নাই। কি করিব, কি হইবে, এমন অবস্থা নয়। এ বিজ্ঞতা—এই সময়েই শোভনীয়। বিঘ্নকারী শক্তির সম্মুখে এ বিজ্ঞতা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। আর একটি পরকে উপদেশ দিবার মত ভাসা ভাসা মত এই, "আরে ভাই, ভেবে আর কি করিবে, সংসারে সুখ দুঃখের হাত কে এড়াইবে?" কিন্তু এই সকল উপদেশবাক্য যাহার উপর প্রয়োগ হয়, তিনি মুখ ফুটিয়া কিছু না বলুন, অন্তত মনে মনে করেন—ও সব কথা জানি বাবা! আমিও অনেক ঝেড়েছি, বহু চেষ্টায় অর্থ সংগ্রহ করিয়া ব্যাঙ্কে রাখিয়াছিলাম, ব্যাঙ্ক ফেল হইয়াছে। বহুযত্নে পুত্রটিকে মানুষ করিয়াছিলাম, যথেষ্ট দু'পয়সা রোজগারও করিতেছিল, ঘোড়ায় চড়িয়া কোন একটা তদারকে যাইতে যাইতে ঘোড়াটা হঠাৎ হোঁচট খাওয়ায়, সেই ছেলেটি পড়িয়া মরিয়াছে। আজীবন স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চলিয়া আসিতেছি, এখন বয়স হইয়াছে, একটা না একটা অসুখ ছাড়ে না, দিন দিন দুর্ব্বল হইতেছি, বোধহয় এবার সে পুরাতন পীড়া বল করিবে, কেহ দেখিবার লোক না থাকায় বিঘোরে মারা যাইব। তুমি তো বলিলে, "সংসারে সুখ-দুঃখের হাত এড়ান যায় না" তুমি তো বলিলে, "ভাবিয়া কি করিব, ভাবনাটা তাড়াইয়া দাও।" কত দিন না ভাবিয়া তোমার কাটিতেছে জানি না।

মানব-জীবনে এই শোচনীয় অবস্থা নিবারণের উপায় আর এক সম্প্রদায় করে। তাহাদের মীমাংসা নিতান্ত অযৌক্তিক। প্রমাণ নাই, কিছু নাই, একটা ঈশ্বর ধরিতে বলে। ওটা দুর্ব্বলতা মাত্র, আর কিছু নয়। ওটা বালকের শান্তিপ্রদ বা বয়োজনিত নিস্তেজ-মস্তিষ্ক মৃত্যুভয়াকুল বৃদ্ধের তৃপ্তি। আমিও যে কখন কখন অমন একটা কথা বলিয়াছি, তাহা দুঃখসময়জনিত দুর্ব্বলতা হেতু, বিচার-শক্তিসম্পন্ন জ্ঞানবান মনুষ্য এরূপ যুক্তিশূন্য কথার উপর নির্ভর করিয়া কদাচ নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। কি বলাই —বাতুল কি বলে! "মশায়, এ দুঃখ-সাগরে কি ঈশ্বর ব্যতীত উপায় আছে?" বটে? বাপু, তোমার ঈশ্বরটা কে? কোথায়? দেখাতে পারো—সে কিরূপ?

হয়ত ত এই হীনবুদ্ধি সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন উত্তর করে—"মহাশয়, ঈশ্বর কিরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছেন? কিরূপ ঈশ্বর হইলে আপনার সুবিধা হয় বলুন?" বিজ্ঞ উত্তর করেন—"বাপুহে, বাঁচালে, বলো নি যে, তিনি মঙ্গলময়, নির্ব্বিকার,

নিরাকার, শুদ্ধাত্মা, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান্; কিম্বা একটা নুড়ি দেখাইয়া—যাহা অনায়াসে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া যায়—ঐ সকল কথা যে বলো নাই, এ আমার ভাগ্য। যাও বাপু, তোমার অযৌক্তিক ঈশ্বর লইয়া তুমি ঘর করো, ওরূপ বাতুলতা আমার চলিবে না।"

বাতুলতা হইলে হইতে পারে, কিন্তু কথাটা বড় মধুর, কবি-কল্পনা ইহা ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। কল্পনার সীমার কথা। যেরূপ ঈশ্বর আমার সুবিধা হয়, ঈশ্বর সেইরূপই, মজার কথা বটে! এক কথা বিশ্বাস করিতে পারিলে, একটা বাতুলের তৃপ্তিলাভ করা যায়। তর্কবিতর্ক শেষ হইল, বাতুল বলিয়া অগ্রাহ্য করিলাম। নির্জ্জনে ঘরে বসিয়া আছি, এই বাতুলের কথাটি মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিতে পারি নাই। কথাটি বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস হইবার ত কথা নয়। বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করিয়া থাকেন সত্য যে, অজ্ঞানিত, অজ্ঞেয় একটা কিছু থাকিলে থাকিতে পারে। কিন্তু যেরূপ ঈশ্বর হইলে, আমার সুবিধা হয়, যেরূপ মনোহর, হৃদয়তৃপ্তিকর ঈশ্বর হইলে আমার সকল জ্বালা নিবৃত্তি হয়, এমন যদি কেহ থাকে, তাহাকে পূজা করি। পূজা করি কি, সে পূজা টানিয়া লয়। এমন সখা ঈশ্বর পাইলে, আর চিন্তার কারণ কি? কথাটা মিথ্যা, কিন্তু চিন্তায়ও সুখ আছে। বোধ হয়, সংসার-তাড়নায় ব্যাকুল হইয়া এইরূপ একটা শান্তিপ্রদ ভাব আনিয়াছে।

ভাল, যদি আমার মনের মত ঈশ্বর হয়, সে কি করে? কেন, যাহাতে আমার দুঃখ হয়, তাহা নিকটে আসিতে দেয় না। আচ্ছা, কি আসিতে দেয় না? কিসে কিসে দুঃখ পাইয়াছি? কেন, দুঃখের কারণ সবই পড়িয়া রহিয়াছে। কোন্‌টা দুঃখের কারণ নয়? তবে যদি এমন হয়, আমি অমর হই, আমার ধন-জনের অভাব না থাকে, আত্মীয় পরিবার সকলে থাকে, আমি যাহা মনে করি, তাহাই করিতে পারি, আমার সকল সাধ পূর্ণ হয়,—কি মূর্খতা, এ কথা লইয়াও আন্দোলন করিতেছি!

আবার আহাম্মকেরা বলে, "ঈশ্বর-লাভ—পরম লাভ; ইহা অপেক্ষা লাভ নাই।" ভাল, লাভটা কি, তাহা বুঝিলাম না। ঈশ্বর পাইলাম, তাহাতে কি হইল? এখানটা একরকম যুক্তি করে মন্দ নয়! বলে, অনিত্য বস্তু চান, অনিত্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করেন, ইহাতে দুঃখ ব্যতীত আর কি হইতে পারে? আচ্ছা বাবা, যে সমস্ত অনিত্য জিনিষ চাই, তুমি ত ঈশ্বর, সে সকল নিত্য করে দাও না? মূর্খেরা বলে কি জানো? "তিনি ধন, তিনি জন, তিনি পুত্র, তিনি কলত্র, তিনি জীবন, তিনি শান্তি—সর্ব্বস্ব তিনি।" হোক বাবা, যা হবার হোক, বড় যন্ত্রণা! চতুর্দ্দিকে তাড়না, এবার ওলাউঠা-মারীভয় বড্ড, সদাই মন ধুক্‌পুক্ কচ্ছে। এ সময়ে 'ভয় কি বল্‌নেওয়ালা' থাকে, তবে তো বুঝি! বলে, 'তাইতো আছে।' ওরে নির্ব্বোধ, বল্‌ছিস্—ঈশ্বর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা, একবার রাত্রে ছাদে উঠে দেখেছিস্ কি? ঐ যে অগণ্য তারা দেখ্‌তে পাচ্ছিস, ও এক একটা পৃথিবী, এক একটা সূর্য্য। যে পৃথিবীতে বাস করিস, ও পৃথিবীর তুলনায় একটি বালিকণা! যে সূর্য্য দেখিস্, ও সূর্য্য তা অপেক্ষা সহস্রগুণে বৃহৎ ও প্রভাময়—

এই অনন্ত ব্যাপার! যদি ঈশ্বর বলিস্—এই সকলের ঈশ্বর। সে তোর কথায় তোর মনের মত হ'য়ে আস্‌বে? ঝুট্, পাগ্‌লা-গারদে যা!

কিন্তু কথার একটা ভাব আছে। যদি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, আমার কথায় আমার মনের মত হইয়া আইসে, সে একটা কি হয়! অনন্ত দয়া! বাবা, একট বড়মানুষ—আমি কাকুতিমিনতি ক'র্‌লেও ফিরে চায় না, কিন্তু ঈশ্বর আসে, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা আসে, আমার মনের মত হ'য়ে আসে, আমার মন যোগাবার জন্ত আসে!

পাগ্‌লামো ক'র্‌তে ক'র্‌তে একটা অনন্তের ভাব এনে ফেলেছে বটে! ভাব্‌তে ভাব্‌তে একরকম হ'য়ে যেতে হয়। এই যে কতকটা দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছে! ওঃ একটা জবর ভাব এনে ফেলেছে বটে! বলে, আমা'র মত মানুষ হয়, আমার কা'ছে আসে। তার আস্‌বার গরজ কি? না, আমি সুখী হব, আমি অনন্তকাল সুখে থাক্‌বো। ঈশ্বর থাকে আর এমনটা ঠিক হয়, তাহা হইলে আর দুঃখ থাকে না। তবে কি একটা মিছা ভ্রান্তি নিয়ে থাক্‌বো বল, এ তো নয়! তবে বিশ্বাস ক'র্‌তে পার্‌লে একটা সুখ বটে। ভাল, সুখই তো খুঁজি, টাকা, স্ত্রী-পুত্র, যশ, মান—এ সব খুঁজেছি কেন, সুখের জন্ত নয়? একে তো পাওয়াই কষ্ট, আবার পেয়ে সুখী নয়, কি জানি কখন এ সব যায়! কিন্তু এ বিশ্বাসে সুখ, এ বিশ্বাস রাখ্‌তে পার্‌লে সুখ, এ বিশ্বাস কেন আমার হৃদয়ে স্থির হ'য়ে বসুক না! তাহা হইলেই তো যাহা খুঁজি, তাহা পাইয়াছি! তবে আয়—বিশ্বাস আয়! আমার হৃদয়ে দৃঢ় হ'য়ে ব'স! আমি সকল যন্ত্রণায় পরিত্রাণ পাই। আমি আজীবন সুখের অনুসন্ধান ক'রেছি, শত যন্ত্রণায় দগ্ধ হ'য়েছি, বিশ্বাস! তোমায় ধ'র্‌তে পারি নাই—তাই যন্ত্রণা! এসো শান্তিময়, আমার হৃদয়ে ব'সো।

['উদ্বোধন' মাসিক পত্রিকায় (১০ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৫ সাল) প্রথম প্রকাশিত]

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম

মহৎব্যক্তির আদেশ পালন অতি কর্তব্য—নচেৎ আমি বৈষ্ণবের দাসানুদাসের উপযুক্ত নই, পূর্ণব্রহ্ম মহাপ্রভু চৈতন্তদেবের প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের আলোচনা করিতে অগ্রসর হইতাম না। বৈষ্ণবগণের চরণে শতকোটি নমস্কার পূর্ব্বক মার্জ্জনা প্রার্থনা করি।

বৈদিক সাধন অতি কঠোর, এই নিমিত্ত তন্ত্র কলিতে বিধি দিয়াছে, "জপাৎ সিদ্ধিঃ।" কিন্তু কলির দুর্দ্দম শাসনে ক্রমে দুর্ব্বলতর জীবের পক্ষে তাহাও কঠিন।

মহাপ্রভু দেখিলেন, কলির জীব জপ করিতে অক্ষম। দয়াল প্রভু এই নিমিত্ত অতি গূঢ়তর তত্ত্ব জীবের হিতার্থে প্রচার করিলেন,—নামই সর্ব্বস্ব, নামই ব্রহ্ম, নাম ও ব্রহ্ম অভেদ জ্ঞান করো, ভবসাগর গোষ্পদের ন্যায় পার হও। কিন্তু চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত নামে রুচি জন্মে না। চিত্তশুদ্ধির বহুবিধ উপায় শাস্ত্রে নিরূপিত আছে, কিন্তু কলির জীব সে সকল পন্থা অবলম্বনে অপটু। পতিতপাবন গৌরাঙ্গ বলিলেন, "জীবে দয়া রাখো, কোটি কোটি কঠোর তপস্যার ফল প্রাপ্ত হইয়া চিত্তশুদ্ধি লাভ করিবে, নাম ব্রহ্ম অভেদ বুঝিবে,—মানবজন্ম সার্থক হইবে।"

"মানব-জন্ম সার্থক হইবে"—এ কথা শুনা যায়, কিন্তু মানব-জন্মের সার্থকতা কি? শুনিতে পাই, মানবজন্মের সার্থকতা মুক্তিলাভ, কিন্তু যাহা মুক্তি বলিয়া বর্ণিত হয়, তাহা শুনিয়া আমার ন্যায় দুর্ব্বল হৃদয় কম্পিত হইতে থাকে। জলবিম্ব জলে মিশাইয়া যাইবে—অস্তিত্ব থাকিবে না, মোহজড়িত হৃদয় এ কথা শুনিয়া ভয়ে অভিভূত হয়! এই তো মৃত্যু! আমার অস্তিত্ব থাকিবে না, এ কি কথা? শত শত বার জন্মগ্রহণ করি, শত তাপে তাপিত হই, তথাপি অস্তিত্ব থাকুক! অস্তিত্ব লোপ যদি মানব-জীবনের সার্থকতা হয়, তবে এ সার্থকতা আমার প্রয়োজন নাই। তেজীয়ান্ মহাপুরুষেরা এ সার্থকতার প্রয়াসী, কিন্তু মৎসদৃশ ক্ষুদ্রপ্রাণ জীবের পক্ষে এই সার্থকতা লাভ মৃত্যু অপেক্ষা ভয়ানক বোধ হয়।

তেজীয়ানের উপায় আছে, আমাদের উপায় কি? গৌরাঙ্গদেব অবতীর্ণ হইলেন। পতিত, তাপিত, মায়ামোহবিজড়িত ক্ষুদ্র জীবকে শ্রীচরণে স্থান দিবার নিমিত্ত গৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব। তিনি স্বয়ং "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" করিয়া ভূমিতলে লুণ্ঠিত হইতেন। জীব দেখিত, বিস্মিত হইয়া ভাবিত—স্বর্ণকান্তি গৌরাঙ্গ ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছেন কেন? ইনি বেদজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, তবে মন্ত্র-তন্ত্র ছাড়িয়া হরিবোল দিয়া নৃত্য করেন কেন? "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" বলিয়া শতধারা ইঁহার বক্ষ বহিয়া যায় কেন? দেখিতে লাগিল, ভাবিতে লাগিল, ধীরে ধীরে ভাবের ধারা হৃদয়ে বহিল। সেই পবিত্র ধারা মোহপ্রস্তরবেষ্টিত ছিল, গৌরাঙ্গদেবের গভীর হরি-ধ্বনিতে সেই প্রস্তর-প্রাচীর ভাঙ্গিল। ভাব-তরঙ্গে ভাসিয়া জীব বৃন্দাবনের ভাব-সাগরে উপস্থিত হইল; ভাব-রাজ্যে দেখিল—হৃদয়-আকৃষ্টকারী কৃষ্ণকায় বালক যশোদা গোয়ালিনীর কোলে স্তনপান করিতেছে; দেখিল—অলঙ্কারভূষিত চূড়াবাঁধা জানু পাতিয়া গোয়ালিনীর নিকট নবনীপ্রার্থী; দেখিল—নন্দ ঘোষের বাধা মাথায় লইয়াছে; দেখিল—পাঁচনী-হস্তে গোপবালকের সহিত গোচারণ করিতেছে; দেখিল—কিশোর কৃষ্ণকায় কাঞ্চনকান্তি কিশোরীর সহিত প্রেমের আদান-প্রদান করিতেছে—গোপীগণ মুগ্ধচিত্তে সেই আদান-প্রদান উপভোগ করিতেছে; দেখিল—মায়িক সংসারের ন্যায় সকলই, কিন্তু মায়িক জড়তা নাই, সমস্ত প্রেমে গঠিত! প্রেমাগঠিত যশোদা, প্রেমগঠিত নন্দ, প্রেমগঠিত গোপবালক, প্রেমের পুত্তলী কিশোরী, প্রেমের গোপীগণ প্রেমধার কিশোর লইয়া প্রেম-লীলায় মুগ্ধ আছে।

জীব বুঝিতে পারে না, এ কি সাধন! ভাবে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত, কিন্তু কই—এ ত সাধন নয়! সাধনের কঠোরতা কোথায়? সকলই মাধুর্য্যপূর্ণ, ইহা আবার সাধন

কি? পাষাণ-হৃদয়ও দ্রবীভূত হইয়াছে—ভাবে, এ কি মধুময় ভাব-সাগর! কই, কোথায় ত এরূপ ভাবের বিচিত্র তরঙ্গ নাই! ভাব হৃদয়ের অন্তঃস্থল স্পর্শ করিতেছে, নাস্তিক আস্তিক উভয়েই মুগ্ধ। নাস্তিক ও আস্তিক উভয়েই মুক্তকণ্ঠে বলিতেছে—এ কি অপূর্ব্ব কবিত্বরসের প্রস্রবণ! ভূমণ্ডলের অন্য কোন দেশ কোন' উপখ্যানে এরূপ বিভিন্ন ভাব-প্রবাহ ও বিচিত্র রসতরঙ্গিণী একত্রে প্রবাহিত হইতে দেখা যায় না। এ রসে যাহার অন্তঃকরণ দ্রবীভূত না হয়, তাহার অন্তঃকরণ পাষাণ অপেক্ষা কঠিন পদার্থে বিনির্ম্মিত, তাহায় আর সন্দেহ নাই। এ কি অনন্ত ভাবপ্রবাহ! অষ্টাদশ পুরাণে বর্ণিত হইয়া শেষ হয় না; বরং আরও উথলিয়া উঠিতে থাকে! কথকতা, কীর্ত্তন পুনঃ পুনঃ শুনিয়াও তৃপ্তিলাভ হয় না, রস-তৃষা দ্বিগুণ বাড়িতে থাকে। কানু ছাড়া মধুর গীতই হয় না! এ মাধুর্য্য-প্রবাহ কে সৃষ্টি করিল? যদি এ বিমল আনন্দ অবিচ্ছিন্নরূপে হৃদয়ে প্রবাহিত হইতে থাকে, যদি এ বিমল আনন্দ লাভ হয়, তাহা হইলে মানব-জীবনের সার্থকতা বটে, এ সার্থকতা লাভে অতি ক্ষুদ্র হৃদয়ও প্রয়াসী। যদি ইহার নাম মুক্তি হয়, ইহাতে তো ভয়ের ছায়ামাত্র নাই, কেবল আনন্দ।

গৌরাঙ্গ বলেন,—"হরি বলো, এই রসের অধিকারী হও। রসের উপরিভাগে ভাসিয়া তোমার হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ। এসো, আমার সহিত এ রস-সাগরে ডুব দিবার চেষ্টা করো। একবার নিজ অন্তঃকরণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করো, দেখো—বিষদংষ্ট্র কামক্রোধাদি রিপুচয় মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় অবনতশিরে ম্রিয়মাণ!—রস-তরঙ্গে পাপপুণ্য দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। আমার সহিত অনন্ত রসসাগরে ডুব দেবার চেষ্টা করো।" দেখিতেছ না, স্বয়ং ঈশ্বর এই রসের প্রার্থী; সে রস—স্বর্ণকান্তি কিশোরী বৃন্দাবনে উপভোগ করিয়াছিলেন, সেই রসাস্বাদনলুব্ধ হইয়া স্বয়ং ঈশ্বর ধরণীতলে অবতীর্ণ হইয়া ধরায় বিলুণ্ঠিত! বুঝিতে পারিতেছ না, নাই পারো, অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছ, তোমার আর মৃত্যু নাই। রসাস্বাদনের তৃপ্তির সহিত আস্বাদন-আকাঙ্ক্ষা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে থাকিবে! অনন্তকালে এ রসের অন্ত নাই, অনন্তরস অনন্তকাল আস্বাদ করো।

আহা, তুমি কেন দীনভাবে দূরে দণ্ডায়মান? চণ্ডাল? তুমি মহাপাতকী?—তাতে দোষ কি, এসো, এ কিশোরীর রসাস্বাদনে তোমার মানা নাই। আহা, তুমি ব্যাভিচারিণী, তাই কি তুমি কুণ্ঠিতা? এ বৈকুণ্ঠের রসপানে কুণ্ঠিতা হইও না, রসময়ী কিশোরী এ রসদাত্রী, তোমার নিমিত্ত তিনি কাতরা, তোমায় তিনি তাঁর সঙ্গিনী করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, তোমায় সঙ্গে না লইয়া তিনি গোলকে যাইবেন না, অকুণ্ঠহৃদয়ে বৈকুণ্ঠের রস-সাগরে ঝম্পপ্রদান করো! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গৌরাঙ্গদেব করতালি দিয়া নৃত্য করিতে করিতে হরিধ্বনি করিয়া জীবকে ডাকিতেছেন, "এসো এসো, চিরানন্দ উপভোগ করো। এ আনন্দ-রস আস্বাদনে কাহারও বাধা নাই। এক বাধা সন্দেহ। যদি কোটি জন্ম মহাপাপ করিয়া থাকো, তথাপি তোমার শঙ্কা নাই; দেখিতেছ না, আমি তোমায় কোল দিবার নিমিত্ত বাহু প্রসারণ করিয়া রহিয়াছি।

যদি কুটিল তর্কযুক্তি তোমায় আসিতে বাধা দেয়, তুমি বৃন্দাবন ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করো, সেই ভাবতরঙ্গে জটিল তর্কযুক্তি ভাসিয়া যাইবে।"

গৌরাঙ্গ পাপী-তাপীকে এইরূপ আশ্বাস দিয়াছেন। নিত্যানন্দ সংসারী সাজিয়া সংসারীর সহিত মিশিয়া জীবের ভববন্ধন-ছেদনার্থে জীবের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিয়াছেন, মোহান্তগণ জীবের, দুঃখে ব্যথিত হইয়া গ্রন্থ রচনা, গীত-রচনা প্রভৃতি নানা উপায় অবলম্বন-পূর্ব্বক জীবের উদ্ধার-সাধনের নিমিত্ত গৌরাঙ্গের সাঙ্গোপাঙ্গের অবতীর্ণ হইবার সার্থকতা প্রকাশ করিয়াছেন! এখনও প্রকৃত বৈষ্ণব জীবের দুঃখমোচনার্থ দীনবেশে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করেন।

আমি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্ম যাহা জানি, তাহা যথাসাধ্য বর্ণনা করিলাম। গৌরাঙ্গ-ধর্ম্মের উচ্চ মাহাত্ম্য এই যে, জগতে এমন কেহই হীন নাই, যে হরিনামের অধিকারী নয়; এমন কেহ অবকাশশূন্য নয়, যে একবার হরিনাম করিতে না পারে; এমন কেহ সংসার-জালে জড়িত নয়, মধুর গৌরাঙ্গ-লীলা শ্রবণে যাহার হৃদয়গ্রন্থি ছেদ না হয়; বিশ্বাসী হোক বা অবিশ্বাসী হোক, এমন কঠিন কঠোর হৃদয় কাহারও নয়, যে হৃদয় লীলারসামৃতে দ্রবীভূত হয় না এবং একবার সেই কঠোর হৃদয় কোমল হইলে বিশ্বাস বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, ভক্তি-কমল প্রস্ফুটিত করে।

সামান্য জীবের ত এই অমরত্বলাভ হয়। এ ধর্ম্ম কি সামান্য জীবেরই জন্য? উচ্চহৃদয় উচ্চাশয় ব্যক্তিদিগের জন্য কি ধর্ম্ম নয়? হ্যাঁ, তাঁহাদেরও জন্য গৌরাঙ্গের এই প্রেমধর্ম্ম; মানব-হৃদয় যতদূর উচ্চ হইতে পারে, ততদূর উচ্চ হইয়াও এ রসের কেবল বিন্দুমাত্র আস্বাদনে সক্ষম। যে রস-আস্বাদনের পিপাসায় স্বয়ং ভগবান্ নরদেহ ধারী, যে ভাবে ভগবান ঘন ঘন ভাববিভোর, চৈতন্যশূন্য, আত্মহারা, তোমার হৃদয়ে কত স্থান, তুমি কত ভাবগ্রাহী যে, এ ভাবের বিন্দুমাত্র আস্বাদনে তোমার তৃপ্তিসাধন হইবে না? তবে এ ভাব কি? কে বলিবে?—

"না পিয়ে না বুঝি সুরা পিয়ে জ্ঞান যায়।"

যে বিন্দুমাত্র পান করিয়াছে, সে আত্মহারা। তার দেহভাব নাই, জিহ্বা নাই, উচ্চারণ-শক্তি নাই, বাক্যহারা হারাইয়াছে,—কিরূপে বলিবে! সে রসে আপ্লুত, রসময় হইয়া গিয়াছে; তার ত আর নরত্ব নাই যে, নরকে সমাচার প্রদান করিবে! তবে চৈতন্যচরিতামৃতে পড়িয়াছি, তাই বলিতেছি, কিশোরীর আনন্দ আস্বাদনের নিমিত্ত অন্তঃকৃষ্ণ বহিঃরাধারূপে ভগবান লীলা করিয়াছেন। ইহার তত্ত্ব কি, তা ত জানি না।

ভাবুক ভাবে বিভোর হইয়া ভাব-চক্ষে দেখুন—বৃন্দাবনের যশোদাদুলালের মৃত্তিকা ভক্ষণ, নবনী হরণ, মদনমুগ্ধকারী রাসলীলা—নবদ্বীপের শচীনন্দন লীলায় তন্ন তন্ন করিয়া প্রত্যক্ষ করুন। বেদান্ত যাঁর তৃপ্তিকর, গৌরাঙ্গপ্রকটিত "অচিন্ত্য, ভেদাভেদ-বাদ" দার্শনিক যুক্তি দ্বারা আন্দোলন করিয়া আনন্দ উপভোগ করুন। শান্ত, দাস্য

প্রভৃতি যাহার যে রসে তৃপ্তি, গৌরাঙ্গ-লীলায় তাহার পরিপুষ্ট বিকাশ দেখুন। গৌরাঙ্গলীলার উপমাস্থল—গৌরাঙ্গলীলা। গৃহী, সন্ন্যাসী, পাপী, পুণ্যবান্—সকলের নিমিত্ত গৌরাঙ্গের আবির্ভাব।

বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অতি প্রাচীন ধর্ম্ম, গৌরাঙ্গদেবের বহু পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। তাহার সম্পূর্ণ বর্ণনা একটি স্থূলকায় পুস্তকেও হয় না। এ প্রবন্ধেও নিষ্প্রয়োজন। তবে সর্ব্বপ্রধান যে চারি সম্প্রদায় এক্ষণে বর্ত্তমান আছে, যথা—রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মধ্বাচার্য্য ও বল্লভাচার্য্য, এই চারি সম্প্রদায়ই বিষ্ণুভক্ত, কিন্তু এই সকল সম্প্রদায় বা ইঁহাদের শাখা-প্রশাখা কোন সম্প্রদায়ই আচণ্ডালে আলিঙ্গনদানে প্রবৃত্ত নন। মায়াবাদ খণ্ডন ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রভৃতি নানাপ্রকার আলোচনা এ সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায়, কিন্তু কেবল গৌরভক্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবই বলেন, "এসো দীন হীন পাপী তাপী যে যেখানে আছ, এসো এসো—দয়াল নিতাই ব্যাকুল হইয়া তোমাদের নাম দিবার জন্য ডাকিতেছেন। শুনিতেছ না, নিতাই মধুরস্বরে গাহিতেছেন,—

'ধর, নাও সে কিশোরীর প্রেম,
নিতাই ডাকে আয়।
প্রেম কলসে কলসে ঢালে তবু না ফুরায়॥'

পতিত শোন—বৈষ্ণবেরা উচ্চনাদে বলিতেছেন,

"যারা মার খেয়ে প্রেম বিলায়,
তারা তারা দু'ভাই এসেছে রে।"

তবে আর ভয় কি? ভবসাগর ত গোষ্পদ! বিশ্বাস করো, বৈষ্ণবের বাক্য মিথ্যা নয়! বৈষ্ণব—বৈষ্ণব কি? বৈষ্ণব কি—বর্ণনা করিতে হইলে যেমন রাধাপ্রেম আস্বাদনের নিমিত্ত ভগবান্‌কে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল, বৈষ্ণব কি—বর্ণনা করিতে হইলে আবার তাঁহার দেহধারণের প্রয়োজন। বৈষ্ণব কি—বৈষ্ণবই জানেন। একটি দৃষ্টান্ত দিই, কালনার ভগবান্‌দাস বাবাজী মদনমোহন দর্শনে আসিয়াছিলেন। একজন বেশ্যা তাঁহাকে প্রণাম করে, তাহাতে বাবাজী গদগদ ভাবে সেই বেশ্যাকে প্রণাম করিলেন। এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবাজী, এ বেশ্যাকে প্রণাম করিলেন কেন?" বাবাজী, উত্তর করিলেন, "এ রমণী পরম ভাগ্যবতী, আমি ত বৈষ্ণবের দাসানুদাসের যোগ্য নই, কিন্তু আমাকে বৈষ্ণব জ্ঞানে প্রণাম করিয়াছে। যে বৈষ্ণবকে প্রণাম করে, সে আমার প্রণম্য।" এ বৈষ্ণব-তত্ত্ব আমি কি বুঝিব!

শুনিয়াছি, কায়মনোবাক্যে সাধন করিতে হয়, কায়মনে আমি অক্ষম, তবে বাক্যে বলি—জয় বৈষ্ণবের জয়! জয় বৈষ্ণবের জয়, যে বৈষ্ণব—গৌর-নিতাই কে—বলিয়া দেন। জয় বৈষ্ণবের জয়, যে বৈষ্ণব দ্বারে দ্বারে বলেন—"হরের্নাম হরের্নামৈব

কেবলং, কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।" জয় বৈষ্ণবের জয়, যে বৈষ্ণব বাহু তুলিয়া নাচিতে নাচিতে বলেন, 'ভাই, হরি বল!"

[১৯০৯ খৃষ্টাব্দ, এপ্রিল মাসে মহারাজা দ্বারভাঙ্গার সভাপতিত্বে কলিকাতা টাউনহলে 'ধর্ম্মসমন্বয়ের' এক বিরাট সভা হয়। ভারতের নানাস্থান হইতে নানা ধর্ম্মাবলম্বীসম্প্রদায়ের নেতারা আসিয়া বক্তৃতা করেন। এই প্রবন্ধটী গিরিশচন্দ্র কর্তৃক লিখিত হইয়া উক্ত মহাসভায় শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন কর্তৃক পঠিত হইয়াছিল।]

বিশ্বাস

যত প্রকার অকর্ম্মণ্য ব্যক্তি পৃথিবীতে আছে, সাধারণের চক্ষে বিশ্বাসী ব্যক্তির তুল্য অকর্ম্মণ্য আর কেহই নয়। অশিক্ষিত স্ত্রীলোক ও বালকের ন্যায় তাহার তুলনা হয় না, হীনবুদ্ধি বলিয়া সে গণ্য। বিশ্বাসকে লোকে দুর্ব্বলতা বলিয়া জানে। কিন্তু বিশ্বাসী ব্যক্তি যতদূর অসঙ্গত বিষয় বিশ্বাস করুক, তাহারা তাহাদের নিন্দুকের ন্যায় অসঙ্গত বিষয় বিশ্বাস করে না। মনুষ্যের দুইটী মাত্র চক্ষু আছে, পশ্চাতে সর্প আসিয়া দংশন করিলে জানিতে পারে না; একটু বুদ্ধি আছে, যাহাতে ৫ আর ৪এ ৯ বুঝিতে পারেন। সেই বুদ্ধি আর চক্ষুর বলে তাঁহার বিশ্বাস যে, জগতের সমস্ত বস্তু তিনি অবগত হইবেন। অন্ধ বিশ্বাস বলিয়া কথা নাই, কথাটার অর্থ নাই; যদি থাকে, তাহা হইলে সে অন্ধ বিশ্বাস আত্মম্ভরী বুদ্ধিমান ব্যক্তির,—অতদূর অন্ধবিশ্বাস আর কাহারও নাই। আপনাকে সারবান জানিয়া, তাঁহার সেই অন্ধ বিশ্বাসের অনুমোদন যে না করেন, তাহাকেই তিনি অসার বলিয়া জ্ঞান করেন। মহাপুরুষের বাক্য হৃদয়ের সরল ভাষা, অভিমানশূন্য ধীর বুদ্ধি—তিনি তাচ্ছিল্য করেন। মানব-জীবনে বিশ্বাস অপেক্ষা বলপ্রদ বৃত্তি আর নাই। তাহা তাঁহার বোধগম্য হয় না; জগতে যত মহৎ কার্য্য হইয়াছে, সমস্তই বিশ্বাস-বলে। অবিশ্বাসী গণনায় জয়লাভের কোনও আশা ছিল না। সমস্ত ইউরোপীয় রাজা বিরূপ, কোটি কোটি বিপক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে নেপোলিয়নের লক্ষ সৈন্য মাত্র। গণনায় জয়লাভের কোনও আশা ছিল না, বিশ্বাস বলে জয়লাভ হইল। তিনি অদৃষ্টবাদী, অদৃষ্টে বিশ্বাস করিয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

ইতিহাসে ভূয়োভূয়ঃ বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বাস-বল শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে নহে, যত প্রকার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার জগতে হইয়াছে, বিশ্বাস তাহার মূল, শক্তির ভাব বর্দ্ধন (Conservation of Energy) যাহার তুল্য আবিষ্কার আর ইদানিং হয় নাই, ইহা বিশ্বাসমূলক। যিনি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, শক্তির কখনও ক্ষয় হইতে পারে না। এই বিশ্বাসমূলক আবিষ্কারবলে

মানব কর্ত্তৃক নায়েগ্রার জলপ্রপাত সংসার-কার্য্যে দাসরূপে নিযুক্ত হইয়াছে। যত প্রকার উচ্চকার্য্য সংসারে হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে—সমস্তই বিশ্বাস-বলে। কিন্তু তর্কের নিমিত্ত ধরিয়া লইতেছি, বিশ্বাস অতি দুর্ব্বলতা, হীনতা। আত্মম্ভরী বুদ্ধিমান যতপ্রকার বিশ্বাস-বিরুদ্ধ নাম দিতে চাহেন, সে সকলই বিশ্বাস-বিরুদ্ধে আখ্যা করিলাম। কিন্তু মানব-জীবনে চাই কি? মহা তিতিক্ষাপ্রিয়, মহাকার্য্যকৌশলী, কান্তারপ্রিয়, বিপদাকাঙ্ক্ষী—যত প্রকার লোক সংসারে থাকুন, এ কথা তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, তিনি নিজ সুখ অন্বেষণ করিতেছেন। বিলাসীর বিলাসে সুখ এবং তাঁহার তিতিক্ষায় সুখ—এই মাত্র প্রভেদ। কিন্তু তিনি যে সুখ-আশায় মুগ্ধ আছেন, এ পক্ষে সন্দেহ নাই। যিনি ইহা অস্বীকার করেন, হয় তিনি কপটী নচেৎ তিনি তাঁহার নিজের হৃদয় বুঝেন না। তাঁহার সুখ এবং বিশ্বাসসুখ একবার তুলনা করিয়া দেখুন। বিশ্বাসী মনে করেন,—"তাঁহার অনন্ত জীবন, এই অনন্ত জীবনে সর্ব্বশক্তিমান তাঁহার অনন্ত সহায়। সংসারে ক্ষণিক দুঃখ হয়, কিন্তু সে দুঃখ তাঁহার মঙ্গলের নিমিত্ত।" মানব শরীরে তিনি দেব-দেহধারী। তাঁহার আনন্দের সহিত হে বিজ্ঞ! তোমার আনন্দ একবার তুলনা কর। হে গণনাবিদ্, তোমার গণনায় তুমি জান না, তুমি কি ছিলে? তোমার গণনায় তুমি জান না, তুমি পরে কি হইবে? বর্ত্তমানে, যদি তুমি যথার্থ গণিত-শাস্ত্র প্রিয় হও—বর্ত্তমানে পরমুহূর্ত্তে কি হইবে,—তাহা তোমার গণিতশাস্ত্র স্থির করিয়া দিতে পারিবে না। জ্যোতির্ব্বিদ হইলেও তাহারও মূলে বিশ্বাস। কিন্তু তর্কের নিমিত্ত ধরিয়া লইলাম শাস্ত্র বিশ্বাসমূলক নয়—যুক্তিমূলক। জ্যোতির্ব্বিদ হইলেও ধর,—গণনায় দেখিয়াছ যে, কল্য উত্তম যান চড়িবে, কিন্তু ট্রামওয়ে হইতে পড়িয়া পা ভাঙ্গিয়া কোন দয়ার্দ্র ব্যক্তির জুড়ি চড়িয়া ঘরে আসিবে, কি তোমার স্বকৃত উত্তম যান হইবে, তাহার নিশ্চয়তা নাই। সচরাচর লোকে জ্যোতিষ-গণনা সম্বন্ধে বলিয়া থাকে,—"লাভের বেলা ব্যাং, লোকসানের বেলা ঠ্যাং।" যত প্রকার শাস্ত্র আবিষ্কার করিয়া থাক, বর্ত্তমানের পরমুহূর্ত্তের মঙ্গলামঙ্গল স্থির করিতে পার না। কিন্তু বিশ্বাসী (অন্ধ বিশ্বাস বলিয়া গালি দেন) কিন্তু বিশ্বাসী নিশ্চিত করিয়াছে,—আগে কি ছিল, পরে কি হইবে। বর্ত্তমান অমঙ্গল—সে অমঙ্গল বলিয়াই গণনা করে না। অমঙ্গল-দোষ সংশোধন করিবার নিমিত্ত, প্রেমময় পিতা তাহাকে তাড়না করিতেছেন। এই আমীরের সহিত সংসারের কি সম্পত্তি লইয়া, কি মান লইয়া, কোন্ সিংহাসনে বসিয়া আপনার তুলনা করিবে? তুমি জগত দুঃখপূর্ণ জান, এই দুঃখময় জগত বিশ্বাসীর পিতৃরাজ্য।

এ পর্য্যন্ত বিশ্বাস লইয়া দুইটা হৃদয়ের কথা কহিয়াছি। যুক্তি করিয়া দেখি, প্রথমতঃ তোমাকে অন্ধ বিশ্বাসের কথা বলিয়াছি। আমরা অন্ধ বিশ্বাস বিশ্বাস করি না,—বিশ্বাস অন্ধ হয় না। মহাযুক্তিবান, একবার যুক্তি করিয়া দেখ, যুক্তি বা যে কারণেই হউক,—তুমি যাহা বিশ্বাস কর, তাহার নাম সত্য। যুক্তি করিয়া বিশ্বাস করিয়াছ? যেমন চুন-হলুদ মিশিলে আর এক প্রকার রং হয়—

বিশ্বাস কর। যাহা তোমার পঞ্চেন্দ্রিয়ে দেখিয়াছ, তাহাই তোমার বিশ্বাস অর্থাৎ তোমার বিশ্বাসই সত্য অতদূর বিশ্বাস করিও না, তোমার শাস্ত্রেই তাহা নিষেধ করিবে। আপাততঃ প্রধান আবিষ্কার—অন্যান্য আবিষ্কারের ওলট পালট কথা এখন রাখিলাম,—আপাততঃ প্রধান আবিষ্কার এই যে, কতক পরিমাণে তাড়িৎ-গমনে মৃত্যু হইতে নিস্তার নাই। কিন্তু শত সহস্র বা কোটি কোটি যে যে তাড়িৎ-প্রবাহ পৃথিবীতে সম্ভব, সে তাড়িৎ-প্রবাহে মানুষ মরে নাই। বিজ্ঞানবিদ্ টেস্‌লা তাহার প্রধান আবিষ্কারক। Gravitation যে নিয়মে কথিত আছে—বিশ্ব চলিতেছে, তাহা আপাততঃ তাড়িৎ-ক্রিয়া কিনা—ইহা অনেক বৈজ্ঞানিকের সন্দেহ হয়। মাংসপিণ্ডে কীট জন্মায়। বৈজ্ঞানিক ধারণা করিয়াছিলেন যে, জড় হইতে চৈতন্য উদ্ভব হইয়াছে; এই মতের নাম—'এস্‌পেনটিনিয়স জেনেরেসন।' সে মতের বিপ্লব ঘটিয়াছে; একৃনস্‌টিক টিণ্ডেল উক্ত মতের বিরোধী, তিনি ইন্দ্রিয়-সম্ভূত যুক্তি অনুসারে স্থির করিয়াছেন যে, জীব জীব হইতে উৎপন্ন। যত প্রকার বৈজ্ঞানিক মত-বিপ্লব হইয়াছে, তাহার উল্লেখ করিতে গেলে, আমাদের প্রবন্ধ শেষ হইবে না। কাল একমত চলিতেছিল, আজ তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী মত স্থাপিত। কে জানে, আগামী কল্য আবার কি হইবে। পীড়িত অবস্থায় চিকিৎসা-বিদ্যার উপর আমরা জীবন অর্পণ করি। চিকিৎসকের বিজ্ঞতা-অবিজ্ঞতার কথা আপাততঃ দূরে থাকুক। বিবিধ প্রকার চিকিৎসা শাস্ত্রের পরস্পর মতবিরোধের কথা দূরে থাকুক, এক শ্রেণীর শাস্ত্র দিন দিন উল্‌টাইতেছে, যথা পূর্ব্বে অ্যালোপ্যাথেরা জানিতেন, জ্বর রোগে রক্তমোক্ষণ করা উচিত। এক্ষণে রক্তমোক্ষণ করিলে, নিশ্চয় মৃত্যু, সমস্ত অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকের ধারণা। দুইজন চিকিৎসকের মত প্রায়ই ঠিক হয় না। এইরূপ বিপ্লব স্থলে কোন্ যুক্তি অনুসারে বিশ্বাসদ্বেষী বুদ্ধিমান-চিকিৎসক-হস্তে তাঁহার জীবন অর্পন করেন!

আইনজ্ঞের মধ্যেও দুই ব্যক্তি একমত নন। আবার প্রত্যেক আইনজ্ঞই বাদী ও প্রতিবাদী উভয়ের পক্ষেই এককালে মত দিয়া থাকেন। কোন্ যুক্তি-বলে বিশ্বাস-দ্বেষী ঐ সকল ব্যক্তির উপর তাঁহার সর্ব্বস্ব অর্পণ করেন?—উত্তর করিবেন, আর উপায় কি!

সকলের মতে গণিত-শাস্ত্রের ন্যায় নিশ্চিত শাস্ত্র আর নাই। সেই গণিত শাস্ত্রে ২ কাহাকে বলে? যদি এইটিকে ১ বলিয়া কল্পনা করি, তাহা হইলে ঐটির নাম ২। প্রস্থহীন দৈর্ঘ্যের নাম রেখা। পরিসরহীন স্থানের নাম বিন্দু, এই সকল লইয়া গণিত শাস্ত্র। এই শাস্ত্রে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রাখ? এই সকল সত্য বলিয়া জান কেন? বুঝিয়া দেখ, তাহার অপর কোনও কারণ নাই, তুমি বিশ্বাস কর—এই মাত্র কারণ। এ পর্য্যন্ত তোমারই মত অনুসারে চলিতেছিলাম; এক্ষণে মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, হে বিশ্বাস-দ্বেষি, সত্য জানিবার তোমার কোনও অধিকার নাই। হে বিদ্যাভিমানি, তুমি যদি কিছু জান, জানা উচিত যে তুমি অন্ধ। তোমার কোন কথা জানিবার অধিকার

নাই। জানিবার অভিমান রাখিলে, অতি তীব্র ভাষায় তোমারই যুক্তি তোমাকে তিরস্কার করিবে। তোমারই যুক্তি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিবে, কিরূপে জানিয়াছ, যে যুক্তি দ্বারা কোনও প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়াছ, সে যুক্তি ভ্রান্তিমূলক নয় ? যে সকল সিদ্ধান্তের উপর তোমার যুক্তি স্থাপিত, সেই সিদ্ধান্ত ভ্রমশূন্য কি প্রকারে জানিলে ? সমস্ত সিদ্ধান্ত, যাহার উপর তোমার যুক্তি স্থাপিত, তুমি কি পরীক্ষা করিয়াছ ? যদি করিয়া থাক, অসম্ভব কথা ; যদি করিয়া থাক, পরীক্ষাকালীন তোমার ভ্রম হয় নাই—কিরূপে নিশ্চিত করিলে ? যতই পরীক্ষা কর, যতই যুক্তি কর, বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তোমায় চলিতে হইবে। বিশ্বাস করিয়া লইতে হইবে—এইটি সত্য, তাহার পরে যুক্তি চলিবে। যত যুক্তি—মূলে বিশ্বাস, সেই বিশ্বাসের নিন্দা কর। তুমিই যথার্থ অন্ধকূপে পতিত।

['জন্মভূমি' মাসিক পত্রিকায় (১৩১৫ সাল, জ্যৈষ্ঠ ১৬শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা) প্রথম প্রকাশিত]

আমরা সর্ব্বদাই ধর্ম্মের দোহাই দিয়া থাকি। যখন মনে করি, কেহ আমাদের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিয়াছে, আর যদি সেই অসদ্ব্যবহারের প্রতিদান দিতে অক্ষম হই, তাহা হইলে অমনি ধর্ম্মের দোহাই দিয়া থাকি। যদি কোন অত্যাচারী সুখে আছে দেখিতে পাই, অমনি বলি,—"ধর্ম্ম কি নাই" ! ধর্ম্ম যে প্রতি হাত আমাদের শত্রুকে দমন করেন না,—এই নিমিত্ত আমরা ক্ষোভ প্রকাশ করি, "ঘোর কলি", "অধর্ম্মেরই জয়"—এই বলিয়া থাকি। আমাদের মধ্যে আবার যিনি একটু বিজ্ঞ, তিনি ভাবেন ও মনকে শান্তি দেন যে, একদিন না একদিন ধর্ম্ম, তাঁহার শত্রুকে শাস্তি দিবেন। যাহার সহিত কোন কার্য্যের সম্বন্ধ আছে, পাছে কার্য্যস্থলে তাহার দ্বারা প্রতারিত হই, এ নিমিত্ত তাহাকে বিশেষ করিয়া ধর্ম্মের ভয় দেখাই। কিন্তু নিজে যদি কাহাকেও শাস্তি দিতে পারি, তখন আর ধর্ম্মের প্রতি অত্যাচারীর দণ্ডের নির্ভর না করিয়া আপনিই দণ্ডবিধান-কর্ত্তা হই এবং দণ্ড দিয়া গৌরব করিয়া থাকি যে, পাপীর প্রতি শাস্তি বিধান করিয়া বড়ই পুণ্য কার্য্য করিয়াছি। পরের বেলা যে ধর্ম্মের দোহাই দি, সেই ধর্ম্মকে অধিক সময় আপনারা উপেক্ষা করি,—এমন কি ঘৃণা করি বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

পুরাণে শুনিতে পাই, রাজা যুধিষ্ঠির জন্মগ্রহণ করিলে দৈববাণী হয়,—"পাণ্ডুরাজ, তোমার এক পরম ধার্ম্মিক পুত্র জন্মিল।" দৈববাণী শুনিয়া পাণ্ডুরাজ ক্ষুব্ধ হইলেন, ভাবিলেন,—ধার্ম্মিক সন্তান পৃথিবীর কোন্ কার্য্যের হইবে ? ধার্ম্মিক বা অকর্ম্মণ্য এক

কথা—এই তাঁহার ক্ষোভের কারণ। ধার্ম্মিক পুত্র রাজকার্য্যের উপযুক্ত নয়, এরূপ ধারণা সাধারণের। কিন্তু ভারত-যুদ্ধে, তাঁহার ভীমার্জ্জুন পুত্রদ্বয় দ্বারা ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, ভগদত্ত প্রভৃতি মহাবীরগণ পরাজিত হইত না, কৃষ্ণ সহায়ে "যতোধর্ম্মস্ততো জয়" হইয়াছিল।

এরূপ ধারণার কারণ এই, অনেক সময় ভীরু ব্যক্তিকে আমরা ধার্ম্মিক বলিয়া গ্রহণ করি। কাহারও কথায় থাকেন না, কেহ মন্দ ব্যবহার করিলে সহ্য করেন, সকলের নিকটে বিনয়ী, নিরীহ, গোবেচারা,—ধূর্ত্ত শঠব্যক্তি বার বার তাঁহাকে প্রতারিত করে, তবু কাহাকেও তিনি কিছু বলেন না, এরূপ ব্যক্তি অকর্ম্মণ্যই বটে; এরূপ ব্যক্তির সকল কার্য্যের ভিত্তি—ভয়। তিনি ভয়ে শত্রু দমনের চেষ্টা করেন না। অনেক সময়ে যে প্রতারিত হইয়াছেন, তাহার কারণ লোভ—যে তাঁহাকে প্রতারিত করিয়াছে, সে তাঁহাকে লাভের আশা দিয়াছিল; সেই লাভের আশায়, প্রতারককে তিনি অর্থদান করিয়াছিলেন। ভাল-মন্দ কিছুতেই থাকেন না; সদাই ভাবেন, না জানি কি করিতে কি হইবে! এরূপ ব্যক্তি ঘোর তমোগুণাচ্ছন্ন; সত্যই জগতের কোন কার্য্যই ইহার দ্বারা হয় না।

কিন্তু যিনি প্রকৃত ধার্ম্মিক, তিনি মহাবীর, তিনি অসীম সাহসী, তিনি বিপুল কর্ম্মক্ষম। ধার্ম্মিকের প্রধান লক্ষণ—দয়া। দয়া কখনও স্থির থাকিতে দিবে না, নিয়ত কর্ম্মে নিবিষ্ট রাখিবে। দয়াবান ব্যক্তি দুর্ব্বল-পীড়ন দেখিতে পারিবেন না। শত শত্রু উপেক্ষা করিয়া দুর্ব্বলের রক্ষার চেষ্টা পাইবেন। পরের রক্ষার নিমিত্ত অনায়াসে অগ্নিতে প্রবেশ করিবেন, অনায়াসে সমুদ্রে ঝাঁপ দিবেন। ইনি অত্যাচারীর প্রতি দুর্ব্যবহার করেন না, ইহার কারণ ভয় নহে—মার্জ্জনা। ভয়ে চালিত হইয়া কখনও কখনও আমরা ক্ষমাশীল হই। পুরাণে তাহার একটি অদ্ভুত উদাহরণ—অর্জ্জুন; রণস্থলে যুদ্ধ করিতে চাহেন না। গীতায় দেখা যায় যে, অর্জ্জুন বলিতেছেন, —"এ সমস্ত আত্মীয়গণকে কিরূপে বধ করিব? ইহাদের বধ করিয়া রাজ্যলাভ করা অপেক্ষা ভিক্ষাপাত্র অবলম্বন করাই ভাল।" ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জ্জুনের এ কথা শুনিয়া, তাঁহাকে "মূর্খের মত আচরণ করিতেছ"—বলিয়া তিরস্কার করেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেন যে, গীতা পাঠে অনুভব হয়, অর্জ্জুন তমোগুণাচ্ছন্ন হইয়া যুদ্ধ করিতে বিমুখ হন। শঙ্কায় তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়, মহা অস্ত্রধারী, মহারথীবৃন্দ বিপক্ষ পক্ষে দর্শনে, তিনি যুদ্ধে বিমুখ হইতে চাহেন। ভগবান উপদেশ দ্বারা, সেই ঘোর তমঃ দূর করিয়া, তাঁহাকে গাণ্ডীব ধরান। ভগবান যোগদৃষ্টি দানে তাঁহাকে দেখান যে, যে সমস্ত বীর-পুরুষ তাঁহার বিপক্ষ, তাঁহারা সকলেই মৃত, কেবল নিমিত্ত হইয়া, তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইবে। যুদ্ধস্থলে অর্জ্জুন নিমিত্ত মাত্র, ভগবানের কার্য্য ভগবান করিয়াছেন। গীতার মর্ম্ম এই যে, বীর ব্যতীত ধর্ম্মের অধিকারী আর কেহই হইতে পারে না।

ইতিহাসে দেখা যায় যে, জাতীয় উন্নতির মূলে ধর্ম্ম। ধার্ম্মিক, স্বার্থত্যাগী মহাপুরুষ ব্যতীত কেহ কখনও কোন জাতির নেতা হন নাই। স্বার্থ শূন্য ব্যক্তি দ্বারা চালিত না হইয়া, পৃথিবীতে কখনো কোন কার্য্য হয় নাই। ধর্ম্মের ভিত্তি ভিন্ন সাংসারিক কোন

কার্য্যই হয় না। ধর্ম্মমূলক না হইলে, পৃথিবীতে বিপুল বাণিজ্য স্থাপিত হইত না। কখনও কোন অধার্ম্মিক ব্যক্তি অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে দেখা যায়, কিন্তু প্রায়ই সে অর্থ তাহার ভোগে আসে না। নানা কষ্টে, নানা ভয়ে, নানা অনুতাপে দগ্ধ হইয়া অর্থ উপার্জ্জন হয়, কিন্তু তাঁহার উপার্জ্জন যকের ন্যায়, তাঁহার কোন কার্য্যেই আসে না। অসৎ বৃত্তির দ্বারা কদাচ কেহ ধনাঢ্য হয় বটে, কিন্তু শত শত ব্যক্তিকে অসৎ পথে গিয়া কারাবাসে জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। Policy (কৌশল) যাহার অর্থ আমরা প্রতারণা বুঝি, বস্তুতঃ তাহা প্রতারণা নয়, পণ্ডিতেরা বলেন, সততা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কৌশল নাই।

গুরু ধার্ম্মিক হইতে উপদেশ দেন, সারবান গ্রন্থে ধর্ম্মের অশেষ ব্যাখ্যা; তবে কি নিমিত্ত আমরা ধর্ম্মপথে চলি না? অধর্ম্মের কতকগুলি আশু প্রলোভন আছে। এক ব্যক্তি তাঁহার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করেন যে, মিথ্যা কথা বলা কি ভাল? বন্ধু কৌতুকচ্ছলে উত্তর করেন, "মিথ্যা কথা ভাল নয় বটে, কিন্তু যদি সত্য গোপন করিতে চাও, তাহা হইলে মিথ্যা কথা অপেক্ষা সত্য গোপন করিবার আর কোন উৎকৃষ্ট উপায় এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই।" সমাজ হীনদশাপন্ন হওয়ায় বাল্যকাল হইতে মিথ্যার প্রয়োজন হইয়াছে, মানব জীবনে—বিশেষ বাল্যাবস্থায় পদে পদে অপরাধ। অপরাধ গোপন করিবার নিমিত্ত বালক মিথ্যা কথা কহে। পিতামাতা বা শিক্ষক মিথ্যাবাদী বালককে সুচতুর বলিয়া আদর করে। ইতিপূর্ব্বে শিশু কোন আবদার করিলে তাহাকে মিথ্যা বলিয়া ভুলান হইত; শিশু তখনই শিখিয়াছে যে, মিথ্যা বড় সহজ উপায়। শিশু যখন কোন বস্তু চাহিয়াছিল, তাহাকে বলা হইয়াছিল, "হুস, কাগা নিয়ে গেছে।" যদি শিশুর নিকট কৌতুক করিয়া কোন দ্রব্য চাওয়া হয়, সেও আধ আধ স্বরে বলে, "হুস্ কাগা।" আমরা, শিশুর কৌশলে হাসিয়া ঢলিয়া পড়ি। শিশুও মনে ভাবে, আমি কি সুকৌশলী! বালক দেখিতে পায়, মাতা পিতার সহিত, পিতা মাতার সহিত, ভ্রাতা ভ্রাতার সহিত মিথ্যা কথা কয়। পিতা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতে অসম্মত হইলে বালককে বলিয়া দেয়, "বলগে, আমি বাড়ী নাই।" বালক মিথ্যার বিশেষ আদর করিতে শিখে এবং সেই কোমল হৃদয়ে যে দাগ পড়ে, তাহা আর ইহজন্মে উঠে না। সমাজ জানে, বালককে শিষ্ট করিবার উপায়, ভয় প্রদর্শন। জুজু হইতে সুরু করিয়া, বরাবর ভয়ই প্রদর্শন করা হয়; সুখের বাল্যজীবনে ভয় অধিকার করিলে, উচ্চবৃত্তি সমস্ত দমিত হয়। সকল উচ্চবৃত্তির আধার সাহস; যাহার পদে পদে আশঙ্কা, তাহার দ্বারা কোন্ কার্য্য সম্পাদিত হইবে? যাহা মন্দ, তাহা মন্দ বলিয়া ঘৃণা করিতে শেখে না, কেবল ভয়ের দ্বারা মন্দ কার্য্য করিতে বিরত হয়। যৌবনে, যখন আশু ভয়ের কোন কারণ না থাকে, তখনই সেই কুকার্য্যে রত হয়। সে যতদূর শিক্ষা পাইয়াছে, তাহাতে জানে যে, চুরী করিব না কেন?—মার খাইব। কুস্থানে গমন করিব না কেন?—বাবা তাড়াইয়া দিবে। তাড়ার ভয়ে কুকার্য্য করে না, কিন্তু কুকার্য্যের রুচি বাধা পাইয়া আরও প্রবল হইতে থাকে। সচরাচর দেখা যায়, শিষ্টশান্ত ছিল, যেই পিতৃহীন বা অভিভাবকহীন হইল, অমনি মহা কুচরিত্র হইয়া উঠিল।

এখন তার ভয় নাই, তবে দুষ্কর্ম করিবে না কেন? বাল্যাবধি যে শিক্ষা পাইয়াছে, তাহার ফল ইহা ভিন্ন হইতে পারে না।

কিন্তু যদি কুকার্য্যকে কুকার্য্য বলিয়া ঘৃণা করিতে শিখিত, যদি উপদেশ শ্রবণে ও আদর্শ দর্শনে, বাল্যাবধি ধর্ম্মানুরাগী হইতে দীক্ষিত হইত, যদি বুঝিতে পারিত যে, মানবজীবনে ধর্ম্মই একমাত্র সহায়, ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে শত শত বিপদে ধৈর্য্যচ্যুত হইতে হয় না, ধর্ম্ম অবলম্বনে মনুষ্যত্ব লাভ হয়, তাহা হইলে অভিভাবকহীন হইলেও তাহাকে কেহ কুপথগামী করিতে পারিত না। বাল্যকালে মিথ্যা প্রবঞ্চনা না শিখিলে সত্যাশ্রয়ী হইত, আর যিনি সত্যাশ্রয়ী, তাঁহার তুল্য জগতে নির্ভীক কে? সভ্য জাতির ভিতর ভীরু অপেক্ষা গালি নাই এবং ভীরু বা মিথ্যাবাদী একই কথা। যিনি বাল্যবধি গুরুজন-উপদেশে সত্যব্রত, তিনি যে অশেষ গুণের আধার হন, সন্দেহ নাই। পাছে মিথ্যা বলিতে হয়, এই জন্য তিনি কুৎসিৎ কর্ম্ম হইতে বিরত থাকেন। আমেরিকার বর্ত্তমান প্রেসিডেন্ট রুসভেল্টকে, তাঁহার কোন এক বন্ধু রবিবারে শিকার করিতে যাইতে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন, "অদ্য রবিবারে শিকার করাতো প্রথা নয়।" বন্ধু উত্তর করিলেন, "এখানে তো পাদরী নাই, তবে যাইতে দোষ কি?" রুসভেল্ট, তাহাতে হাস্য করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, "ভাই, অত সাত পাঁচ ভাবিয়া, গোপনে শিকার করিতে যাওয়া অপেক্ষা না যাওয়াই নিরাপদ।" সত্যাশ্রয়ী সর্ব্বদাই এরূপ নিরাপদ সত্য।

বাল্যকালে মিথ্যাশিক্ষার সহিত একরূপ ব্যবসায়ী ধর্ম্ম শিক্ষাও বালক পাইয়া থাকে। সকলের মুখেই শোনে, ধর্ম্মপথে থাকিলে ভাল হয়, অর্থাৎ ধন হয়, জন হয়, মান হয়। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্ম, কাহারও নিকট ধন, জন, মান বা সাংসারিক উন্নতি দান করিতে অঙ্গীকৃত নন। এই ব্যবসায়িক ধর্ম্মশিক্ষা অনেক সময় বিড়ম্বনার কারণ হয়। সংসার দৃষ্টে অনেক সময় বোধ হয়, বুঝি অধর্ম্মেরই জয় হইতেছে। দেখা যায় —শঠ, ছল, মিথ্যাবাদী, কপঠ মকদ্দমায় জয়ী হইল, পরের সম্পত্তি হরণ করিয়া বিষয় পাইল। ছলনায় রোজগার করিয়া বাবুয়ানা করিতেছে। যে পরপীড়ক, তাহাকে সকলে ভয় করে। এ দিকে আবার ধার্ম্মিক, পরোপকারী, দাতা—নানা ক্লেশে ধনোপার্জ্জন করে, দরিদ্রের দুঃখ মোচনে রত থাকিয়া অর্থ রাখিতে পারে না, পরের হিত করিতে গিয়া অনেক সময়ে বিপদ্‌গ্রস্ত হয়, জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে গিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিতে হয়, জমীদারের পক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য না দিলে উদবাস্ত হয়, রোগীর শুশ্রূষা করিয়া স্বয়ং রোগগ্রস্ত হয়। যিনি ব্যবসায়ী ধর্ম্ম শিখিয়াছেন, এই সমস্ত দেখিয়া তাঁহার ধর্ম্মে অনাস্থা জন্মে। তিনি মিথ্যা কথা কন না, প্রতারণা করেন না; কই, ঘরে বসিয়া ধর্ম্ম তো তাঁহাকে অর্থ দেন না। অনেক ব্যক্তি, যাহাদের তিনি উপকার করিয়াছেন, প্রায়ই তাহারা তাঁহার নিন্দা করে। পরোপকার করিয়া কই তিনি জগতে মান্য-গণ্য হইলেন? তাঁহার পল্লীস্থ শত শত ব্যক্তি ধনাঢ্য অধার্ম্মিকের বশীভূত, তাঁহার বশীভূত কেহই নয়। তাঁহার একমাত্র পুত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে, কিন্তু এক অধার্ম্মিক ব্যক্তির সাত পুত্রই জীবিত। তবে ধার্ম্মিক হইয়া তাঁহার কি

ফল ফলিল ? আত্মীয় বন্ধুরা তাঁহাকে উপহাস করে, অনেকেই বোকা বলে। ইনি সত্য কথা কহিয়া মকদ্দমায় হারিয়াছেন,—ইহাতে ঘর-পরে লাঞ্ছনার একশেষ! তবে আর কেন তিনি ধার্ম্মিক থাকিবেন ? এত দিন মূর্খের ন্যায় আচরণ করিয়াছেন, এইবার সতর্ক হইয়া চলিবেন। আশু কতক ফলও ফলে। তিনি যে মিথ্যা কথা শিখিয়াছেন, লোকে তাহা সহজে জানিতে পারে না। লোকে বিশ্বাসপাত্র হইয়া অনেককে ঠকাইতে সক্ষম হন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতে পারেন যে, প্রতারণায় অর্থোপার্জ্জন করিয়াছেন বটে, কিন্তু সদাই ভয়ে ভয়ে থাকিতে হইয়াছে। কখন কোন্ জুয়াচুরি ধরা পড়িবে! যে সকল কাজ করিয়াছেন, ইহকালেই তার সাজা আছে। সমস্ত কথা প্রকাশ হইলে, জেল নিশ্চিত। একটা মিথ্যা ঢাকিবার জন্য মিথ্যার জাল বিস্তার করিতে হইয়াছে। প্রাতে কেহ ডাকিলে পূর্ব্বের ন্যায় সহজে তাঁর সম্মুখীন হইতে পারেন না। দিবসে হাস্যমুখে, অন্তরের ছুরি ঢাকিয়া রাখিতে হয়। রজনীযোগে, উপাধানে মস্তক রাখিলেই পূর্ব্ববৎ নিদ্রা আসে না। যে সকল গলদ হইয়াছে, তাহা কি গলদ কার্য্য করিয়া লুকাইতে পারিবেন, এই চিন্তায় অর্দ্ধেক রাত্রি জাগরিত থাকিতে হয়। এখন আর সে শান্ত মেজাজ নাই, ভাল কথা কহিলে বেজার হন। অসৎ ব্যক্তির সাহায্য তাঁহার বিশেষ প্রয়োজন। অসৎব্যক্তি না হইলে তাঁহার অসৎ কার্য্যে সাহায্য দান কে করিবে ? কিন্তু যাহাকে অসৎ জানেন, তাহার উপর কার্য্য নির্ভর করিয়া নিশ্চিত থাকিতে পারেন না। সেই অসৎ ব্যক্তি সত্যই কি তাঁহার সাহায্য করিবে ? কিম্বা তাঁহার শত্রুপক্ষ অবলম্বন করিয়া, তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইবে ? নানা দুশ্চিন্তা—তথাপি ফিরিবার উপায় নাই,—কাহাকেও বিশ্বাস হয় না, চাকর বাকর, আত্মীয় স্বজন—এমন কি, ধার্ম্মিক ব্যক্তিকেও মনের গুণে অসৎ বিবেচনা করেন। দিবসে দুশ্চিন্তা, রাত্রে দুঃস্বপ্ন —তাঁহার জীবন হলাহলময় হইয়াছে। যে অর্থের নিমিত্ত ধর্ম্ম-পথে জলাঞ্জলি দিয়া, অধর্ম্ম-পথে বিচরণ করিতেছেন, সেই অর্থে তাঁহার পুত্রকেও পর করিয়াছে।

কত দিনে তাঁহার পিতার মৃত্যু হইবে—তাঁহার পুত্রের এই চিন্তা। মনে মনে বেশ বুঝিতে পারেন, কেবল প্রত্যাশাপন্ন হইয়া তাঁহাকে যত্ন করিতেছে। চক্ষের উপর দেখিয়াছেন যে, যে ধনাঢ্য ব্যক্তিকে হিংসা করিয়া, তিনি ধর্ম্মচ্যুত হইয়া পাপ-পথে বিচরণ করিতেছিলেন,—সেই ধনাঢ্য ব্যক্তির মৃত্যুকালে, অজ্ঞান-অবস্থায় যখন মুখে মক্ষিকা প্রবেশ করিতেছিল, তখন তাঁহার সেই অজ্ঞান-অবস্থার প্রতি কেহ লক্ষ্য না রাখিয়া—তালা-চাবি দিতে ব্যস্ত। যে যেখানে যা পাইতেছে, তাহা সরাইতেছে। আত্মীয়েরা তাঁহাকে শ্মশান-ভূমিতে লইয়া গেল, এদিকে তাঁহার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, যে সকল বস্তু তাহার নিকট জিম্মা ছিল, সেগুলি লইয়া পলায়ন করিল। সৎকার করিয়া আসিয়াই দুই পুত্রে লাঠালাঠি বাধিল। অর্দ্ধেক বিষয় উকীল-কৌন্সিল খাইল। আবার দেখেন, যে লোক জুয়াচুরি করিয়া বাবুয়ানা করিতেছিল,—এতদিনে তাহার জাল ধরা পড়িয়াছে,—নিশ্চয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর যাইতে হইবে। কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তির স্ত্রী, সম্পত্তি পাইয়া উপপতির বাঁদী হইয়াছে। তাঁহার ভাগ্যে যে ঐ একরূপ ঘটিবে, তাহা

নিশ্চিত নয় কেন? কিন্তু তথাপি পাপের মমতা ছাড়ে না, ছাড়িবার উপায় নাই।—দুষ্কর্ম চাপা দিবার নিমিত্ত দুষ্কর্ম করিতে হইতেছে। অর্থ-লোভে আবার নূতন দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হইতেছেন। জীবন অশান্তিময়, কিন্তু লালসাও সেইরূপ বলবতী! ইহকালের সাজাই যথেষ্ট, ইহার পর পরকাল আছে! একেবারে পরকালের ভয় মহা-নাস্তিকেরও দূর হয় না। ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট পাপী যতই দিন দিন হীনবল হইতে থাকে, শরীরের বার্দ্ধক্য-অবস্থায় যতই দিন দিন বুঝে যে, চরম কালের আর বেশী বিলম্ব নাই, ততই রাত্রদিন বিভীষিকা দর্শন করে। ব্যবসায়ী ধর্ম্ম লোককে অধঃপাতে প্রেরণ করে।

কিন্তু যে মহাত্মা ধর্ম্মের বিমল মূর্ত্তি দেখিয়া ধর্ম্মে অনুরাগী হইয়াছেন, যিনি ধর্ম্মকে ধর্ম্মের জন্য উপাসনা করেন, যিনি ধর্ম্মের নিকটে ধর্ম্ম-প্রত্যাশী, আর অপর প্রত্যাশা কিছুই রাখেন না, জগতে একমাত্র তিনিই ধন্য! রোগ, শোক, দুর্ঘটনা—মনুষ্য-জীবনে অনিবার্য্য, কিন্তু এরূপ দুঃখ জগতে নাই, যাহাতে সেই ধর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিকে বিকল করিতে পারে। শান্তিময় ধর্ম্ম তাঁহার হৃদয়ে বসিয়া, তাঁহার হৃদয় শান্তিময় করিয়াছে, শত্রু-তরবারি দৃষ্টে তাঁহার চক্ষে পলক পড়ে না! দুর্জ্জন-পীড়নে তাঁহাকে তাপিত হইতে হয় না—ধর্ম্মবলে রোগ-শোকে অধীর নন—রাজক্রোধেও তিনি ভীত হন না; সকল অবস্থায় সর্ব্ব সময় তাঁহার শান্তি! তিনি যমজয়ী—তাঁহার মৃত্যু-ভয় নাই।

এ ধর্ম্ম লাভ কিরূপে হয়?—এ মহারত্ন কিরূপে অর্জ্জন করা যায়? সদ্‌গুরুর উপদেশ ও সদাসদ্‌ বিচার। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, পাপ বড় মোহিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া নরসম্মুখে অবস্থান করে। একবার অন্তরে প্রবেশ করিলে কত যন্ত্রণা দিবে, তাহা সে মোহিনী মূর্ত্তি দর্শনে অনুভূত হয় না। পাপের যন্ত্রণার কথা শুনিয়া শিক্ষা করা বড়ই কঠিন। অনেক সময়েই মনে হয়, ইন্দ্রিয়ের সুখভোগই পরমার্থ,—একটু মানসিক যন্ত্রণায় আর কি আসিয়া যাইবে!—যাহার অন্তর্দাহ উপস্থিত না হইয়াছে,—অন্তর্দাহ যে কি কঠোর নরক, তাহা সে বুঝিতে পারে না। অন্তর্দাহের কথা শুনিয়াছে মাত্র, প্রবল ইন্দ্রিয় কখনও অন্তর্দৃষ্টি করিতে দেয় নাই। সুতরাং পাপের তাড়না, কলুষিত মনের গ্লানি, দণ্ডের আশঙ্কা যে কতদূর দুঃসহ, তাহা কিরূপে জানিবে! হিতাহিত জ্ঞান যে কত তীব্র শূল—জাগরণে, শয়নে, স্বপনে বিদ্ধ করে, তাহা ইন্দ্রিয়াসক্ত মূঢ় বোঝে না,—এই নিমিত্ত ধর্ম্মের অনাস্থা।

হে ধর্ম্ম, তোমায় এত দিন ভয় করিয়া আসিয়াছি। বুঝিতে পারি নাই যে, তুমি পরম বন্ধু। তোমাকে আমার সুখের বিরোধী জানিতাম। তুমি মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা, ব্যভিচার করিতে নিষেধ কর,—এই নিমিত্ত তোমায় শত্রু ভাবিয়াছি; তুমি সদাচার, নিষ্ঠাবান ও কর্ত্তব্যরত হইতে উপদেশ দাও, এই নিমিত্ত তোমায় ঘৃণা করিয়াছি; তুমি অলস হইতে নিষেধ কর, তুমি ইন্দ্রিয়াসক্ত হইতে নিষেধ কর, তুমি পরের অনিষ্ট করিতে নিষেধ কর,—এই নিমিত্ত তোমায় বাতুল ভাবিয়াছি। তুমি ধন, জন, গৌরব, সম্পদ—অনিত্য বলিতে শিখাও, তুমি সুখ-দুঃখে সমভাবে থাকিতে বলো,—মানবজীবনে দুঃখ অনিবার্য্য, ইহাই প্রচার করিয়া থাক। দুঃখে অন্তর মার্জ্জিত

হয়, সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ চক্রবৎ ঘুরিতেছে, সে কারণ সুখ দুঃখ উভয়কে উপেক্ষা করিতে তুমি পরামর্শ দাও।—আমি নির্ব্বোধ, বিবেকহীন,—সারগর্ভ কথা কিরূপে হৃদয়ঙ্গম করিব,—অতএব ও সকল কথার কথা জানিয়াছিলাম। তুমি যে স্বাস্থ্য-দাতা, বলদাতা, সাহসদাতা, ধৈর্য্যদাতা, শান্তিদাতা—এতদিন তোমায় চিনি নাই,—হে শান্তিময়, হে নিরঞ্জন, হে মঙ্গলময়, তোমাকে নমস্কার করি। শুনিয়াছি, প্রার্থনা করিলে তুমি হৃদপদ্মে আসিয়া ব'সো। হে ধর্ম্ম, যে প্রার্থনা তোমার প্রিয়, সেই প্রার্থনা আমায় শিক্ষা দাও, তোমার মোহন মূর্ত্তি দেখিবার আমায় চক্ষু দাও, তোমায় উপাসনা করিবার বল দাও!—হে ধর্ম্ম, তোমায় একমাত্র বান্ধব জানিয়া যেন আমার জীবন-লীলা সংবরণ হয়।

['উদ্বোধন' পাক্ষিক পত্রে (সন ১৩০৮ সাল, ১৫ই মাঘ, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা) প্রথম প্রকাশিত]

ধর্ম্ম-স্থাপক ও ধর্ম্মযাজক

ভারতবর্ষে ও অন্যান্য দেশে ধর্ম্ম-ইতিহাসে শত শত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে, যখন ধর্ম্মের কলুষিত অবস্থায় কোন মহাত্মা অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মের সার-মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিয়া সত্য ধর্ম্ম পুনঃ সংস্থাপনের চেষ্টা পান, ধর্ম্মযাজকেরা তাঁহার শত্রু হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম আচ্ছাদিত না হইলে, ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী ধর্ম্মযাজকের স্বার্থের বিশেষ হানি হয়। অর্থ উপার্জ্জন, রমণী-সম্ভোগ, মানসঞ্চয়,—যাহাদের উদ্দেশ্য, তাহারা কখনও যথার্থ ধর্ম্ম উপদেশ দিতে পারে না। চক্ষের উপর শত শত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়,—গুরু একবার মন্ত্র দিয়া গিয়াছেন, তারপর যখন তিনি শিষ্যের বাড়ী আসেন, শিষ্যের কতদূর ধর্ম্মোন্নতি হইয়াছে, তাহা একবারও জিজ্ঞাসা করেন না। শিষ্যের সহিত আলাপ হয় এই যে,—"বাপু, এ বৎসর তো বড় দুর্ব্বৎসর যাচ্ছে—ঝড়ে বড় ঘরখানির অর্দ্ধেক চালের খড় উড়িয়া গিয়াছে। ধান চালেরও সেরূপ সুবিধা নাই। কয়খান জমীতে প্রায় অর্দ্ধেকের কম ফসল হইয়াছে।" এইরূপ নিজের দুঃখের কথা প্রকাশ করে, অভিপ্রায় এই যে, শিষ্য এবার বেশ ভারি রকম বিদায় দেয়। গুরুর সঙ্গে একজন ব্রাহ্মণ ও একজনভৃত্য আছে। যে কয়দিন 'শিষ্য-স্নেহে' শিষ্যের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন—তিন জনে চর্ব্ব্য-চোষ্য আহারপূর্ব্বক কৃপা করিয়া শিষ্যের নিমিত্ত প্রসাদ রাখেন। জঠরে স্থানাভাব সত্বেও শিষ্যের ভাগ্যে প্রসাদ মিলে, অবশ্য উত্তম মৎস্য প্রভৃতি সে প্রসাদে থাকে না। এরূপ অবস্থায়, যদি কোন নির্ম্মল চরিত্র সাধু প্রচার করেন যে, যিনি সদ্গুরু,—তিনি তাপ-অপহারক—বৃত্তি-অপহারক নন; উপরোক্ত যাজক-গুরুগণ যে তিনি শত্রু হন, তাহার আর সন্দেহ নাই। প্রচারকের নির্ম্মল চরিত্র, প্রচারকের

ধর্ম্ম-নিষ্ঠা, প্রচারকের পাপী-তাপীর প্রতি দয়া, প্রচারকের যথার্থ ধর্ম্মোপদেশ,—যাজক-গুরুর বিষবৎ হইয়া উঠে।

ঈশ্বরের অদ্ভুত মাহাত্ম্য এই যে,—অতি নীচ, অতি পাপীরও তাঁহার নাম উচ্চারণে অধিকার আছে। সে নামে তাপ দূর হয়, চিত্তশুদ্ধ জন্মে, চণ্ডালকে দেবত্ব প্রদান করে। এই ঈশ্বর-মাহাত্ম্য, প্রচারক সাধনা দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং জনসন্তাপে হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া, জনহিতার্থ জন-সমাজে ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করেন! যাজক গুরুর সর্ব্বনাশ! প্রচারক প্রচার করেন যে, কেহ এমন হীন নাই, কেহ এমন নীচ নাই,—যে ঈশ্বর তাহার উপাসনা গ্রহণ করেন না। দয়াময় ঈশ্বর সকলেরই পূজা গ্রহণ করেন। অকপট পূজাই তাঁহার অধিক প্রিয়। অকপট চিত্তে পূজা করিলেই ঈশ্বরের প্রীতিভাজন হওয়া যায়। জাতিতে বাধে না, স্থানে বাধে না, কালে বাধে না, সকল জাতি, সকল সময়ে, সকল অবস্থায় ভগবানের নাম লইবার অধিকারী।—ইহা যে কেবল তিনি মুখে বলেন, তাহা নহে, ইহা তাঁহার উপলব্ধ কথা; অকপট চিত্তে তিনি ঈশ্বরকে ডাকিয়া তাঁহার দর্শন পাইয়াছেন। তিনি জোলা হইয়াও (যথা কবীর) চামার হইয়াও (যথা রুইদাস) ঈশ্বরের নামে অধিকারী হইয়াছেন ও নামের গুণে তাঁহার দর্শন লাভ করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টান্তে প্রতীয়মান হয় যে, যে অবস্থায় আমরা বাহ্যিক অশুচি জ্ঞান করি, সে অবস্থাতেও বিভোর হইয়া তিনি ঈশ্বরের গুণ গাহিতেছেন। তাঁহার নাম উচ্চারণ করিবার নির্দ্দিষ্ট সময় নাই;—তিনি সর্দাসর্ব্বদা নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন। এই সকল লোকে দেখে—শেখে। প্রজ্বলিত অগ্নির নিকটস্থ হইলে যেরূপ অঙ্গ উত্তপ্ত হয়, এই ভক্ত প্রজ্বলিত হৃদয় সাধু-সমীপে সেইরূপ ভক্তি উদ্দীপিত হইয়া উঠে। পুষ্পের সৌরভে যেরূপ মধু-মক্ষিকা আকর্ষিত হয়, সেইরূপ নির্ম্মল জীবন-সৌরভে শত শত ধর্ম্ম-মধুপিপাসু আকর্ষিত হইয়া, তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করেন। যাজক-গুরুর শিষ্যের বৃত্তি অপহরণে বিশেষ ব্যাঘাত পড়ে। প্রচারকের ছিদ্র অনুসন্ধান করিতে থাকে। যে শাস্ত্রের প্রতি জীবনে তাহার একবারও আস্থা জন্মে নাই, সেই শাস্ত্র হইতে বেদ-বিরুদ্ধ প্রক্ষিপ্ত শ্লোক সঞ্চয় করে ও প্রমাণ করিবার চেষ্টা পায় যে, প্রচারক কোন ধর্ম্ম-বিরোধী অসুর, পাপ-পঙ্কে মানবকে নিমগ্ন করিবার নিমিত্ত, কলির সাহায্যে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছে। চন্দ্রের অঙ্গে নিষ্ঠিবন নিক্ষেপের ন্যায়, শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্রকে অসুর বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া শ্লোক প্রচার করিয়াছে। উপায় নাই,—ব্যবসা যায়,—অলস-জীবনে গুরুগিরি একমাত্র ব্যবসা শিখিয়াছে;—শিয়ালমভোজী জিহ্বাও রসাস্বাদী,—উপায় কি আছে! প্রচারক ত্বরায় উৎসন্ন না যাইলে, যাজক-গুরুর সর্ব্বনাশ!

এ যাজক গুরু আবার তিন প্রকার,—সকলেই বৃত্তাপহারক। তবে ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ কৃষ্ণের স্বরূপ বা শিবের স্বরূপ,—রমণী মাত্রেই তাঁহার সেবিকা। তাহাকে শিব-ভাবে দেহ অর্পণে সেবা করিলে নারী ভগবতী হইবে ও কৃষ্ণভাবে সেবা করিলে রাধা হইবার সম্ভাবনা। মদ্য, মাংস, ননী, ক্ষীর লইয়া এইরূপ গুরুগিরি চলিতেছিল,

অকস্মাৎ কামিনী-ত্যাগী, মুখে কিছু না বলিয়া দৃষ্টান্তে সমাজকে বুঝাইল যে, ঐ সকল কার্য্যের নাম ব্যভিচার। কে আর নিজের সুন্দরী স্ত্রীকে অপরকে দিতে চায় ? তবে যে শিষ্য তাহার সুন্দরী স্ত্রীকে "শিববৎ" গুরুকে অর্পণ করিয়াছে, সে কেবল প্রক্ষিপ্ত শ্লোকের তাড়নায়। ব্যাভিচারীকে যমের ভয়ে মৌখিক শিব বলিয়া স্ত্রীকে অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছে,—ভ্রমজড়িত ভয়ার্ত্ত হৃদয় অনন্যোপায় হইয়া স্ত্রীকে অর্পণ করিয়াছে। এখন অব্যভিচারী প্রচারকের দৃষ্টান্তে ভ্রম দূর হইল, সুতরাং যাজক-গুরুর রাস-লীলারও ব্যাঘাত পড়িল। আর এক সাটের যাজক-গুরু— তাহারা "মহা মাণ্ডিত",—তাহারা শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিয়া নাস্তিক। বেদের মর্ম্ম যাহাতে চাপা থাকে, তাহাই তাহাদের প্রাণপণ চেষ্টা। পণ্ডিতবর দয়ানন্দ সরস্বতী যখন যজুর্ব্বেদ হইতে শ্লোক উদ্ধৃত করিলেন যে, বেদের মঙ্গলসূচক বাক্য শূদ্রকেও বলিবে তখন তাহাদের মহা বিভ্রাট ঘটিল। মহাপণ্ডিত দয়ানন্দকে তর্কে পারা ভার। নীচজাতি বলিয়াও দোষা যায় না, দয়ানন্দ ব্রাহ্মণ ও বিশুদ্ধ সারস্বত সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাসী;—অর্থের বশ নয়—সত্যের বশ। যাজক-গুরুর অতি ভীষণ শত্রু হইল!

এই তিন সাম্প্রদায়িক গুরুই ধর্ম্মসংস্থাপক প্রচারকের পরম শত্রু। এই ধর্ম্ম সংস্থাপকেরা বৃত্তি অপহরণ করিতে দেয় না, সতীত্ব অপহরণের বাধ্য ও বিদ্যাভিমানীর তীক্ষ্ণ কণ্টক। ধর্ম্ম স্থাপক যাহাতে বিনষ্ট হয়, যাজকের তাহাই পরম চেষ্টা। জাতির খুঁত ধরিতে পারিলেই বড় সহজ হইয়া যায়। রুইদাস চামার—ওর কথা আবার শুনিতে হইবে ?

মানব-করে সূর্য্য আচ্ছাদন করা সহজ, তবু সত্য আচ্ছাদন করা যায় না। অগ্নি প্রদীপ্ত হইলে আলোক প্রদান করে, ইহা অনিবার্য্য। চামার রুইদাসের সত্য-প্রভা এই নিমিত্ত নিবারিত হয় নাই। ঘৃণা, কটূক্তি প্রভৃতি চলিয়াছে, কিন্তু অন্ত ফল ফলে নাই। যাজকের অভীষ্ট সিদ্ধ হয় নাই।

জোলা, চামার লইয়া যাজক ব্যঙ্গ পর্য্যন্ত করিয়াছে, কিন্তু রামানুজস্বামী ব্রাহ্মণ, তাঁহার আবির্ভাবে সে ব্যঙ্গোক্তি চলিল না। যাজক বিব্রত। নাস্তিক প্রভৃতি নানা অপবাদ পরম বৈষ্ণবের উপর নিক্ষিপ্ত হইল। শিবদ্বেষী বলিয়া তাঁহাকে রাজার বিদ্বেষভাজন করিল। শোনা যায় যে, রামানুজের একজন শিষ্যকে রামানুজ জ্ঞানে যাজকেরা চক্ষু অন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু সেই শিষ্যের এরূপ ক্ষমাবান চরিত্র যে, তিনি ধ্যানের সময় ইষ্টদেবের দর্শন পাইয়া ঐ ভীষণ শত্রুর মঙ্গল-কামনায় বর প্রার্থনা করেন। এরূপ চরিত্রকে সাধারণের ঘৃণাভাজন করা যাজকের সাধ্য হইয়া উঠিল না। লোকে রামানুজকে লক্ষ্মণের অবতার জানিয়া পূজা করিতে লাগিল।

বঙ্গদেশে যখন চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব হয়, তিনিও ধর্ম্ম-যাজকের বিষদৃষ্টিতে পড়েন। তাঁহাকে লইয়া কতরূপ ব্যঙ্গ করা হইয়াছিল। উল্লেখ করা হইয়াছে যে, তাঁহাকে ত্রিপুরাসুরের অবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছিল। শত শত দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া দেখান যায় যে, এমন ধর্ম্ম-স্থাপক কেহই অবতীর্ণ হন নাই, যাহাকে

যাজকেরা ঘৃণা-দৃষ্টিতে দেখেন নাই। কাহাকে বধ করিয়াছে, কাহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছে, কাহাকে বা দেশান্তরিত করিয়াছে;—কিন্তু ধর্ম্ম-স্থাপকের ধর্ম্মানুরাগবলে যাজকেরা ধর্ম্ম-স্থাপনের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারে নাই।

এ ধর্ম্ম যাজকেরা কে—তাহা অনুসন্ধান করিলে বুঝা যাইবে যে, যখন সমাজ শিবদ্বেষী হইয়া ধর্ম্মদ্বেষী হইয়াছে, তখন পরম শৈব অবতীর্ণ হইয়া শিবের মাহাত্ম্য স্থাপন করেন। যখন শক্তিদ্বেষী সমাজ হয়, তখন পরম শক্তি অবতীর্ণ হইয়া শক্তির গুণ কীর্ত্তন করেন। বিষ্ণুদ্বেষী সমাজ হইলে বৈষ্ণব আসিয়া বিদ্বেষ ভাব দূর করতঃ বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য প্রচার করেন। ধর্ম্মস্থাপক ধর্ম্ম স্থাপন করিয়া যান। তাঁহাদের শিষ্যেরা সমাজের মান্যভাজন হন এবং সেই সকল শিষ্যের সন্তানেরাও সেই মান্য পাইতে থাকেন। কিন্তু তাঁহারা গুরুর ন্যায় গুণসম্পন্ন নন। এ দিকে দেখিতে পান যে, যে মান তাঁহারা পাইতেছেন, তাহা ভাঙ্গাইয়া অনেক সাংসারিক বাসনা পূর্ণ হইতে পারে;—ইহারাই ক্রমে এই বৃত্তাপহারক গুরু। ইহাদের পরস্পরে মিল নাই, কেবল কোন সাধুর আবির্ভাব হইলে ইহাদের মিলিত হইতে দেখা যায়। কলুষিত শৈব গুরুরা সমদর্শী পরম শাক্তের আবির্ভাব দেখিয়া বৈরী হয়, আবার এই শাক্তের শিষ্যেরা যখন কলুষিত হইয়া বিষ্ণুদ্বেষী হয়, তখন ভেদ-জ্ঞানশূন্য বৈষ্ণবের আবির্ভাবে তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া নানা প্রকার শত্রুতা করিতে থাকে। কালে আবার ঐ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ও কলুষিত হইয়া যায়। বাঙ্গালা দেশে এই কলুষিত দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

বৈষ্ণব সম্প্রদায় বৈষ্ণব শাখা প্রশাখায় যে কিরূপ ব্যভিচার চলে, তাহা অনেকেই অবগত আছেন। কিন্তু একটি আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে, যাজকেরা যে মহাত্মার প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন ও বিধর্ম্মী বলিয়া ঘৃণা করিয়াছে, কালে সেই সকল ব্যক্তিরা অবতার বলিয়া বাচ্য হইয়াছেন; এবং তাঁহাদের মতামত সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের বেদ অনুগত বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছে; এবং যে সকল মত এক সময়ে সনাতন ধর্ম্ম-বিরোধী বলিয়া প্রচারিত হইত, সেই সমস্ত মত লইয়াই আবার কোন ধর্ম্মসংস্কারকের আবির্ভাব হইলে তাহার বিরুদ্ধে ব্যবহার হইয়া থাকে।

আমরা তিন শ্রেণীর ধর্ম্ম-যাজকের কথা উল্লেখ করিয়াছি, আর এক শ্রেণী বর্ত্তমান আছেন, তাঁহারা সকলেই যাজকের পুত্র। পৈতৃক মানে মান্য এবং সেই পৈতৃক মানে চৌর্য্য ব্যভিচারাদি নানা কুৎসিত দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করেন। পৈতৃক মানে মান্য তিনি সমস্ত রাত্রি সেবাদাসীর নিষ্ঠিবন পান করিয়াও প্রণাম গ্রহণ করেন; চুরি করিয়া আক্ষেপ করেন যে, আমি অমুক শুদ্ধবংশজাত, আমি চুরি করিয়াছি—আমায় মার্জ্জনা করুন; অপরাধ-ভয়ে সমাজ মার্জ্জনা করেন। যদি কোন সংস্কারক উঠিয়া বলেন যে, চুরি—চুরিই, তাহার আর অন্য নাম নাই—ব্যভিচার ব্যভিচারই, তাহা অন্য আখ্যাহীন,—তাহা হইলে সেই সংস্কারক নাস্তিক বলিয়া ঘৃণিত হন।

উপস্থিত দেখা যায় যে, চৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবে যাজকেরা যে ভাষায় চৈতন্য সম্প্রদায়ের প্রতি যে সকল কটূক্তি করিতেন, চৈতন্য-সম্প্রদায়ও, চৈতন্যদ্বেষী যাজক সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া, অবিকল সেইরূপ কটূক্তি রামকৃষ্ণ-সম্প্রদায় সম্বন্ধে

করিয়া থাকেন। "দেশ মজালে, দেশ উচ্ছন্ন গেল" এ সকল কথা যেমন চৈতন্য-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উঠিয়াছিল, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস সম্প্রদায় সম্বন্ধে ঠিক সেইরূপ উঠিতেছে। অক্রোধী, নিরভিমানী, কাম-কাঞ্চন-ত্যাগী, বিশ্ববিজয়ী হিন্দুধর্ম্ম সংস্থাপককে, খৃষ্টান, নাস্তিক প্রভৃতি নাম প্রদত্ত হইতেছে। ইহা স্থানীয় দোষ নয়, বাঙ্গালার দোষ নয়, মানবচিত্তের দোষ। স্বার্থ-চালিত যাজকেরা স্বার্থহানির আশঙ্কায়, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বস্থানে এইরূপ গরল উদ্গীরণ করিয়াছে। ঈর্ষ্যাপরবশ গ্লানিপ্রিয় সমাজও, যাহাতে কাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতে না হয়, সেই জন্য ঐ যাজক-উদ্গারিত গরল, সুধা বলিয়া পান করে। কিন্তু সত্যের শক্তি অনিবার্য্য,—কলুষিত, স্বার্থ-বিজড়িত ঈর্ষ্যান্বিত, বংশমানে মান্য, কুচরিত্র পাষণ্ডেরা তাহা কিরূপে বুঝিবে! এবং মহাপুরুষেরা ঈশ্বরপ্রেরিত, তাঁহাদের আবির্ভাব নিস্ফল নয়, তাহা যে অচিরে প্রতীয়মান হইবে, ইহাই বা কিরূপে জানিবে!

['রঙ্গালয়' সাপ্তাহিক পত্র (১৩ই বৈশাখ, ১৩০৮ সাল) হইতে পুনর্মুদ্রিত]

কর্ম্ম

সিদ্ধ কবি গাহিয়াছেন,—"ভাল মন্দ দুটি কথা, ভালটি তার করা ভাল।" এ ছত্রের সার্থকতা সকল জীবনেই উপলব্ধি হয়। ভ্রমবশতঃ আমরা নিশ্চিন্ত হইবার চেষ্টা পাই; কিন্তু অসম্পূর্ণ অবস্থায় নিশ্চিন্ত হওয়া অপেক্ষা আর ক্লেশ নাই। আত্মদর্শনে যাঁহার চিত্ত স্থির হইয়াছে, যাঁহার মন সঙ্কল্প-বিকল্প-রহিত হইয়া নিষ্কম্প দীপের ন্যায় অবস্থান করে, তাঁহারই কেবল কর্ম্ম থাকে না। কিন্তু ইন্দ্রিয় সকল এরূপ চঞ্চল যে, তাঁহারও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য ইন্দ্রিয়েরা করিতে থাকে, তবে সামান্য জীবে কিরূপে কর্ম্ম হইতে অবসর পাইবে? চঞ্চল মহামায়া বা প্রকৃতি বলুন, এক পলের জন্য স্থির নন; বিদ্যা বা অবিদ্যা-শৃঙ্খলে জীবকে আবদ্ধ করিয়া দিবানিশি চালাইতেছেন। এ শৃঙ্খল ছেদ ব্যতীত চঞ্চলতা দূর হইবে না। কার্য্য-শ্রমে ক্লান্ত হইয়া মনে হয়, কত দিনে নিশ্চিন্ত হইব? কিন্তু নিশ্চিন্ত হওয়া দূরে থাক, কিরূপে নিশ্চিন্ত হইব, এই দুশ্চিন্তা শত গুণে চঞ্চল করে। আবার যদি বিচার করা যায়, তাহা হইলে অনুভব হয় যে, আপেক্ষিক অবস্থায় নিশ্চিন্তের নাম মৃত্যু।

আমরা বলি, নিশ্চিন্ত হইব; মনে করি, নিশ্চিন্ত হইতে চাই, কিন্তু বস্তুত তাহা চাহি না, চাহি বিলাস। কিন্তু বিলাসীও স্থির নন, তাঁহারও অন্যের ন্যায় অনবরত পরিশ্রম করিতে হয়। জীবিকা-নির্ব্বাহে যখন শ্রম করিতাম, তখন ভাবিতাম, যথেষ্ট অর্থ পাইলেই শ্রমের হাত এড়াইব, আনন্দে দিন যাইবে। কিন্তু অর্থোপার্জ্জনের পর দেখিলাম, শতগুণে দুর্ভাবনা ও শ্রম বৃদ্ধি হইয়াছে, শ্রমহারিণী নিদ্রাও ক্রমে ক্রমে

পরিত্যাগ করিতেছেন ; অর্থ উপার্জ্জন অপেক্ষা অর্থ রক্ষা করা দারুণ দুঃখের কারণ হইয়াছে। ভাবিলাম—না, যা হয়,—হবে, অর্থ না থাকে, কি করিব, আর ভাবিতে পারি না ; এ অবস্থায়ও শ্রমের হাত এড়াইতে পারিলাম না। কিছু ত করিতে হইবে, কি করি, কি করি, এ এক বিষম দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইল। আমোদ করি, সেও এক মহা বিপদ্ ; কাল যে সকল উপকরণে আমোদ হইয়াছে, আজ আর তাহাতে আমোদ পাই না—নূতন চাই। যেমন অন্নের অভাব ছিল, অন্নকষ্টে দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতাম ; আমাদের উপকরণ-অভাবও তদ্রূপ মহা যন্ত্রণাপ্রদ ; কত পরিশ্রম করিব, সেইরূপই পরিশ্রম করিতে হয়, অভাবও রহিল। অন্নাভাব ছিল, ইন্দ্রিয়ের তাড়না তাদৃশ ছিল না, এখন ইন্দ্রিয়েরা শত-দন্তে দংশন করিতেছে, ভোগে ভোগতৃষা প্রবল হইয়া দিন রাত যন্ত্রণা দিতেছে।

একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি আমায় বলিয়াছিলেন, "সকলে মনে করিয়া থাকে, আমরা সুখী, তা নয় ; অপর অপর শত চিন্তা যদি দূর করিয়া দি, তথাপি কি করি, কি করি— ঘুচে না, ভোগপ্রয়াসে জীবন উপেক্ষা করিয়া, পর-গৃহে প্রবেশ ; জেলখানা শিয়রে রাখিয়া, কুৎসিত চিন্তায় বিব্রত থাকিয়া অহরহ তৃষানলে দগ্ধ হইয়া ভোগ অন্বেষণ করি, তৃপ্তি নাই, কেবলই যন্ত্রণা।" ধনীর এ বাক্যটি সম্পূর্ণ সত্য। দেখিতেছি, কার্য্যে পরিশ্রমের হাত এড়াইতে পারিলাম না। যন্ত্রণা কিঞ্চিৎ লাঘব করিবার কি উপায় আছে ? ব্যাকুল-ভাবে নিজে নিজে এ প্রশ্ন করিলে প্রসন্নচিত্ত গুরু উপদেশ দিবেন, ধীরে ধীরে বিবেকীকে বুঝাইয়া দিবেন—অবিদ্যা এরূপ তীব্র যন্ত্রণা দিতেছেন, বিদ্যামায়ার শরণাপন্ন হও ; এত দিন সুখ অন্বেষণে দুঃখ পাইয়াছ ; আমার অভাব, আমার অভাব ভাবিয়াই দগ্ধ হইয়াছ ; আমার অভাব পূরণে ব্যস্ত না হইয়া অন্যের অভাব পূরণে যত্নবান্ থাক। অবিদ্যা-শৃঙ্খল-জড়িত জীব এ কথা বুঝে না। আমার অভাবের জন্য নয়, কার অভাবের জন্য করিব ? বিবেকী চিত্ত উত্তর করেন, এই ত যন্ত্রণা দেখিলে। এরূপ যুক্তিসঙ্গত কথা একেবারে ধারণা হয় না। মনে মনে নানা অবস্থার সৃষ্টি করিতে থাকি, প্রচুর অর্থ হউক—যেন দস্যু-ভয় থাকে না,—অতি ব্যয়ে যেন ক্ষয় না হয়, যাহা চাই, তখনই যেন তাহা পাই। অবিবেকী মন এই সুখের অবস্থা কল্পনা করে—যে কল্পনা অষ্টসিদ্ধি লাভে উপদেশ দেয়। আমি সে অবস্থা কল্পনা করিয়াছিলাম। বিবেক আমার মনে উদয় হইয়া উপদেশ দিয়াছেন যে, এ দৈত্যের অবস্থা, সখা-শূন্য সংসার। ভস্মাক্ষের ন্যায় একা বসিয়া স্বার্থচালিত শক্তির তাড়নায় ঘোর নরককুণ্ড হৃদয়ে কাটিতে হয়। যাহা চাই, তাহা পাই, এ সুখের বিষয় বটে, কিন্তু একটা দুর্জ্জয় অবস্থা আছে। কি চাই, জানি না ; যাহা যাহা চাহিয়াছি, পাইয়াছি ; আর নূতন কি চাহিব ? এরূপ অবস্থা অষ্ট-সিদ্ধ কেন, অনেক ধনাঢ্য সভ্য প্রদেশে দেখা যায়। এই অভাবে চালিত হইয়া কত শত নরনারী অস্বাভাবিক পাপের সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু তৃপ্তি নাই, পাপই বৃদ্ধি হইয়াছে।

পূর্ব্বে আমি মনে করিতাম, অসুর দমনের নিমিত্ত ভগবান্‌কে এরূপ কষ্ট পাইতে হইয়াছে কেন ? লীলা বলিয়া আমার মনে তৃপ্তি জন্মিত না। এ কথার উত্তর এখন

মনে করি যে, কল্পতরু ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া অসুরেরা দুর্দ্দম হইত, অপরিমেয় শক্তি পাইত। সে শক্তি যদি স্বার্থচালিত না হইয়া নিষ্কামভাবে চালিত হইত, তাহা হইলে সে অসুর দেবত্ব প্রাপ্ত হইত, ভগবানে লয় হইত—ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় মিশাইয়া যাইত। কিন্তু অসুরেরা স্বার্থপর, ভগবান্ নিঃস্বার্থ। অসুর-তাড়নায় জীবের দুঃখে দয়াময় অবতীর্ণ হন, এবং কেবল অনিবার্য্য দয়াশক্তি-প্রভাবে বরপ্রদত্ত আসুরিক দুর্দ্দম শক্তি পরাভূত হইত। অবতারকে নিজশক্তির সহিত সংগ্রামে এরূপ ক্লেশ স্বীকার করিতে হয়।

বিচারে দেখা যায়, রিপুর তাড়নাই দুঃখ, স্বার্থ থাকিলে সে তাড়না ঘুচিবেই না। আবার কলুষিত মন কু-যুক্তি তুলে উপদেশ দেয়—কৈ আমার জন্য কি করিয়াছি, দুটি পেটের জন্য কে ভাবে? পুত্র-কলত্র ও আশ্রিত ব্যক্তির নিমিত্ত ক্লেশ করি। মায়া-মুগ্ধ মন বুঝিতে দেয় না যে, আমারই স্বার্থ শত মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে; আমার পুত্র, আমার স্ত্রী, আমার আশ্রিত, তাহাদের দুঃখে দুঃখ পাইব, এই নিমিত্ত তাহাদের হিত অন্বেষণ করি। পরের পুত্র মরিয়া যদি আমার মুমূর্ষু পুত্র বাঁচে, তাহা আমার সম্পূর্ণ আকাঙ্ক্ষা। যাহারা আমার—তাহারা সুখে থাকুক, আর সমস্ত পৃথিবী কেন ধ্বংস হউক না,—এই মহা স্বার্থ-সাধনকে পরকার্য্য বলি। কিন্তু যুক্তি পরাভূত হইলে মায়া পরাভূত হন না। অবিদ্যা বলিতে থাকেন, স্বার্থ অন্বেষণ করিয়া অন্ততঃ এক দিনও ত সুখ ভোগ করিয়াছ, নিঃস্বার্থ হলে তাহাও ত হইত না। এরূপ মহা ভ্রমকল্পনা অবিদ্যা-মায়াই করিতে পারে। ভ্রমের উপর দুর্জ্জয় ভ্রম—নিঃস্বার্থ অবস্থায় আনন্দ নাই!

বিদ্যামায়া—যাহার অনুগত হইতে ভয় পাও, ভাব, কত কি কঠোর কার্য্য করিতে হইবে; অবিদ্যামায়ার বশীভূত হইয়া সেইরূপ কঠোর কার্য্য করিতেছ। মায়া-জয়-সঙ্কল্পে বিদ্যামায়াচালিত গৃহ-ত্যাগী সন্ন্যাসী দেখিয়া ভাব, এই দেখ—এ নিরাশ্রয়—উঃ, না জানি, আমার এ অবস্থা হইলে কি কষ্ট হইত। যদি ভাবিয়া দেখিতে, বুঝিতে, তাঁহাতে তরুতলে দেখিয়া ভয় পাইয়াছ, কিন্তু গ্রামে গ্রামে তরুতলে বসিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতেছ। বীরপুরুষ! রণক্ষেত্রে ঐ সন্ন্যাসীর ন্যায় বারিধারা ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিয়াছ। ধনী ধন অন্বেষণে, মানী মানের দায়ে, ভোগী ভোগ-বাসনায় বহুদিন এই তরুতল আশ্রয় করিয়াছে, কেবল ঐ ত্যাগী সন্ন্যাসীর সহিত তোমার প্রভেদ এই যে, তিনি ঈশ্বরের উপর আত্মসমর্পণ করিয়া তরুতলে আনন্দধাম করিয়াছেন, আর তুমি অবকাশমত তোমার বাবুইবাসা অট্টালিকায় বসিয়া ভ্রান্ত বুদ্ধি সহায় করিয়া বিপদসাগরে অকূল পাথার ভাবিয়াছ। দেখিতেছ, তৃতীয় প্রহর অতীত, সন্ন্যাসীর অন্ন নাই, তোমারও কাল সমস্ত দিন মকদ্দমায় বিব্রত থাকিয়া উদরে অন্ন যায় নাই, অন্যান্য দিন তোমারও অন্ন আইসে, তাহারও অন্ন আইসে। প্রভেদ, তাঁহার ঈশ্বরে নির্ভর, তুমি অন্ন-চিন্তায় কাতর। ধনরক্ষা-চিন্তা কেবল অন্ন-চিন্তার প্রতিরূপ মাত্র। কিঞ্চিৎ স্থির-চিত্ত হইলেই বুঝা যায় যে, এই সর্ব্বত্যাগী মহাপুরুষের যে সকল কষ্ট মনে মনে কল্পনা করিতেছি, তাহা অপেক্ষা শত গুণে অধিক কষ্ট করি বা না করি, অন্ততঃ জীবন-যাত্রায় তত কষ্ট স্বীকার করিয়াছি ও করিতেছি। গুরু-সেবায় বিরক্তি, পুত্রের

সেবা করিতেছি ; ভগবানের উপাসনা না করিয়া রমণীর উপাসনা করিতেছি ; তীর্থ ভ্রমণের পরিবর্ত্তে নানা দুর্গম স্থানে যাইতেছি ; দেবদর্শনে অনাসক্ত হইয়া ভয়ে আমাপেক্ষা শক্তিমানের দ্বারে ভিক্ষুকের ন্যায় যাইতেছি, ইহা অপেক্ষাও ঘৃণিত অবস্থা কখন কখন হয়। বেশ্যার উপাসনা, রাজ-পুরুষের তাড়না, শৌণ্ডিকালয়ে গমন, কারাগারে অবস্থান হইয়া থাকে। প্রভেদ এই, শান্তির পরিবর্ত্তে হৃদয়ে অশান্তির আগার করি।

যদি বিদ্যামায়ার সংসারে এখন যাহা করিতেছি, তাহাই করিতে হয়, তবে সে অবস্থায় শান্তি কোথায়? শান্তি আছে। এই সকল কার্য্যই করিতে হয় বটে, কিন্তু অপর উদ্দেশ্যে কার্য্য চালিত হয়। শীতকাল, একখানি বস্ত্র আছে ; অবিদ্যামায়ার বশীভূত হইয়া আমি গাত্র আচ্ছাদন করিতে ইচ্ছা করি, এই নিমিত্ত অন্যের সহিত কলহ হয়। বিদ্যামায়ায়ও কলহ আছে,—অপরকে বলি, তুমি আমা অপেক্ষা শীতার্ত্ত হইয়াছ, অতএব তুমি এই বস্ত্রে অঙ্গ আবরণ কর, তিনিও সেইরূপ বলেন, কলহ হয়। পৌরাণিক গল্পে আছে,—শ্রীকৃষ্ণ সমভিব্যাহারে রাজা যুধিষ্ঠির কলি-যুগকে বন্ধনমুক্ত করিবার নিমিত্ত যাইতেছিলেন, পথে দেখেন, একজন ব্রাহ্মণের সহিত একজন কৃষক কলহ করিতেছেন ; হলফলকে সুবর্ণ উঠিয়াছে ; ব্রাহ্মণ বলিতেছেন, "তোমার শ্রমে উঠিয়াছে, তুমি এর অধিকারী।" কৃষক বলিতেছে, "কোথাকার ঠাকুর তুমি, আমি ব্রহ্মস্ব লইব? তোমার ক্ষেত্রের সোনা আমি লইব কেন?" তারপর যখন রাজা যুধিষ্ঠির কলিকে মুক্তি প্রদান করিয়া ফেরেন, দেখেন সেই কলহ। এখন উভয়ে বিপরীত কথা বলিতেছে, ব্রাহ্মণ বলে, "আমার ক্ষেত্র, আমার সোনা।" কৃষক বলে, "আমার শ্রমে উঠিয়াছে, আমিই অধিকারী।" অবিদ্যা ও বিদ্যার কলহ এই।

তবে কি করি, সন্ন্যাসী হই,—এ বৈরাগ্য অবিদ্যামায়ার। মায়াবী রাক্ষসী সুন্দরী সাজিয়াছে মাত্র। এ ভোগ-ইচ্ছায় সন্ন্যাস। গৈরিক পরিধান, জটা বা কেশ মুণ্ডন, সন্ন্যাসের প্রকৃত লক্ষণ নয়। বাসনার তাড়না যিনি অনুভব করিয়া বাসনা-দমনের চেষ্টা করিতেছেন, তিনিই ক্রমে সন্ন্যাসী হইতে পারিবেন, নতুবা গৈরিক-বসন বিড়ম্বনা। একটি থিয়েটারের লোক বলিয়াছিল, "দেখি আর দিন কতক দেখি, যদি প্রোপ্রাইটার ম্যানেজার করে ভাল, নচেৎ পরমহংসের দলে মিশিব।" বাসনা-জড়িত গৈরিক-বসনধারীও সেইরূপ। কামিনী-কাঞ্চনে চিত্ত সমভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে, কিন্তু অভিমান শতগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। পরমহংসদেব বলিতেন, "গৃহীর অভিমান কচু গাছের শিকড়, সহজেই উৎপাটিত হয় ; কিন্তু সন্ন্যাস-অভিমান অশ্বত্থের মূল, কোন ক্রমেই উৎপাটিত হয় না।" তবে কি করিব? জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণের উপদেশ গ্রহণ কর। গৃহী হও, সন্ন্যাসী হও, তাঁহাদিগের উপদেশ ধ্রুব-তারার ন্যায় পথ দেখাইয়া যাইবে। তাঁহারা বলেন, "গৃহী, যাহা করিতেছ কর, স্ত্রী-পুত্রের সেবায় যেরূপ নিযুক্ত আছ—সেইরূপই থাক, কেবল মনে মনে অনবরত চিন্তা কর, তুমি ঈশ্বরের দাস। যেমন পরগৃহে দাসী থাকিয়া পরের সন্তান লালন-পালন করে, তুমিও তাহাই করিতেছ, তোমার ঘর হেথা নয়, এরা সব তোমার নয়, এইটি হৃদয়ে নিশ্চিত করিবার চেষ্টা পাও ; এ চেষ্টায় নিয়ত

ঈশ্বর চিন্তা থাকিবে, বিবেক উদয় হইবে, বিবেক প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিবে,—এ সকল তোমার নয়, অপরের পুত্রের সহিত তোমার পুত্রের প্রভেদ থাকিবে না। যে বিষয়-মোহ তোমায় আবদ্ধ করিয়াছিল, পঙ্ক হইতে পদ্মের ন্যায় কলুষিত হৃদয়ে প্রেমকলিকা ফুটাইবে; স্থান ও ব্যক্তিকে তোমার মমতা আর আবদ্ধ থাকিবে না, তোমার দয়া জগদ্ব্যাপী হইবে; শত্রু মিত্র দুটি কথা ভুলিয়া যাইবে, অতি ক্ষুদ্র জীব তোমার দয়ার অধিকারী হইবে। শোক ও আকাঙ্খারহিত হইয়া ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় তোমার ইচ্ছা লয় হইবে, তখন তুমি সত্ত্বগুণের অধিকারী, গুণ-প্রভাবে গুণ-গরিমা দূর হইবে। তাঁহার কার্য্য তিনি করিতেছেন, তোমার অপেক্ষা নাই; তুমি না থাকিলে সে সমস্ত কার্য্য সমভাবে হইতে থাকিবে,—আমি ইহা করিব, এ সঙ্কল্প আর উদয় হইবে না। যাহা এতদিন ভাবিয়াছিলে—তুমি করিয়াছ, তাহা তিনি করিয়াছেন—দেখিতে পাইবে। আমি ও আমার গরিমা একেবারে পরাভূত হইবে। এই জীবন্মুক্ত অবস্থায় অবিচ্ছিন্ন ভাবে ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিবে। মৃত্যুঞ্জয় অবস্থায় জীবন মরণ সমান।

আবার মনে কূট-তর্ক উঠিতেছে, তবে ত সংসারই ভাল। এই যে গৈরিকধারী তরুতলবাসী—ও ভণ্ড। বিবেক বুঝাইয়া দিবেন, তা নয়। উনি গৈরিক-বসন পরিধান করিয়াছেন, তাহার কারণ এই, আপন চিত্তের দুর্ব্বলতা বুঝিয়াছেন। আমার পুত্র আমার নয়—ভগবানের, এ ধারণা নিয়ত রাখা কঠিন, এই বিচার করিয়া তিনি স্বতন্ত্র অবস্থান করিতেছেন। 'আমার' 'আমার' শব্দ সংসারে অনবরত হইতেছে। আমার নয়, এরূপ ধারণা কিরূপে করিবেন? তাঁহাকে উমাচরণ বলিয়া ডাকিয়াছেন, তিনি উমাচরণ হইয়াছেন; তাঁদের বাটী শুনিয়াছেন, তাঁদের বাটীই জানেন। এ সকল কথা মিছা, যদি তিনি জাগ্রত অবস্থায় সতর্ক থাকিয়া ধারণা করিতে চেষ্টা করেন, তথাপি নিদ্রায় দেখেন, সেই বাল্য-সংস্কার রহিয়াছে। দূরদেশে অবস্থান, আত্মগোপন, অনবরত চেষ্টা, তিতিক্ষা বিবেক ইহাতেও সংস্কারের দাগ ঘুচে না, তাই তিনি স্বতন্ত্র আছেন—দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করিয়া স্বতন্ত্র আছেন, দুর্জ্জয় সংগ্রাম বোধে পলাইয়াছেন;—তিনি অভিমানী নন, ভীত! অর্থ নাড়িতে সাহস করেন না, রমণীর সঙ্গ সর্প-সহবাস জ্ঞান করেন। অশান্ত হৃদয় শান্তির অনুসন্ধান করিতেছে। পরমহংসদেব একদিন তাঁহার এক বালক শিষ্যকে বলেন,—"তোমার শরীরে যেরূপ লক্ষণ দেখিতেছি, তাহাতে তোমার প্রচুর ধন-লাভের সম্ভাবনা, তোমার নিকট ধন থাকিলে ভালই হয়, সদ্ব্যয় হয়, কি বল—ধনী হইবে?" বালক শুনিয়া আকুল,—চরণে ধরিয়া মিনতি করিতে লাগিল,—"ভগবান্ আমায় রক্ষা করুন, আমার যেন ধন না হয়।" কামের তাড়নায় কেহ কেহ ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়া প্রার্থনা করিয়া থাকেন—কিসে কাম যাইবে, কিরূপে কামিনীর কটাক্ষ হইতে পরিত্রাণ পাইবেন? অতি ব্যাকুলভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া উপায় চাহিয়া থাকেন। সেই অর্থ-ভীরু—কামিনী-ভীরু লোকেরাই পরে সন্ন্যাসী হন। কুসুম-শয্যায় লালিত, স্বর্ণপাত্রে পালিত,—হয় ত তোমার আমার দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়ান—ভয়ে, অভিমানে নয়। ইঁহাদের ভণ্ড বলিলে অপরাধ হয়। তাঁহারা সন্ন্যাসী, তথাপি কার্য্য করেন। পরমহংসদেবের উপদেশমত আপনা-

দিগকে ঈশ্বরের দাস জানিয়া তাঁহারা জীবের শুশ্রূষায় ব্যস্ত থাকেন। নর-নারী ভগবানের নানা রূপ, এই ধারণায় তাঁহাদের সেবা করেন। ভিক্ষালব্ধ দুগ্ধ বুভুক্ষুকে দিয়া বুভুক্ষুর সেবায় অবকাশ পাইয়া দ্বারে দ্বারে মাধুকরী করিতে যান। অনবরত কর্ম্ম করিতেছেন, অলসহীন হইয়া কর্ম্ম করিতেছেন, জীবন উপেক্ষা করিয়া পরহিত-চিন্তায় নিযুক্ত আছেন। সুখ দুঃখ জীবন-ধারণে অনিবার্য্য অবস্থামাত্র জানেন, সুখে স্পৃহা, দুঃখে বিদ্বেষ আর নাই ; তবে পরহিতে জীবন অর্পিত ; অতএব সুখ দুঃখ পর-কার্য্যই অনুভব করেন। শান্তিদেবী তাঁহাদের হৃদয়ে বসিয়া আছেন, যাঁহার দাস, তাঁহারই কার্য্য করিতেছেন, কার্য্যে শক্তি তিনিই দিতেছেন ; আপনাকে দুর্ব্বল জানেন, সুতরাং যখন কোন মহৎ কার্য্য-সাধনে সক্ষম হন, ভগবানের হস্ত দেখিতে পান, আর অভিমান থাকে না। যদি কখন অশান্তি হয়, তাহার কারণ পরহিতে ব্যাঘাত। আপনাদিগকে সেতুবন্ধে কাষ্ঠ-বিড়াল জ্ঞান করেন, কার্য্যে অধিকারী হইয়াছেন, ইহাতে তিনি শত সহস্র ধন্যবাদ দেন। কার্য্যফল উপেক্ষা করিয়া কার্য্যই তাঁহাদের প্রিয়। পাকা ফলের ন্যায় যখন কার্য্যবন্ধন খসিয়া পড়িবে, তখন ত্রিগুণাতীত হইবেন ; এখন কার্য্য করেন, কিন্তু কোন আকাঙ্ক্ষা নাই। একদিন বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, তিনি কর্ম্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত, সেই যুদ্ধে মৃত্যু তাঁহার অভিলাষ, কর্ম্ম করিতে যেন তাঁহার শ্বাস-রোধ হয়। যিনি কর্ম্ম না করিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করিতে চান, যাঁহার কর্ম্ম আপন হইতে ঘুচে নাই, অথচ কর্ম্মত্যাগী অভিমান করেন, তিনি ঘোর তমোগুণে আচ্ছন্ন। ভগবান্ রামকৃষ্ণের এরূপ কর্ম্মস্পৃহা বলবান্ ছিল যে, একদিন জাহ্নবী-জলে দেখেন, পিতৃলোকের তর্পণ করিতে গিয়া তাঁহার করপুটে জল থাকে না, কাঁদিয়া আকুল, যাকে তাকে কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, এ আমার কি হইল ? কর্ম্মক্ষয় করিয়াছেন, তথাপি কর্ম্ম করিতেছেন। অতি কঠোর কর্ম্ম—জীবন উপেক্ষা করিয়া জীবকে পরমার্থ দান। নির্ম্মল চরণ পাপীর স্পর্শে দগ্ধ হইয়া যাইত, তথাপি শ্রীচরণ সকলের নিমিত্ত ছিল। মুখ দিয়া শোণিত উঠিতেছে, শিক্ষাদানে বিরত নন। জীবের দুঃখে দুঃখিত, সঙ্কল্পরহিত মনে শত শত জন্মগ্রহণ সঙ্কল্প।

অবিবেকী মন, ভাবিতেছি, কি করিব ?—সন্ন্যাসী হই। কিন্তু পরমহংসদেব বলিতেন, "যে মূঢ় বাসনা থাকিতে গৈরিক বসন পরিধান করে, তার ইহকালও যায়, পরকালও যায়।" যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জ্জুন শরাসন ত্যাগ করিয়া কমণ্ডলু ধারণ করিতে চান, কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে নিবারণ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ ইহার একটি চমৎকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্জ্জুন যখন যুদ্ধে বিরত হইতে চান, তখন তিনি তমোগুণে আবদ্ধ। তাঁহার কণ্ঠ শুষ্ক, মুখ অপ্রসন্ন, ভয়ে হৃদয় কম্পিত হইয়াছিল। এ সকল তমোগুণের লক্ষণ। ভগবানের উপদেশে তাঁহার তমঃ দূর হইল ; রজোগুণে যুদ্ধ করিলেন। ভগবান্ তাঁহার ভয় নাশ করিবার জন্য তাঁহাকে বিশ্বরূপ দেখান। অর্জ্জুন তাহাতে দেখিতে পান যে, তাঁহার বিপক্ষেরা মৃত, যাহাকে তিনি মহাবলশালী বিপক্ষ জ্ঞান করিতেন, যে অস্ত্রধারী বীরপুরুষগণকে দুর্জ্জয় জ্ঞান করিয়াছিলেন দেখেন, তাহারা হত হইয়া রহিয়াছে, আর তাহাদিগকে বধ করিতে হইবে না, তিনি নিমিত্ত মাত্র,–

তাঁহার চিত্ত-শুদ্ধির নিমিত্ত কার্য্য। কার্য্য ব্যতীত চিত্ত-শুদ্ধি হয় না, এই জন্যই কার্য্য, নতুবা প্রয়োজন নাই। গীতা শুনিয়া এ সমস্তের আভাস পাইয়াছিলেন, কার্য্য করিতে লাগিলেন; কর্ম্মে কর্ম্ম ক্ষয় হইয়া গোড়ো গোয়ালার নিকট কৌরববিজয়ী বিজয় পরাস্ত হইয়া নিশ্চিত করিলেন, শক্তি তাঁহার নয়, কৃষ্ণের শক্তিতে তিনি বিশ্ববিজয়ী ছিলেন। তাঁহার সত্ত্বগুণ উপস্থিত হইল, সন্ন্যাসের উপযুক্ত হইয়া মহাসন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

আমি গৃহী, তমোগুণপূর্ণ, আলস্যে অভিভূত হইয়া ভয়ে নিঃস্বার্থপরতার ভাণ করিয়া সহস্ত-সন্ন্যাস স্বার্থ-তৃপ্তির নিমিত্ত যদি গ্রহণ করি, তাহা বিড়ম্বনা। ত্যাগী জ্ঞানে নরপতিপদে শির নুয়াইবে, অর্থ দিবে, বিদ্যাধরীগঞ্জিনী রাজরাণী পদসেবা করিতে নিভৃতে রজনীযোগে আসিবে, সাধু ব্যক্তি প্রণাম করিবেন, এ সকল সহ্য করিবার শক্তি বাসনা-জড়িত ব্যক্তির নাই। ইহকালেই তাহার দণ্ড আরম্ভ হইবে। সমাজঘৃণিত, ধর্ম্মবর্জ্জিত কারা-মৃত্যুর সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ইহকাল পরকাল উভয়ই যাইবে। এ দৃষ্টান্ত চক্ষের উপর সকলেই দেখিতে পান। সংসারে ভণ্ডামি করিয়া বরং চলে, তাহার উপায় আছে, কিন্তু সন্ন্যাসীর ভাণে, ঈশ্বরের সহিত বঞ্চনা, চক্রীর সহিত চক্র, মূঢ় ব্যতীত এরূপ সাহস কেহ করে না। পৌরাণিক কথা আছে যে, শ্রীরামের সহিত সংগ্রামে কাতর হইয়া রাবণ অম্বিকার শরণাপন্ন হন, অম্বিকাও আশ্রয় দেন। কিন্তু মহাদেব বলিলেন, "দেবি, সরিয়া আইস।" রাবণ উত্তর করেন, "দেব-দেব, আমি ত চিরদিনই আপনার সেবক, আমার প্রতি বিরূপ কেন?" মহাদেব বলেন, "পাপিষ্ঠ, তুই যদি সম্মুখ-সমরে রামকে আহ্বান করিয়া সীতাহরণ করিতে যাইতিস, আমি শূল হস্তে লইয়া তোর সহায় হইতাম। দেবকন্যা, নাগকন্যা-হরণ করিয়াছিস্ আমারই বলে, ইহাতে আমি বিরূপ হই নাই, কিন্তু সন্ন্যাসীর ভাণ করিয়া কুলাঙ্গনা অপহরণ করিয়াছিস্,—তোর বিনাশ নিকট; তোর কার্য্যে সন্ন্যাসীকে আর গৃহস্থ বিশ্বাস করিবে না, তোর পূজা আর আমি গ্রহণ করিব না।"

সন্ন্যাসী না হইয়াও আমারও উপায় আছে। ধর্ম্মের নিমিত্তই ধর্ম্মের শরণাপন্ন হই, সাধ্যমত সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করি; আমি দুর্ব্বল বটে, ধর্ম্ম আমায় বল দিবেন। দেখাদেখি সন্ন্যাসের ভাণ করিব না, তাহা হইলে লাভেমূলে সমস্তই হারাইব। একটি গল্প আছে—একজন কাঠুরিয়া নদী পার হইতে হইতে তাহার কুঠারখানি জলে পড়িয়া যায়, কাতর হইয়া বিশ্বকর্ম্মার নিকট প্রার্থনা করিল, "দেব, আমার জীবন-উপায় কুঠারখানি দাও।" একখানি রূপার কুঠার ভাসিয়া উঠিল। কাঠুরিয়া দেখিল, কুঠার তার নয়। সে তাহার দেবতাকে বলিল, "এ কুঠার আমার নয়, আমার খানি দাও।" রূপার কুঠার ডুবিয়া সোনার কুঠার ভাসিল। কাঠুরিয়া আবার সেইমত বলিল। অবশেষে আপনার কুঠারখানি ভাসিতে দেখিয়া পরম আনন্দে গ্রহণ করিল। বিশ্বকর্ম্মা সন্তুষ্ট হইয়া সেই স্বর্ণ-রৌপ্য-কুঠারও তাহাকে দিলেন। অপর একজন কাঠুরিয়া তাহা দেখিয়াছিল। তাহার কুঠারখানি জলে ফেলিয়া দিয়া বিশ্বকর্ম্মার নিকট প্রার্থনা করিল, রূপার কুঠার উঠিল, সোণার কুঠার উঠিল লোভী কাঠুরিয়া আমার নয়, আমার নয়,

বলিল। পরে তাহার নিজের কুঠার ভাসিয়া উঠিলে লইতে যায়, মনে ভাবিতেছে, অপর দুইখানিও পাইবে, তাহার কুঠারখানি ডুবিয়া গেল। দেখাদেখি সন্ন্যাসের এরূপই ফল হইয়া থাকে ;—ফলাকাঙ্ক্ষায় নির্ম্মল কার্য্য হয় না।

অবিদ্যা বারাঙ্গনার ন্যায় হাব-ভাব প্রকাশ করিতেছে। প্রকৃত বারাঙ্গনার হস্তে পরিত্রাণ আছে ; যেখানে তাহারা থাকে, সে স্থান পরিত্যাগ করিলে হয়, হাব ভাব না দেখিলে হয়, কুৎসিৎ রোগের ভয়ে, লোকলজ্জায়, ঘৃণায়—অনেকে পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হয় ; কিন্তু এ নটি তোমার বাসনা। দিবা-রাত্র যাহাকে ধ্যান করিয়াছ, নিদ্রার সময় যাহাকে ইষ্ট স্মরণ ত্যাগ করিয়া আদরে বক্ষে ধরিয়া নিদ্রা গিয়াছ, যাহার নিমিত্ত ভগবান মোক্ষ-প্রদ হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলে ভয়ে পলায়ন কর, এ নটী তোমার বাসনা, সুন্দর বেশ-ভূষা করিয়া তোমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। আশা দূতীবেশে কত কথা কহিয়াছে, কল্পনা কতই সম্ভোগ রচনা করিয়াছে, তাহাকে পাইবার সমস্ত সুযোগ উপস্থিত, হাত বাড়াইলেই পাও, কিন্তু নটী সরিয়া দাঁড়াইল। ধরি ধরি ধরা যায় না! ধরা দিলে দেখ, অতি কুৎসিতা। কিন্তু বহুরূপিণী আবার অন্য-মনোহরিণী রূপে সম্মুখে দণ্ডায়মানা। আবার ছুট, আবার ঐ ফল। ফলাকাঙ্ক্ষার অর্থই, কুৎসিতা বারাঙ্গনা অবিদ্যা-মায়ার উপাসনা। ফল-কামনায় ধর্ম্ম কর—ধর্ম্ম বিশ্বাসঘাতক নন—মুটে বিদায় করিবেন। মনে কর, একবার ধন-কামনায় ধর্ম্ম করিয়াছ, ধন পাইবে, সংসারে ধন অতি অবিদ্যাবলশালী। ধন পাইয়াছ আর ধর্ম্মের উপাসনা নাই। ইহাই নিত্য প্রত্যক্ষ দেখিতে পাও। দেখিতে পাও, অনেকেই ধনমদে ধর্ম্ম ভুলিয়াছেন। তোমরাও ভুলিবার সম্ভাবনা। যাহাতে লোক মুগ্ধ থাকে, সেই সমস্ত তাহার সর্ব্বস্ব হয়, অন্য চিন্তা স্থান পায় না। এ কথাটি বালককেও যুক্তি দিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। একদিন পরমহংসদেব আমায় বলেন যে, মাড়োয়ারীরা তাঁহাকে প্রলোভন দেখাইতে আসিয়াছিল। বলে, "টাকা দিতেছি, আপনি ভাণ্ডারা খুলুন, এ টাকা ত আপনার নিমিত্ত নিতেছেন না, তবে আপত্তি কি ?" এ কথা শুনিয়া পরমহংসদেব বলিলেন, "আমি বল্লুম, 'না'।" আমি বুদ্ধিমান্, জিজ্ঞাসা করিলাম, "মহাশয়, এতে আপত্তি কি ?" তিনি ভঙ্গী করিয়া বলিলেন—যে ভঙ্গী তাহাতেই দেখিয়াছি যে ভঙ্গী আর দেখি নাই, দেখিবও না, যে ভঙ্গী অনন্ত কালস্রোতে কেহ কখন দেখে নাই—ভঙ্গীর সহিত পরমহংসদেব বলিলেন, (সে মনোহর ভঙ্গী এখনও চিত্তে অঙ্কিত রহিয়াছে) বলিলেন, "ও মনে পড়বেক, আবার আসতে হবেক্।" যে মহাত্মা জীবের দুঃখে কাতর হইয়া শত শত জন্মগ্রহণে কৃতসংকল্প, সুকর্ম্ম-ফল-ভোগের নিমিত্ত তাঁহাকে দেহধারণে কুণ্ঠিত দেখিলাম।

তিনি উপদেশ দিতেন, সে উপদেশের মর্ম্ম আমি যাহা বুঝিয়াছি, তাহা বলি। তিনি ধ্যান করিতে বলিতেন ; ধ্যান করিতে করিতে কুক্কুর, বিড়াল, বাঁদর, বেশ্যা, লোটো, জুয়াচোর, রাক্ষস, পিশাচ, দানবের মূর্ত্তি সম্মুখে উপস্থিত হইলে, তাহাতে বলিতেন, ভয় করিও না, ধ্যানে বিরত হইও না, বহুরূপী ঈশ্বরের মূর্ত্তি দেখিতেছ মনে করিবে, কিন্তু যদি কোন বাসনা উপস্থিত হয়, জানিবে, তোমার ধ্যানে মহাবিঘ্ন

হইয়াছে, ধ্যান ভঙ্গ করিয়া কাতরে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবে, 'ভগবান, আমার এ বাসনা পূর্ণ করিও না।' ধ্যানস্থ বাসনা আশুফলপ্রদ হয় সে ফল অতি কুফল। অবিদ্যার ফল—মানবকে নিরয়গামী করিবার ফল। কুতর্ক উঠিয়া মনকে বলিতে থাকে, ফলের কামনায় ঈশ্বর-উপাসনা করিব না, তবে কেন তাঁর উপাসনা? ধন পাইব, মান পাইব, নরনারী দাসদাসী হইবে, এই ত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, সিদ্ধ পুরুষের ত ইহাই হইয়া থাকে, আর কি হয়? ইহাই হয় সত্য, যাহা সংসারী জীব বাসনা করে, ঈশ্বর-সেবায় তাহাই পায়, কিন্তু সে তাহা পাইয়াছে কি না, তাহা জানে না, যদি জানে, জানিলেও কিছু তৃপ্তি নাই। কি এক পরম তৃপ্তি পাইয়াছে, তাহাতে তাহার সকলই তুচ্ছ, ঈশ্বরের সেবায় তাহার আনন্দ, শিশুর পিতা মাতার সেবার ন্যায় তাহার আনন্দ: শিশু দেখে তাহার পিতার ভোজনের সময় ভৃত্য আসিয়া ব্যজন করে, সেও আনন্দে পাখা হাতে করিয়া ভৃত্যের উপর ঈর্ষ্যা করিয়া ব্যজন করিতে গিয়া পাখা গায়ে মারিয়া কি একটি অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করে; তাহার পিতাও ব্যজন পরিবর্ত্তে পাখার আঘাত খাইয়া আনন্দে পরিপূর্ণ হয়, সেই শিশুর কথা যেথা সেথা বলে, শিশুকে নানাবিধ বসন-ভূষণ ভোজ্য-সামগ্রী দেয়, কিন্তু তাহাতে শিশুর লক্ষ্য নাই; ভোজন অন্তে ভৃত্য পদসেবা করিতেছে, টর টর করিয়া আসিয়া পদসেবা করিতে বসে, পদসেবা না করিতে পাইলে তাহার ক্ষোভ। সে সেবা করে, পিতা হাসে, সেও হাসে, আনন্দে পরিপূর্ণ হয়। জগৎ-পিতার সেবকও সেইরূপ। পিতার সেবায় নিমিত্ত কোটি কোটি দেবদূত উপস্থিত আছে, পিতার সেবার প্রয়োজন নাই। তথাপি সেবক সেবা করিতে যায়। আনন্দময় পিতা আনন্দে হাসেন, সেবকও আনন্দে হাসে; মান, মর্য্যাদা, ধন, যাহা আনন্দময় পিতা তাহাকে আনন্দে বিতরণ করিয়াছেন, তাহার প্রতি তাহার ভ্রূক্ষেপও নাই। বালভাবাপন্ন ঈশ্বর-সেবক সেবায় কি আনন্দ, কেবল তিনিই বুঝেন; এ জগৎ-পিতার বালক পিতৃসেবার প্রয়াসী, আনন্দময় পিতৃসেবায় আনন্দময় হইয়া বেড়াইতেছে। তত্ত্ববিৎ হিউম (Hume) সাহেব বলেন যে, সৎকার্য্য এতই সৎ, তাহাতে ঐহিক এত আনন্দ যে, পাদ্রীরা তাহার পারমার্থিক ফল কেন বর্ণনা করেন, তাহা বুঝিতে পারেন না। এ কার্য্যই ত আনন্দ, যিনি সৎকার্য্যশীল, এ কথার মর্ম্ম কেবল তিনিই বুঝিতে পারেন; পাপের পথ যে কণ্টকময়, তাহা সকলেই জানেন, কিন্তু বহুরূপিণী মায়া মনোহরণ করিতেছেন মুগ্ধচিত্ত কাঁটার উপর ছুটে, পিশাচী জানিয়াও পিশাচী বলে না—মুগ্ধচিত্ত বিবেক-রহিত।

যৌবন-পদার্পণে, ভোগ্য বস্তু দর্শনে, আশার প্রলোভনে সংসার সুখাগার ভাবি। মায়ার বৈষম্য উপলব্ধি হয় না, বুঝিতে পারি না যে, সুন্দর সংসার মৃত্যুর ক্রীড়াস্থল। ক্ষয়ের নাম বৃদ্ধি; যতই দিন যায়, ততই মৃত্যুর নিকট অগ্রসর হই। সুখ—দুঃখের সূচনা মাত্র। দেখিতে পাই, যে সকল বস্তু আমার প্রয়োজন বিবেচনা করি, ধন-বিনিময়ে তাহা পাওয়া যায়; কিন্তু ধন হইলে ধনের মায়ায় ধন বিনিময় করিতে পারিব কি না, সে সকল বস্তু ভোগের শক্তি আছে কি না, ভোগের শক্তি থাকিলে সে সকল সুখপ্রদ কি না, এ সকল প্রশ্ন হৃদয়ে উঠে না। ধনই একমাত্র কামনা হইয়া

উঠে। ভোগের নিমিত্ত, সঞ্চয়ের নিমিত্ত, মানের নিমিত্ত, সংসারে সমস্ত প্রয়োজনের নিমিত্ত ধন সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় হয়। কিন্তু চিত্তের তমোগুণ বশতঃ তাহা সুলভ পরিশ্রমে অর্জ্জন করিতে চাহে। কেহ বা যথাসাধ্য পরিশ্রম করে, পরিশ্রমে কাতর না হইয়া নিয়ত কার্য্যে বিব্রত থাকে, কিন্তু কার্য্যের এমনই গুণ, সকাম কার্য্য হইলেও অনেক পাপস্পৃহা নিবারণ করে। শ্রমী লোক মিথ্যাকথা, মিথ্যা গল্প, পরচর্চ্চা অহেতু পরের অনিষ্ট-কল্পনা, জুয়াচুরি, ঠক-বৃত্তি প্রভৃতি কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র থাকেন। যিনি যথার্থ কার্য্যকুশল, তিনি অনেকটা বুঝিতে পারেন, নীতি-বিরোধী হইলে কার্য্যে তাদৃশ সুফল ফলে না ; ষোল আনা দেওয়া-নেওয়া করেন, নিজ লাভের নিমিত্তই প্রতারণা করেন না। সকাম কার্য্যে যদি এরূপ হয়, তবে নিষ্কাম কার্য্যে যে অমৃত উঠিবে, তাহাতে সন্দেহ কি ? আপত্তি উঠে যে, আমার পুত্র-কলত্র ভাসাইয়া দিয়া কি নিষ্কাম কর্ম্ম করিব ? পরমহংসদেব উপদেশ দিয়াছেন, সত্য, যে ঈশ্বরের কার্য্য ভাবিয়া কার্য্য করিব,'' কিন্তু পরকে আপনার পুত্রের ন্যায় কিরূপে করিব ? চেষ্টা, আর অপর উপায় নাই। তুমি যদি নিষ্কাম কার্য্য কর, তাহাতে যদি অমৃত লাভ হয়, তোমার পুত্র-পরিবারও তোমার দৃষ্টান্তে নিষ্কাম কার্য্যে ব্রতী হইয়া আনন্দের অধিকারী হইবেন। সকাম হইয়া পরিবারের জন্য অর্থ রাখিয়া যাইতে চাও, কিন্তু নিত্য প্রত্যক্ষ দেখিতে পাও যে, সংসারে সকলেই অর্থ রাখিয়া যায়, কিন্তু যাহাদের নিমিত্ত রাখে, প্রায় তাহাদের ভোগ হয় না। যদি কোন উত্তরাধিকারী ধন-রক্ষায় সমর্থ হন, দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি যকের ন্যায় ধন রক্ষা করিতেছেন এবং শত শত কুকার্য্য করিতেছেন, যাহার জন্য তুমি দায়ী। দেখিতে পাইবে, স্ত্রীর নিমিত্ত ধন রাখিয়া গিয়া অনেকেই পিতৃপিতামহের আবাস ব্যভিচারের বিহারস্থল করিয়াছেন, পুত্রকে ধন দিয়া লম্পট, পরপীড়ক; অত্যাচারী করিয়াছেন। অর্থ-দানে দুষ্কর্ম্মান্বিত উত্তরাধিকারী প্রায় দেখিতে পাইবেন, কিন্তু যে মহাত্মা নিজের সন্তানের নিমিত্ত নিষ্কাম ধর্ম্ম রাখিয়া গিয়াছেন, যাঁহার উত্তরাধিকারী এই অতুল সম্পত্তি করগত করিয়াছেন, তিনি আপনার হিত, উত্তরাধিকারীর হিত, জগতের হিত, পরহিত উদ্দেশ্যে, হিতকারী দৃষ্টান্তে মহাহিত-সাধনে সক্ষম হইয়াছেন। তিনি যথার্থ মানবদেহ ধারণ করিয়াছিলেন। পশুর সহিত কেবল তাঁহারই মনুষ্যত্ব প্রভেদ, নচেৎ স্বার্থদ্বারা পাশব কার্য্য ব্যতীত অন্য কোন কার্য্য হয় না, যিনি মনুষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে চান, মনুষ্যত্ব যাঁহার আকাঙ্ক্ষা তিনি নিষ্কাম কার্য্যের আদর করিবেন।''

উপসংহারে আমার ভক্তের চরণে প্রার্থনা, যেন কার্য্যে আমার অধিকার হয়, কিন্তু ফলাফল ঈশ্বর-চরণে অর্পণ করিতে পারি। আমি মনে মনে নিশ্চয় বুঝিয়াছি, আমি যতই কেন নিষ্কাম কার্য্যের চেষ্টা করি না, আমার কলুষিত মন অতি সৎকার্য্যের সহিত দোষ মিশ্রিত করিবে ; ফল ত আমার আয়ত্তাধীন নয়। সুফল ফলিবে বিবেচনায় কার্য্য করিতে গিয়া কত অন্যায় ফল ফলিয়াছে, তাহা বর্ণনা করা যায় না। চোর অন্যের বাটীতে চুরি করিতে আসিয়াছে, তাহাকে জীবন উপেক্ষা করিয়া ধরিলাম, জেলে দিলাম, তাহাদের পরিবারবর্গকে অনাথ করিলাম ; দয়া করিয়া একজনকে

চাকরি দিলাম, কর্ম্মক্ষম শত ব্যক্তিকে বঞ্চিত করিলাম; নিষ্কাম কার্য্য করিবার চেষ্টা করিলে সক্ষম হই না, আমার মন কলুষিত। নিষ্কাম কর্ম্ম মুখে বলা যায়, কিন্তু দেখিতে পাই, কেবল ঈশ্বর দেহ ধারণ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে পারেন। অতএব কার্য্যের ফল যেন আমি ঈশ্বর চরণে অর্পণ করি। অতি কঠিন কার্য্যে সক্ষম হইয়া যেন কার্য্যগরিমা না রাখি। শাস্ত্রে শুনিতে পাই,—ইন্দ্র, অগ্নি, পবন কার্য্যের গরিমা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভগবান্ তাঁহাদিগকে দেখাইয়া দেন যে, তাঁহাদের একটি তৃণের উপরও অধিকার নাই। সত্যই, কাহারও কার্য্যের উপর অধিকার নাই। নিজ-জীবন সমালোচনায় পদে পদে তাহার উপলব্ধি হইবে। আমি কর্ত্তা নই, আমার ইচ্ছামত কোন কার্য্য হয় নাই, একটু স্থিরচিত্ত হইলেই বুঝিতে পারা যায়। ঈশ্বর আমায় কার্য্যে অধিকার দিন, কিন্তু ফলাফল ও কার্য্যগরিমা তাঁর, আমার যেন স্বপ্নেও না বলি।

[রামকৃষ্ণ' মিশনে-পঠিত ও উদ্বোধন পাক্ষিক পত্রে (১ম বর্ষ, মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩০৫ সাল) প্রথম প্রকাশিত]

"তাও বটে—তাও বটে"

পরমহংসদেব বলিতেন,—"তাও বটে তাও বটে!" এই সামান্য কথায় কত জটিল তর্কের মীমাংসা হইয়াছে। এক দিন একজন শিষ্য সাকার নিরাকার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিল। সাকার নিরাকার সম্বন্ধে ভগবান রামকৃষ্ণ বলিলেন,—"তাও বটে—তাও বটে, আর যদি কিছু থাকে,—তাও বটে।" এই কথা শ্রবণে, উপস্থিত শ্রোতার মনে যে কি বিপুল ভাবের বিকাশ পাইল, তাহা আমি অকপটে বলিতেছি—আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম। তাঁহার মুখে কথাটি শুনিয়া মনে উদয় হইল যে, ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের গোচর, মনের গোচর ও মনোবুদ্ধির অগোচর,—একেবারে তিনটি ভাব ফুটিয়া উঠিল। যেন বিশাল ভবার্ণবে ডুবিয়া গেলেন! এই ক্ষুদ্র কথায় বৃহৎ বস্তুর বৃহৎ আভাস আসিয়া উদয় হইল। শুষ্ক তার্কিক বুঝিল, যে সাকার-নিরাকার এই দুই বিশেষণে সেই বৃহৎ বস্তু বিশেষিত হয় না। তিনি বলিলেন, "তাও বটে—তাও বটে,—আর যদি কিছু থাকে—তাও বটে"। "আর যদি কিছু থাকে—তাও বটে,"—এ কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করিব ভাবিলাম, কিন্তু আর জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। সেই পরম গুরু রামকৃষ্ণের প্রভাবে উত্তর আপনি হৃদয়ে উঠিল। বুঝিলাম, আমি অতি ক্ষুদ্র, মনোবুদ্ধিতে যাহা উঠে, তাহাই বুঝিতে পারি, ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝিবার আমার শক্তি নাই। সেই স্বরূপ বুদ্ধি উদয় হইলে, মনোবুদ্ধি লয় পাইবে। এই লয়ের নাম নির্ব্বাণ। নির্ব্বাণ যে পরমানন্দের কথা, তাহার আভাস পাইলাম। পূর্ব্বে জানা ছিল, যে, শুষ্ক

জ্ঞানপন্থীরা নির্ব্বাণের অধিকারী হন, কিন্তু এ নির্ব্বাণ আর একটা স্বতন্ত্র কথা। এ অতি সরস নির্ব্বাণ,—রসের সাগরে ডুবিয়া নির্ব্বাণ—মধুর নির্ব্বাণ—প্রার্থনীয় নির্ব্বাণ। ভক্তি-স্রোত যে মহাসাগরে ধাইতেছে,—সেই মহাসাগর মাঝে নির্ব্বাণ। আশ্চর্য্য গুরু—আশ্চর্য্য উপদেশ! জ্ঞান-ভক্তির পার্থক্য লইয়া বিচার একেবারে দূরীভূত। ইহাতে "চিনি হওয়া—চিনি খাওয়ায়" তর্ক নাই। আনন্দ-সাগরে আনন্দময় হওয়া, আনন্দসাগরে আনন্দ আস্বাদ করা—উভয়েই এককালে।

প্রভুর আর একটি কথার সহিত ইহার সুন্দর সামঞ্জস্য অনুভূত হইল। গুরু বলিতেন,—"তিনি রস,—আমরা রসিক।" কথাটি কি আনন্দময়! কথাটি শুনিয়া আমি প্রথমে বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু যে দিন—"তাও বটে—তাও বটে, আর যদি কিছু থাকে, তাও বটে।" এই কথাটি শুনিয়া রস কি তাহা বুঝিলাম, তখন সে রসে রসিক হওয়া কি, তাহারও আভাস পাইলাম। মনে উঠিতে লাগিল যে, সে রসের রসিকের কর্ণে সাংসারিক কলরব উঠিবার সম্ভাবনা নাই। সংসার মায়া কি নয়—এ কথা লইয়া কে মাথা ঘামায়? কেন সৃষ্টি হইল,—কেন সংসার এমন? এ পুত্র—এ কলত্র,—এ কথা কে কাণে তোলে? কে ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখে? গুরু বলিতেন,—"কে জানে তোর গাঁই গুঁই। বীরভূমের বামুন মুই।" দেখিলাম—গাঁই গুঁই জানিবার প্রয়োজন নাই। উপদেষ্টারা আসিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন,—"এ ত্যাগ কর, ও ত্যাগ কর। এরূপ হও—সেরূপ হও!" এ সব গাঁই-গুঁই আর কিছু প্রয়োজন নাই। সে রসোন্মত্ত—সে আর ত্যাগ করিবে কি? রস-সাগরে রস পান করিতেছে; কি তার আছে বা না আছে,—কি ছিল বা না ছিল,—জরা-মৃত্যু প্রভৃতি যাহার ভয়ে সংসার অভিভূত—এ সকলের ধার সে রসোন্মত্ত ধারে না। সে উন্মাদ-মাতাল!—সে ও সকল কথাই বুঝিতে পারে না। "জগদীশ্বর" এ নামের সহিত এ রস। এ নামের সহিত এ ভাব-সাগর। নামে যে মহাভাবে আচ্ছন্ন হইতে হয়,—সে আচ্ছন্ন অবস্থায় হৃদয়-ক্ষেত্রে বাসনা উঠা অসম্ভব।

"তাও বটে—তাও বটে, আর কিছু যদি থাকে—তাও বটে।" 'আর কিছু যদি থাকে,' এ কথা মনে আনিতে গেলেই মন গলিয়া যায়! চিন্তাতেই চিত্ত স্থির হয়। আর যদি কিছু থাকে—সেও কি? সাকার নয়—নিরাকার নয়—সে কি? যেন কোন বিশাল রাজ্যে গিয়া উপস্থিত হই, সে দেশে রজনী নাই, চেতন অচেতন অবস্থার ভেদাভেদ নাই,—বিপুল রাজ্য—অনন্ত রাজ্য—নির্ব্বাক রাজ্য! ঈদৃশ ভাবাপন্ন হইয়া আমি মূঢ় বুদ্ধিকেও বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, "মন্ত্র মূলং গুরুর্বাক্যম্" এবং গুরুর বাক্য গুরু-কৃপায় ধারণা হয়। সেই নিমিত্তই—"মোক্ষ মূলং গুরোঃ কৃপা।"

বঙ্গ-রঙ্গালয়ে শ্রীমতী বিনোদিনী

বঙ্গ-রঙ্গভূমির কয়েকজন উজ্জ্বল অভিনেতা অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় কখনও শোকশোভায়, কখনও বা সংবাদপত্রে, কখনও বা রঙ্গমঞ্চ হইতে আমার আন্তরিক শোকপ্রকাশের সহিত তাঁহাদের কার্য্যদক্ষতা সংক্ষেপে উল্লেখ করি। যখন সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফীর শোকসভা সমাবেশিত হয়, তখন আমি একটি প্রবন্ধ পাঠ করি, ষ্টার থিয়েটারের সুযোগ্য ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, তিনিও তাঁহার হৃদয়ের শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন এবং সেই শোকসভার অব্যবহিত পরেই তিনি আমায় একখানি পুস্তক লিখিতে অনুরোধ করেন, যাহাতে বঙ্গ-রঙ্গালয়ের প্রত্যেক অভিনেতা ও অভিনেত্রীর কার্য্যকলাপ বর্ণিত থাকে। অমৃতবাবু মনে করেন, আমার দ্বারা অভিনেতা ও অভিনেত্রীর কার্য্যকলাপ বর্ণিত হইলে এবং কোন্ সময় কি অবস্থায় তাহারা কার্য্য করিয়াছে, তাহা বিবৃত থাকিলে, একপ্রকার বঙ্গ-রঙ্গালয়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ থাকিবে। এ পুস্তকে জীবিত ও মৃত অভিনেতা ও অভিনেত্রীর বিষয় যাহাতে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত হয়, ইহাই অমৃতবাবু অনুরোধ। কিন্তু সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে আমি সাহস করি নাই। আমার যাহারা ছাত্র এবং যাহাদের সহিত একত্র কার্য্য করিয়াছি, তাহাদের বিষয়ও লিখিতে গেলে হয়তো একজনের প্রশংসায় অপরের মনে আঘাত লাগিতে পারে, হয়তো বহুদিনের কথা স্মৃতির ভ্রমে, স্বরূপ বর্ণিত হইবে না। তার পর অভিনেতা ও অভিনেত্রীর বর্তমান অবস্থা সমাজের চক্ষে এরূপ উন্নত নয় যে, নাট্যমোদী পাঠক ব্যতীত অপর সাধারণের নিকট তাহার মূল্য থাকিবে। আর এক বাধা এই যে তাহাদের নাট্যজীবনের সহিত আমার নাট্যজীবনের সহিত আমার নাট্যজীবন এরূপ বিজড়িত যে, অনেক স্থলে আমার আপনার কথাই বলিতে বাধ্য হইব। এ বাধা বড় সাধারণ বাধা নহে। পৃথিবীতে যতপ্রকার কঠিন কার্য্য আছে, তন্মধ্যে আপনার আপনি বলিতে যাওয়া একটি কঠিন কার্য্য। অনেক সময়ে প্রকৃত দীনতাও ভাণ বলিয়া পরিগৃহীত হয়; স্বরূপ বর্ণনায় অতিরঞ্জিত জ্ঞান হয়; আর সমস্তটাই আত্মম্ভরিতার পরিচয়—এইরূপ পাঠকের মনে ধারণা জন্মিবার সম্ভাবনা। এরূপ হইবার কারণ বিস্তর। অনেক সময় আপনি আপনার দোষ দেখা যায় না এবং আত্মদোষ বর্ণনাও অনেক সময়ে উকীলের বিচারপতির সম্মুখে নিজ মক্কেলের দোষ স্বীকারের ন্যায় ওকালতী ভাবেই হইয়া থাকে। তাহার পর ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র আন্দোলনের ফল কি? এই সকল চিন্তায় এ পর্য্যন্ত বিরত আছি; কিন্তু অমৃতবাবুও সময়ে সময়ে আসিয়া অনুরোধ করিতে ক্রটি করেন না।

এক্ষণে ভূতপূর্ব্ব প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনী দাসী তাহার নিজ জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়া আমাকে দেখাইয়া একটি ভূমিকা লিখিতে অনুরোধ করে। যাঁহারা থিয়েটারে 'চৈতন্য-লীলা'র নাম শুনিয়াছেন, তিনিই বিনোদিনীর নাম জানেন, এরূপ

নয়; একটি বিশেষ কারণে 'চৈতন্য-লীলা' অনেক সাধু-শাস্তের নিকটও পরিচিত। পতিতপাবন ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব রঙ্গালয়ের পতিতগণকে তাঁহার মুক্তিপ্রদ পদধূলি প্রদানার্থ 'চৈতন্যলীলা' দর্শনচ্ছলে পদার্পণে রঙ্গালয়কে পবিত্র করিয়াছিলেন। এই চৈতন্যলীলায় বিনোদিনী 'চৈতন্যের' ভূমিকা গ্রহণ করে।

বহুপূর্ব্বে আমি বিনোদিনীকে বলিয়াছিলাম যে, যদি তোমার জীবনের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করো, এবং সেই সকল ঘটনা আন্দোলন করিয়া ভবিষ্যৎ-জীবনের পথ মার্জ্জিত করিতে পারো, তাহা তোমার পক্ষে অতিশয় ফলপ্রদ হইবে। এই কথার উল্লেখ করিয়া এক রকম আমার উপর দাবী রাখিয়া বিনোদিনী তাহার জীবন-আখ্যায়িকার একটি ভূমিকা লিখিতে বলে। আমি নানা কারণে ইতস্ততঃ করিলাম; আমি বিনোদিনীকে বুঝাইয়া বলিলাম যে, অবশ্য তুমি ইহা তোমার পুস্তকে মুদ্রাঙ্কিত করিবার জন্য ভূমিকা লিখিতে বলিতেছ, কিন্তু তাহাতে কি ফল হইবে? তুমি লিখিয়াছ যে, তোমার হৃদয়-ব্যথা প্রকাশ করা—তোমার মন্তব্য। কিন্তু তুমি সংসারে ব্যথার ব্যথী কাহাকে পাইলে যে, হৃদয়ব্যথা জানাইতে ব্যাকুল হইয়াছ? আত্মজীবনী লেখা যেরূপ কঠিন আমার ধারণা, তাহাও বুঝাইলাম;—আত্মজীবনী লিখিতে অনেককে অনেক কৌশল করিতে হইয়াছে, তাহাও বুঝাইলাম। জগদ্বিখ্যাত উপন্যাসলেখক ডিকেন্স গল্পচ্ছলে আপনার নাম প্রচ্ছন্ন রাখিয়া তাঁহার আত্মজীবনী লিখিয়াছেন। অনেক বন্ধুর সহিত কথোপকথনচ্ছলে—কেহ বা পুত্রের প্রতি লিপির ছলে—আত্মজীবন প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কারণ অতি উচ্চ ব্যক্তি প্রভৃতিও নিজ জীবনী লিখিতে ব্যঙ্গের ভয় করিয়াছেন। বিনোদিনীর জীবনীতে আমি যে ভূমিকা লিখিব, তৎসম্বন্ধে সাধারণকে কি কৈফিয়ৎ দিব? আমিও কৈফিয়তের ভয়ে লিখিতে চাহি না, বিনোদিনীও ছাড়িবে না। কিন্তু সহসা আমার মনে উদয় হইল যে, এই সামান্য বনিতার ক্ষুদ্র জীবনে যে মহান্ শিক্ষাপ্রদ উপাদান রহিয়াছে! লোকে পরস্পর বলাবলি করে,—এ হীন—ও ঘৃণিত; কিন্তু পতিতপাবন ঘৃণা না করিয়া পতিতকে শ্রীচরণে স্থান দেন। বিনোদিনীর জীবন ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত। অনেকে আজীবন তপস্যা করিয়া যে মহাফল লাভে অসমর্থ হন, সেই চতুর্ব্বর্গ ফলস্বরূপ শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের পাদপদ্ম বিনোদিনী লাভ করিয়াছে। সেই চরণ-মাহাত্ম্য যাঁহার হৃদয়ে আংশিক স্পর্শ করিয়াছে, তিনিই বিভোর হইয়া ভাবিবেন যে, ভগবান অতি হীন অবস্থাগত ব্যক্তিরও সঙ্গে থাকিয়া সুযোগপ্রাপ্তি মাত্রেই তাঁহাকে আশ্রয় দেন। এরূপ পাপী তাপী সংসারে কেহই নাই, যাহাকে দয়াময় পরিত্যাগ করিয়াছেন। বিনোদিনীর জীবনী যদি সমাজকে এ শিক্ষা প্রদান করে, তাহা হইলে বিনোদিনীর জীবন বিফল নয়। এ জীবনী পাঠে ধর্ম্মাভিমানীর দম্ভ খর্ব্ব হইবে, চরিত্রাভিমানী দীন-ভাব গ্রহণ করিবে এবং পাপী তাপী আশ্বাসিত হইবে।

যাহারা বিনোদিনীর ন্যায় অভাগিনী, কুৎসিত পন্থা ভিন্ন যাহাদের জীবনোপায় নাই, মধুর বাক্যে যাহাদিগকে ব্যভিচারীরা প্রলোভিত করিতেছে, তাহারাও মনে মনে

আশান্বিত হইবে যে যদি বিনোদিনীর মত কায়মনে রঙ্গালয়কে আশ্রয় করি, তাহা হইলে এই ঘৃণিত জন্ম জনসমাজের কার্য্যে অতিবাহিত করিতে পারিব। যাহারা অভিনেত্রী, তাহারা বুঝিবে—কিরূপ মনোনিবেশের সহিত নিজ ভূমিকার প্রতি যত্ন করিলে জনসমাজে প্রশংসাভাজন হইতে পারে;—এইরূপ চিন্তা করিয়া আমি ভূমিকা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি দোষ হইয়া থাকে, অনেক দোষেই মার্জ্জনাপ্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাতেও মার্জ্জনা পাইব—ভরসা করি।

বিনোদিনীর এই ক্ষুদ্র জীবনী একস্রোতে লিপিবদ্ধ হইলে, উত্তম হইত; কিন্তু তাহা না হইয়া অবস্থাভেদে লেখা হইয়াছে, তাহা পড়িবামাত্র বোঝা যায়। বিনোদিনী মনের কথা বলিবার প্রয়াস পাইয়া সহানুভূতি চাহিয়াছে; কিন্তু দেখা যায়, কোথাও কোথাও সমাজের প্রতি তীব্র কটাক্ষ আছে। যে যে ভূমিকা বিনোদিনী অভিনয় করিয়াছিল, প্রতি অভিনয়ই সুন্দর, কিরূপে তাহা অভ্যাস করিয়াছে, তাহাও বর্ণিত আছে,—কিন্তু সে বর্ণনা অনেকটা কবিতা। কিরূপ চেষ্টায় কিরূপ কার্য্য হইয়াছে, কিরূপ কঠোর অভ্যাসের প্রয়োজন, কিরূপ কণ্ঠস্বর ও হাব-ভাবের প্রতি আধিপত্য আবশ্যক—এ সকল শিক্ষোপযোগীরূপে বর্ণিত না হইয়া আপনার কথাই বলা হইয়াছে। যে অবস্থা গোপন রাখা আত্মজীবনী-লেখার কৌশল, সে কৌশল ক্ষুণ্ন হইয়াছে। আমি তাহার প্রধান প্রধান ভূমিকাভিনয়ে, যতদূর স্মরণ আছে, সে চিত্র পাঠককে দিবার চেষ্টা করিতেছি।

বিনোদিনী যথার্থ বলিয়াছে যে, তাহার ভূমিকা-উপযোগী পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইবার বিশেষ কৌশল ছিল। একটি দৃষ্টান্তে তাহার কতক প্রকাশ পাইবে। বুদ্ধদেবের অভিনয়ে বিনোদিনী গোপার ভূমিকা গ্রহণ করে। একদিন ভক্তচূড়ামণি স্বর্গীয় বলরাম বসু 'বুদ্ধদেব' দেখিতে যান। তিনি এক অঙ্ক দর্শনের পর সহসা সজ্জাগৃহে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কেন যে তাঁহার এরূপ ইচ্ছা হইল, তাহা আমি জিজ্ঞাসা না করিয়া, কন্‌সার্টের সময়, তাঁহাকে ভিতরে লইয়া যাইলাম। তিনি এদিক্-ওদিক্ দেখিয়া কন্‌সার্ট বাজিতে বাজিতেই ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পর তিনি গল্প করিয়াছিলেন যে, তিনি রঙ্গমঞ্চের উপর গোপাকে প্রথমে দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন যে, এরূপ আশ্চর্য্য সুন্দরী থিয়েটারওয়ালারা কোথায় পাইল? তিনি সেই সুন্দরীকে দেখিতে গিয়াছিলেন। সাজঘরে দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, রঙ্গমঞ্চে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, সেরূপ সুন্দরী নয় সত্য, কিন্তু সুন্দরী বটে। তৎপরে একদিন অসজ্জিত অবস্থায় দেখিয়া, সেই স্ত্রীলোক যে 'গোপা' সাজিয়াছিল, তাহা প্রথমে বিশ্বাস করেন নাই। তিনি সাজসজ্জার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতেন। সজ্জিত হইতে শেখা অভিনয় কার্যের প্রধান অঙ্গ, এ শিক্ষায় বিনোদিনী বিশেষ নিপুণা ছিল। বিনোদিনী ভিন্ন ভিন্ন ভূমিকায়, সজ্জা দ্বারা আপনাকে এরূপ পরিবর্তিত করিতে পারিত যে, তাহাকে এক ভূমিকায় যে সেই আসিয়াছে, তাহা দর্শক বুঝিতে পারিতেন না। সাজসজ্জার প্রতি অভিনেতা ও অভিনেত্রীর বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সজ্জিত হইয়া দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দর্শনে অনেক সময়ে অভিনেতার হৃদয়ে নিজ

ভূমিকার ভাব প্রস্ফুটিত হয়। দর্পণ অভিনেতার সামান্য শিক্ষক নয়। সজ্জিত হইয়া দর্পণের সম্মুখে হাবভাব প্রকাশ করিয়া যিনি ভূমিকা (part) অভ্যাস করেন, তিনি সাধারণের নিকট বিশেষ প্রশংসাভাজন হন। কিন্তু এরূপ অভ্যাস করা কষ্টসাধ্য। শিক্ষাজনিত অঙ্গভঙ্গী স্বাভাবিক অঙ্গভঙ্গীর ন্যায় অভ্যস্ত করা এবং স্বেচ্ছায় তৎক্ষণাৎ সেই অঙ্গভঙ্গী প্রকাশ—শ্রম ও চিন্তাসাধ্য। এ শ্রম ও চিন্তা-ব্যয়ে বিনোদিনী কখনও কুণ্ঠিত ছিল না। বিনোদিনীর স্মরণ নাই, মেঘনাদের সাতটি ভূমিকা বিনোদিনীকে ন্যাসান্যাল থিয়েটারে অভিনয় করিতে হয়, বেঙ্গল থিয়েটারে নয়। যাহা হইক, সাতটি ভূমিকাই অতি সুন্দর হইয়াছিল। সাতটি ভূমিকা একজনের দ্বারা অভিনীত হওয়া কঠিন; দুইটি বৈষম্যপূর্ণ ভূমিকা এক নাটকে অভিনয় করা সাধারণ নাট্য-শক্তির বিকাশ নয়। কিন্তু এ সকল অপেক্ষা এক ভূমিকায় চরমোৎকর্ষ লাভ করা বিশেষ নাট্যশক্তির কার্য্য। চরমোৎকর্ষ লাভ সহজে হয় না। প্রথমে নিজ ভূমিকা তন্ন তন্ন করিয়া পাঠের পর সেই ভূমিকার কিরূপ অবয়ব হওয়া কর্ত্তব্য, তাহা কল্পনা করিতে হয়। অঙ্গে কি কি পারিচ্ছদিক পরিবর্ত্তনে সেই ভূমিকা-কল্পিত আকার গঠিত হইবে, মনঃক্ষেত্রে চিত্রকরের ন্যায় সেই আভাস আনা প্রয়োজন। অভিনয়কালীন ঘাত প্রতিঘাতে কিরূপ অঙ্গভঙ্গী হইবে এবং সেই সকল ভঙ্গী সুসঙ্গত হইয়া শেষ পর্য্যন্ত চলিবে, তাহার প্রতি সতর্ক লক্ষ্য রাখিতে হয়। অভিনয়কালে যে স্থানে মনশ্চাঞ্চল্য ঘটিবে, কি আপনার কথা কহিতে, কি সহযোগী অভিনেতার কথা শুনতে—সেইক্ষণেই অভিনয়ের রস ভঙ্গ হইবে। এ সমস্ত লক্ষ্য করিতে পারেন, এরূপ দর্শক বিনোদিনীর সময় বিস্তর আসিতেন; এবং সে সময়ে অভিনয় সম্বন্ধে অতি তীব্র সমালোচনা হইত। যথা—'পলাশীর যুদ্ধ' দেখিয়া 'সাধারণী'তে সমালোচনা,—'ন্যাশন্যাল থিয়েটারের অভিনেতারা সকলে সুপাঠক, যিনি ক্লাইভের অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি অঙ্গভঙ্গীও জানেন।" এইটুকু একপ্রকার সুখ্যাতি ভাবিয়া লওয়া যাইতে পারে। তাহার পর সিরাজদ্দৌলার উপর এরূপ কঠোর লেখনী সঞ্চালন যে, প্রকৃত সিরাজদ্দৌলা যেরূপ পলাশী ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, সেইরূপ অভিনেতা সিরাজদ্দৌলা সমালোচনার তাড়নায় নিজ ভূমিকা ত্যাগ করিতে ব্যগ্র হইয়াছিলেন;—ব্যথিতচিত্তে বলিয়াছিলেন, "আর আমার নবাব সাজায় কাজ নাই।" কিন্তু তাৎকালিক সমালোচক যেরূপ কঠোরতার সহিত নিন্দা করিতেন, অতি উচ্চ প্রশংসা দানেও কুণ্ঠিত হইতেন না। এই সকল সমালোচকশ্রেণী তাৎকালিক বঙ্গীয় সাহিত্য-জগতের চালক ছিলেন। বহু ভূমিকায় বিনোদিনী ঐ সকল সমালোচকের নিকট উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছে। 'দক্ষযজ্ঞে' সতীর ভূমিকা আদ্যোপান্ত বিনোদিনীর দক্ষতার পরিচয়। সতীর মুখে একটি কথা আছে 'বিয়ে কি মা?' —এই কথাটি অভিনয় করিতে অতি কৌশলের প্রয়োজন। যে অভিনেত্রী পর অঙ্কে মহাদেবের সহিত যোগ-কথা কহিবে, এইরূপ-বয়স্কা স্ত্রীলোকের মুখে 'বিয়ে কি মা?' শুনিলে ন্যাকামো মনে হয়। সাজসজ্জায় হাবভাবে বালিকার ছবি দর্শককে

না দিতে পারিলে, অভিনেত্রীকে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। কিন্তু বিনোদিনীর অভিনয়ে বোধ হইত, যেন দিগম্বর-ধ্যান-মগ্না বালিকা সংসার-জ্ঞান-শূন্যা অবস্থায় মাতাকে 'বিয়ে কি মা?'—প্রশ্ন করিয়াছে। পর অঙ্কে দয়াময়ী জগজ্জননী জীবের নিমিত্ত অতি ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—

"কহ, নাথ! কি হেতু কহিলে—
'ধন্য, ধন্য কলিযুগ'?
ক্ষুদ্র নর অন্নগতপ্রাণ,
রিপুর অধীন সবে;
রোগশোক-সন্তাপিত ধরা,
পন্থাহারা মানবমণ্ডল
ভীম ভবার্ণব মাঝে;—
কেন কহ বিশ্বনাথ,—'ধন্য কলিযুগ?'

যোগিনীবেশে যোগীশ্বরের পার্শ্বে জগজ্জননী এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন,—ইহা বিনোদিনীর অভিনয়ে প্রতিফলিত হইত। তেজস্বিনী মহাদেবের নিকট বিদায় গ্রহণ, মাতাকে প্রবোধ দান,—

শুনেছি যজ্ঞের ফল প্রজার লক্ষণ।
প্রজাপতি পিতা মোর;
প্রজারক্ষা কেমনে গো হবে?
নারী যদি পতি নিন্দা সবে,
কার তরে গৃহী হবে নর?
প্রজাপতি-দুহিতা গো আমি,
ওমা, পতিনিন্দা কেন সব?"

এ কথায় যেন সতীত্বের দীপ্তি প্রত্যক্ষীভূত হইত। যজ্ঞস্থলে পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন অথচ দৃঢ়বাক্যে পূজ্য স্বামীর পক্ষ সমর্থন, পতিনিন্দায় প্রাণের ব্যাকুলতা, তৎপরে প্রাণত্যাগ—স্তরে স্তরে অতি দক্ষতার সহিত প্রদর্শিত হইত।

'বুদ্ধদেব' নাটকে পতিবিরহ-ব্যাকুলা গোপার ছন্দকের নিকট—

"দাও, দাও ছন্দক আমায়,
পতির বসনভূষা মম অধিকার!
স্থাপি সিংহাসনে,
নিত্য আমি পূজিব বিরলে!"

বলিয়া পতির পরিচ্ছদ যাঞ্চা একপ্রকার অতুলনীয় হইত। সে অর্দ্ধোন্মাদিনী বেশ—আগ্রহের সহিত স্বামীর পরিচ্ছদ হৃদয়ে স্থাপন—এখনও আমার চক্ষে জাগরিত। যাহাকে পূর্ব্বাঙ্কে অপরূপানিন্দিত সুন্দরী দেখা যাইত, পরিচ্ছদ-যাঞ্চার সময় তাপ-শুষ্ক পদ্মের ন্যায় মলিনা বোধ হইত। "Light of Asia" রচয়িতা Edwin Arnold সাহেব এই গোপার অভিনয়ের প্রশংসা করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার 'Travels in

the East' নামক গ্রন্থে রঙ্গনাট্যশালা অতি প্রশংসার সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি রঙ্গালয় দর্শনে বুঝিয়াছিলেন যে, হিন্দু আধ্যাত্মিক অবস্থায় উন্নত, নচেৎ বুদ্ধদেব-চরিত্রের ন্যায় দার্শনিক অভিনয় স্থিরভাবে হিন্দুদর্শকমণ্ডলী দেখিতেন না। বিদেশীর চক্ষে এইরূপ হিন্দুর হৃদয়ের অবস্থার পরিচয় দেওয়া রঙ্গালয়ের পক্ষে সামান্য গৌরবের বিষয় নহে। রঙ্গালয়ের পরম বিদ্বেষী ব্যক্তিকেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

বলা হইয়াছে যে, সকল ভূমিকাতে বিনোদিনী সাধারণের প্রশংসাভাজন হইয়াছিল, কিন্তু 'চৈতন্যলীলায়' চৈতন্য সাজিয়া তাহার জীবন সার্থক করে। এই ভূমিকায় বিনোদিনীর অভিনয় আদ্যোপান্তই ভাবুক-চিত্ত-বিনোদন। প্রথমে বালগৌরাঙ্গ দেখিয়া ভাবুকের বাৎসল্যের উদয় হইত। চঞ্চলতায় ভগবানের বাল্যলীলার আভাস পাইতেন। উপনয়নের সময় রাধাপ্রেম-মাতোয়ারা বিভোর দণ্ডী দর্শনে দর্শক স্তম্ভিত হইত। গৌরাঙ্গমূর্ত্তির ব্যাখ্যা 'অন্তঃকৃষ্ণ বহিঃ রাধা'—পুরুষ প্রকৃতির ভাব বিনোদিনীর অঙ্গে প্রতিফলিত হইত। বিনোদিনী যখন 'কৃষ্ণ কই—কৃষ্ণ কই?' বলিয়া সংজ্ঞাহীনা হইত, তখন বিরহ-বিধুরা রমণীর আভাস পাওয়া যাইত। আবার চৈতন্যদেব যখন ভক্তগণকে কৃতার্থ করিতেছেন, তখন পুরুষোত্তমভাবের আভাস বিনোদিনী আনিতে পারিত। অভিনয় দর্শনে অনেক ভাবুক এরূপ বিভোর হইয়াছিলেন যে, বিনোদিনীর পদধূলি গ্রহণে উৎসুক হন। এই অভিনয় পরমহংসদেব দেখিতে যান। হরিনাম হইলে হরি স্বয়ং তাহা শুনিতে আসেন, পরমহংসদেব স্বয়ং তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন; পদধূলিলাভে কেহই বঞ্চিত হইল না। সকলেই পতিত, কিন্তু পতিতপাবন যে পতিতকে কৃপা করেন, একথা সে পতিতকে কৃপা করেন, একথা সে পতিত-মণ্ডলীর বিশ্বাস জন্মিল। তাহাদের মনে তর্ক উঠে নাই, সেইজন্য তাহাদের পতিত জন্ম ধন্য। বিনোদিনী অতি ধন্যা, পরমহংসদেব করকমল দ্বারা তাহাকে স্পর্শ করিয়া শ্রীমুখে বলিয়াছেন,—'চৈতন্য হোক।' অনেক পর্ব্বতগহ্বরবাসী এ আশীর্ব্বাদের প্রার্থী। যে সাধনায় বিনোদিনীর ভাগ্য এরূপ প্রসন্ন হইল, সেই সাধনাই—অভিনয়ের নিমিত্ত প্রস্তুত হইতে হইলে—অভিনেতাকে অবলম্বন করিতে হয়। বিনোদিনীর সাধন—যথাজ্ঞান কায়মনোবাক্যে মহাপ্রভুর ধ্যানে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল। যে ব্যক্তি যে অবস্থায় হোক, এই মহা ছবি ধ্যান করিবে, সেই ব্যক্তি এই ধ্যান-প্রভাবে ধীরে ধীরে মোক্ষের পথে অগ্রসর হইয়া মোক্ষলাভ করিবে। অষ্টপ্রহর গৌরাঙ্গমূর্ত্তি ধ্যানের ফল বিনোদিনীর ফলিয়াছিল।

গুরুগম্ভীর ভূমিকায় (Serious part) বিনোদিনীর যেরূপ দক্ষতা, 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনে ফতীর ভূমিকায়, এবং 'বিবাহ-বিভ্রাটে' বিলাসিনী কারফর্মার ভূমিকায়, 'চোরের উপর বাটপাড়ি'তে গিন্নী, 'সধবার একাদশীতে কাঞ্চন প্রভৃতি হাল্কা ভূমিকায়ও বিনোদিনীর অভিনয় অতি সুন্দর হইত। মিলনান্ত ও বিয়োগান্ত নাটক, প্রহসন, পঞ্চরং, নক্শা প্রভৃতিতে সে সময় বিনোদিনীই নায়িকা ছিল। প্রত্যেক নায়িকাই অন্য নায়িকা হইতে স্বতন্ত্র এবং প্রশংসনীয় হইত। এক্ষণে

যাঁহারা কপালকুণ্ডলার অভিনয় দেখিতে যান, তাঁহাদের ধারণা যে মতিবিবির অংশই নায়িকার অংশ। কিন্তু যাঁহারা বিনোদিনীর অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহাদের নিশ্চয় ধারণা যে, কপালকুণ্ডলার নায়িকা কপালকুণ্ডলা—মতিবিবি নয়। কপালকুণ্ডলার চরিত্র এই যে, বাল্যবিধি স্নেহপালিত না হওয়ায়, নবকুমারের বহু যত্নেও হৃদয়ে প্রেম প্রস্ফুটিত হয় নাই। অবশ্য অন্য স্ত্রীলোকের ন্যায় গৃহকার্য্য করিত, কিন্তু যখন তাহার ননদিনীর স্বামী বশ করিবার ঔষধের নিমিত্ত বনে প্রবেশ করিল, তখন পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনী যেরূপ পিঞ্জর-মুক্তা হইয়া বনে প্রবেশ মাত্র বন্যবিহঙ্গিনী হইয়া যায়, সেইরূপ গৃহবদ্ধা কপালকুণ্ডলা-অংশ অভিনয়কারিণী বিনোদিনী বনপ্রবেশ মাত্রেই—পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইয়া—বন্য কপালকুণ্ডলা হইয়া যাইল,—এই পরিবর্ত্তন বিনোদিনীর অভিনয়ে অতি সুন্দররূপ প্রস্ফুটিত হইত! তখন কপালকুণ্ডলার অভিনয়ে কপালকুণ্ডলাই নায়িকা ছিল। এখন 'হীরার ফুলের' অভিনয়েও সেইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এক্ষণে অভিনয় দর্শনে দর্শকের ধারণা হয় যে, রতি 'হীরার ফুল' গীতিনাট্যের নায়িক ; কিন্তু যিনি 'হীরার ফুলে' বিনোদিনীকে দেখিয়াছেন, তাঁহার ধারণা যে, 'হীরার ফুলে' গ্রন্থকার-রচিত নায়িকাই নায়িকা, রতি নায়িকা নয়। অনেক সময়েই আমি বিনোদিনীর সহযোগী অভিনেতা ছিলাম। 'মৃণালিনীতে' আমি পশুপতি সাজিতাম বিনোদ 'মনোরমা' সাজিত। অন্যান্য অনেক নাটকেই আমরা নায়ক-নায়িকার অংশ গ্রহণ করিয়াছি ; সমস্ত বলিতে গেলে অনেক কথা, প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়, কেবল 'মনোরমা'র কথাই বলিব। মনোরমার কথা বলিতেছি, তাহার কারণ, আমি প্রতি অভিনয়েই সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমবাবু-বর্ণিত সেই বালিকা ও গম্ভীরা মূর্ত্তি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি। এই শিক্ষাদাত্রী তেজস্বিনী সহধর্ম্মিণী, আবার পরক্ষণেই "পশুপতি, তুমি, কাঁদছ কেন ? বলিয়াই প্রেম-বিহ্বলা বালিকা! হেমচন্দ্রের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে এই স্নেহশীলা ভগ্নী, ভ্রাতার মনোবেদনায় সহানুভূতি করিতেছে, আর পরক্ষণেই 'পুকুরে হাঁস দেখিতে যাওয়া"—অসাধারণ অভিনয়-চাতুর্য্যে প্রদর্শিত হইত। বেঙ্গল থিয়েটারে বঙ্কিমবাবু কি বলিয়াছিলেন, তাহা আমি জানি না, কিন্তু যিনি মনোরমার অভিনয় দেখিতেন, তাঁহাকেই বলিতে হইয়াছে যে, এ প্রকৃত 'মৃণালিনী'র মনোরমা। বালিকা-ভাব দেখিয়া এক ব্যক্তির মনে উদয় হইয়াছিল, বুঝি কোন বালিকা অভিনয় করিতেছে। অভিনয়-কৌশলে বিনোদিনীর এই উভয় ভাবের পরিবর্ত্তন, উচ্চশ্রেণীর অভিনেত্রীরও উচ্চ প্রশংসা। বিনোদিনী একবাক্যে দর্শকের নিকট সেই উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়য়াছিল। বিনোদিনীর গঠনও অভিনেত্রীর সকল ভূমিকা গ্রহণেরই উপযুক্ত —যুবক-যুবতী, বালক, বালিকা, রাজরাণী হইতে ফতী পর্যন্ত সকল ভূমিকার উপযুক্ত। বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির যদি সমাজের চক্ষে অন্যরূপ অবস্থা হইত, তাহা হইলে বিনোদিনীর অভিনয়-জীবনের আত্মবর্ণনা অনাদৃত হইবার সম্ভাবনা থাকিত না। কিন্তু এ কথা বলিতে সাহস করা যায়, যদি বঙ্গ-রঙ্গালয় স্থায়ী হয়, বিনোদিনীর এই ক্ষুদ্র জীবনী আগ্রহের সহিত অন্বেষিত ও পঠিত হইবে।

বিনোদিনী আপনার শৈশব-অবস্থা বর্ণনা করিয়াছে। সে সমস্ত আমি অবগত

নই। শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন নিয়োগী মহাশয়ের গঙ্গাতীরস্থ চাঁদনীর উপর আমার সহিত তাহার প্রথম দেখা। তখন বিনোদিনী বালিকা। বিনোদিনী সত্য বলিয়াছে, সে সময় তাহাকে নায়িকা সাজাইতে সজ্জাকারকে যাত্রার দলের ছোক্‌রা সাজাইবার প্রথা অবলম্বন করিতে হইত। কিন্তু সে সময়ে তাহার শিক্ষাগ্রহণের ঔৎসুক্য ও তীব্র মেধা দেখিয়া ভবিষ্যতে যে বিনোদ রঙ্গমঞ্চে প্রধানা অভিনেত্রী হইবে, তাহা আমার উপলব্ধি হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর আমিও কিছুদিন থিয়েটার ছাড়িয়াছিলাম, বিনোদিনীও সেই সময়ে বেঙ্গল থিয়েটারে যোগদান করিয়াছিল। বেঙ্গল থিয়েটারের দৃষ্টান্তে বাধ্য হইয়া যখন গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটার নারী অভিনেত্রী লইয়া, মদনমোহন বর্ম্মণের কৃতিত্বে জাঁকজমকের সহিত "সতী কি কলঙ্কিনী?" অভিনয় করিয়া যশস্বী হয়, তখন আমার সহিত থিয়েটারের কোনও সম্বন্ধ ছিল না। থিয়েটারের নানাদেশভ্রমণ-বৃত্তান্ত যাহা বিনোদিনী বর্ণনা করিয়াছে, তাহা আমি নিজে কিছু জানি না। পরে যখন 'কেদারনাথ চৌধুরীর সহিত একত্র হইয়া থিয়েটার আরম্ভ করি, সেই অবধি বিনোদিনীর থিয়েটারে অবসর লওয়া পর্য্যন্ত আমি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বিনোদিনীর অনেক কথাই অবগত আছি। বিনোদিনী হয়তো কেদারবাবু বা অন্য কাহারও নিকট শুনিয়া থাকিবে যে, আমি শরৎবাবুর নিকট হইতে বিনোদিনীকে যাচ্‌ঞা করিয়া লইয়াছি। বিনোদিনীর প্রশংসার জন্য এ কথার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে, কিন্তু বিনোদিনী আমাদের থিয়েটারে আসার পর, এক মাসের বেতন যাহা বেঙ্গল থিয়েটারে বাকী ছিল, তাহা বহুবার তাগাদা করিয়াও বিনোদিনীর মাতা প্রাপ্ত হয় নাই। বস্তুতঃ বিনোদিনী বেঙ্গল থিয়েটার হইতে চলিয়া আসায় তথাকার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বিনোদিনীর উপর ক্রুদ্ধই হইয়াছিল। ইহার পর আমাদের থিয়েটার একস্রোতে চলে নাই, মাঝে মাঝে হইয়াছে ও আবার বন্ধ হইয়াছে। 'প্রতাপচাঁদ জহরীর থিয়েটারের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণের পর হইতে আমি থিয়েটারে প্রথম বেতনভোগী হইয়া যোগদান করি এবং সেই সময় হইতে বিনোদিনী আমার নিকট বিশেষরূপ শিক্ষিতা হয়। বিনোদিনী তাহার জীবনীতে স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র ঘোষের প্রতি তাহার শিক্ষক বলিয়া গাঢ় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছে, আমারও শিক্ষাদানের কথা অতি সম্মানের সহিত আছে; কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, রঙ্গালয়ে বিনোদিনীর উৎকর্ষ আমার শিক্ষা অপেক্ষা তাহার নিজগুণে অধিক।

উল্লেখ করিয়াছি, সমাজের প্রতি বিনোদিনীর তীব্র কটাক্ষ আছে। বিনোদিনীর নিকট শুনিয়াছি, তাহার একটি কন্যা সন্তান হয়, সেই কন্যাটিকে শিক্ষাদান করিবে, বিনোদিনীর বড়ই ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সে কন্যা নীচকুলোদ্ভব—এই আপত্তিতে কোন বিদ্যালয়ে গৃহীত হয় নাই। যাহাদিগকে বিনোদিনী বন্ধু বলিয়া জানিত, কন্যার শিক্ষাপ্রার্থী হইয়া তাহাদের অনুনয় বিনয় করে, কিন্তু তাহারা সাহায্য না করিয়া বরং সে কন্যার বিদ্যালয়-প্রবেশের বাধা প্রদান করিয়াছিল শুনিতে পাই।—এই বিনোদিনীর তীব্র কটাক্ষের কারণ। কিন্তু নিজ জীবনীতে উক্তরূপ কঠোর লেখনীচালন না হইলেই ভাল ছিল। যে পাঠক এই জীবনী পাঠ করিবেন,

শেষোক্ত লেখনীর কঠোরতায়, প্রারম্ভে যে সহানুভূতি প্রার্থনা আছে, তাহা ভুলিয়া যাইবে।

এই ক্ষুদ্র জীবনীতে অনেক স্থলে রচনাচাতুর্য্য ও ভাব-মাধুর্যের পরিচয় আছে। সাধারণের নিকট কিরূপ গৃহীত হইবে—জানি না, কিন্তু আমার স্মৃতিপথে অনেক ঘটনাবলী হর্ষশোক-বিজড়িত হইয়া বিস্মৃত স্বপ্নের ন্যায় উদয় হইয়াছিল।

উপসংহারে আমার সাধারণের নিকট নিবেদন যে, যিনি বঙ্গ-রঙ্গালয়ের আভ্যন্তরিক অবস্থা কিরূপ, জানিতে চাহেন, তিনি সে সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারিবেন ও ইচ্ছা করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, অভিনেতা ও অভিনেত্রীর জীবন-প্রবাহ সুখ-দুঃখে জড়িত হইয়া, সাধারণের কৃপাপ্রার্থনায় অতিবাহিত হয় এবং সাধারণের আনন্দের নিমিত্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছে, এই সর্তে সাধারণকে তাহাদের ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র দুই একটি কথা শুনাইবার দাবি রাখে। যে সহৃদয় ব্যক্তি এ দাবি স্বীকার করিবেন, তিনি এ ক্ষুদ্র কাহিনী পাঠে কৃপাপ্রার্থিনী অভিনেত্রীর নাট্যজীবন-বর্ণনার প্রথম উদ্যম—কৃপাচক্ষে দৃষ্টি করিবেন।

নৃত্য

…আমরা নাচের কথা কহিতেছি। নাচ যদি মাধুরীময়ী না হয়, তাহা হইলেই নাচই নয়। উচ্চ শিল্পসকলেরই চরম স্থানে গতি। গান-কবিত্ব যে আদর্শ লক্ষ্য করিয়াছে, নৃত্যেরও সেই লক্ষ্য। দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি কথা বলিব।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী অতি কঠোর যোগী ছিলেন। তিনি মহা গৌরাঙ্গদ্বেষী; শ্লেষসূচক শ্লোক রচনা করিয়া গৌরাঙ্গকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। প্রকাশানন্দ কঠোর সন্ন্যাসী, ভাবের ধার ধারেন না। বৈষ্ণব-গ্রন্থে দেখিতে পাই, [ঐ] তিতিক্ষাশীল সন্ন্যাসী উপনিষৎ পড়িতেছিলেন; 'সকলই মায়া' এই স্থির ধারণা হৃদয়ে দৃঢ়ীভূত করিবার জন্য উপনিষৎ লইয়া শুষ্ক তর্কে জীবন অতিবাহিত করিতেছিলেন; বিশ্বত্যাগী বিশ্বেশ্বরের আবাসভূমি কাশীধামে বসিয়া 'সোঽহং' তত্ত্বে নিবিষ্ট, [আর তাঁহার] সম্মুখে ভাবাবেশে গৌরাঙ্গ নৃত্য করিতেছেন। গৌরচন্দ্রের অঙ্গ-তরঙ্গে শত-শত চন্দ্র ঠিকরিয়া চতুর্দিকে ছুটিতেছে; চন্দ্র ঠিকরিতেছে, পুনঃপুনঃ চন্দ্র ঠিকরিতেছে। গৌরচন্দ্রের অঙ্গ সঞ্চালনে কোটি চন্দ্র কোটি-কোটি জগৎ ব্যাপিতেছে! শুষ্ক সন্ন্যাসী উপনিষৎ-পাঠে রত, পাঠ ছাড়িয়া চাহিলেন; আবার পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। কিন্তু সংজ্ঞা হইলেই দেখেন, পাঠ করিতেছেন না, নৃত্য দেখিতেছেন। গৌরচন্দ্রের নৃত্য! গৌরাঙ্গ নাচিতেছেন—গান নাই, কথা নাই, ভাবাবেশে, সন্ন্যাসীবেশে, গৌর নাচিতেছেন! সন্ন্যাসী দেখিতেছেন। তাঁহার উপায় নাই, দেখিতেছেন। সৌন্দর্যে প্রাণ-মন সাগরজলের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত, উপায় নাই, কেবলই দেখিতেছেন!

অজ্ঞাতভাবে ক্রমে দেখা প্রবল হইয়া উঠিল। বীর সন্ন্যাসী এইবার অতি চঞ্চল। চাঞ্চল্য নিবারণে প্রাণপণ চেষ্টাও করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর না; সন্ন্যাসী ছুটিলেন; প্রাণপণে ছুটিলেন; গৌরচন্দ্রকে আলিঙ্গন করিলেন, কে জানে কেন! নৃত্যের প্রভাব এই; নৃত্য পরমানন্দদায়ক।

রামকৃষ্ণ পরমহংসকে না দেখিলে আমরা একথা প্রত্যয় করিতাম না; কঠোর তিতিক্ষাশালী প্রকাশানন্দ যে, গৌরাঙ্গের নৃত্যদর্শনে উন্মত্ত হইয়াছিলেন, একথা প্রত্যয় করিতে পারিতাম না। কিন্তু প্রত্যয় করিতে বাধ্য—আমরা যে রামকৃষ্ণ পরমহংস-দেবের নৃত্য দেখিয়াছি! "নদে টলমল টলমল করে," মৃদঙ্গতালে গান হইতেছে, রামকৃষ্ণ নাচিতেছেন। যে-ভাগ্যবান দেখিয়াছেন—আমরা দর্শন করিয়াছি [বলিয়া] আপনাদিগকে ভাগ্যবান জ্ঞান করি—যে-ভাগ্যবান দেখিয়াছেন, তিনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন যে, ভাব-প্রভাবে পৃথিবী টলটলায়মানা! কেবল নদে টলমল করিতেছে না, সমস্তই টলটলায়মানা! যে সে-নাচ দেখিয়াছে, তৎসময়ে পরমার্থে তাহার প্রাণ ধাবিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। নাচের এতদূর শক্তি! সৌন্দর্য উপলব্ধি করিবার যিনি উচ্চ আশা রাখেন, তাঁহাকে সৌন্দর্যের উপাসনা করিতে হইবে নিশ্চয়। কুৎসিত রঙ্গালয়ে কুৎসিত বেশ্যার যদি নৃত্যে ভাবের সৌন্দর্য থাকে, তাহাও উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। আকৃষ্টমনে উপেক্ষা নাই; সৌন্দর্যে যিনি অনাকৃষ্ট, তাঁহার কৃষ্ণলাভ হয় না।

---

* এই লেখাটি 'নৃত্য' নামক রচনার অংশ বিশেষ

অভিনেত্রী সমালোচনা

যাঁহারা সামান্যা বনিতাকে অভিনয়কার্যে নিযুক্ত করা অনিবার্য বিবেচনা করেন, তাঁহাদের মধ্যেও কেহ-কেহ অভিনেত্রীগণের দোষ দেখাইয়া রঙ্গভূমির অধ্যক্ষদিগকে তিরস্কৃত করেন। মোটের মাথায় তাঁহাদের কথা এই যে, অভিনেত্রীরা অভিনয়কালে হাবভাব প্রদর্শন ও দর্শকের প্রতি অপাঙ্গ নিক্ষেপে তাহাদের মন আকর্ষণ করিবার চেষ্টা পায়।·· ব্যক্তিগত অভিনেত্রীর দোষ অধ্যক্ষদিগের অজ্ঞাতসারে কখনও-কখনও হইয়া থাকে, ইহা আমরা স্বীকার পাই। কিন্তু উচ্চশ্রেণীর অভিনেত্রীর যে সে-দোষ নাই, তাহা মুক্তকণ্ঠে বলিব।··

রঙ্গালয়েও যাঁহারা তীব্র অনুসন্ধানে রমণীর কুটিল কটাক্ষ দেখেন, তাঁহাদেরও আমরা একথা বলি যে, কুটিল কটাক্ষ দেখিতে হইলে রাস্তাঘাটে যথায়-তথায় দেখিতে পাইবেন, তন্নিমিত্ত টিকিট কিনিয়া অর্থব্যয়ের আবশ্যক নাই। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরম-হংসদেব এইসকল রঙ্গালয়ের অভিনেত্রীদিগকে দেখিয়া "মা আনন্দময়ী" বলিয়া প্রণাম করিতেন এবং কোনো এক ভাগ্যবতীর বুকে হস্ত দিয়া বলিয়াছেন, "মা, তোমার

চৈতন্য হোক!" কোনো নাট্যাধ্যক্ষ তাঁহার নিকট সন্ন্যাস চাওয়ায়, তিনি তাহাকে রঙ্গালয়ের কার্য করিতে আদেশ দেন এবং উৎসাহপ্রদানে বলেন, "তুমি যে-কার্য করিতেছ, তাহাতে সাধারণের বিশেষ মঙ্গল।"…

[শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন—] একজন বেশ্যার বাটীর সম্মুখে একজন সাধুর আস্তানা ছিল। রজনীযোগে বেশ্যার কয়জন উপপতি আসিত, তাহা তিনি ঢিল রাখিয়া গণনা করিতেন আর ভাবিতেন, "কুৎসিতা এক উপপতিকে ঘরে স্থান দিল!" এদিকে বেশ্যা অনুতপ্তহৃদয়ে চিন্তা করিত—"আমারই বাড়ির সম্মুখে সাধু দেবসেবায় নিযুক্ত, আর আমি এই কদর্য কার্যে দেহ অর্পণ করিতেছি।" উভয়ের একসঙ্গে মৃত্যু হইল। সাধুর দেহ চন্দনকাষ্ঠে দগ্ধ হইল, আর বেশ্যার দেহ শৃগাল-কুকুরে খাইল। কিন্তু যমদূত সাধুর আত্মাকে বাঁধিয়া লইয়া চলিল, আর বেশ্যার আত্মা বিষ্ণুদূতের দিব্য বিমানে যত্নে স্থাপিত হইয়া বিষ্ণুলোকে চলিল। সাধু জিজ্ঞাসা করিল, "একি অত্যাচার!" যমদূত উত্তর দিল, "ধর্মরাজের নিরপেক্ষ চক্ষে বেশ্যার উপপতি-গণনায় তোমার বেশ্যাবৃত্তি করা হইয়াছে; অতএব নরকে তোমার স্থান। আর উপপতি সঙ্গেও বারাঙ্গনা ভাবিত, তুমি ঈশ্বর-উপসনা করিতেছ; ঘৃণিত কার্য করিয়াও বেশ্যার ভাবগ্রাহী জনার্দনের সেবা করা হইয়াছে; সেই নিমিত্ত সে বিষ্ণুলোকে গেল। স্থূল দৃষ্টিতে তোমার সাধুর শরীর ছিল, সে শরীর চন্দনকাষ্ঠে দগ্ধ হইয়াছে; বেশ্যার অপবিত্র শরীর কুক্কুর-শৃগালে খাইয়াছে। ন্যায়বান ঈশ্বরের রাজ্যে অন্যায় কার্য হয় নাই।"

আমরা এই নিমিত্ত বলি যে, রঙ্গালয়ে আসিয়া যিনি রাম, সীতা, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রভৃতি দেখিবার সাধ করেন, তাহা তিনি পাইবেন। কিন্তু যাঁহার কুটিল-কটাক্ষের প্রতি দৃষ্টি, তাঁহার হৃদয় সেই কুটিলার ন্যায় হইবে। সমস্তই ভাব-জগৎ, ভাব-মাত্র। ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "যেমনি ভাব তেমনি লাভ।"

উপসংহারে আমরা আর একটি কথার উল্লেখ করিব। পূজ্যপাদ বিবেকানন্দ খেতড়ীর রাজার সভায় উপস্থিত হন। কালোয়াতি সঙ্গীত অন্তে একজন 'বাঈ' রাজসভায় গান করিতে আসে! বিবেকান্দ স্ত্রীলোকের গান শুনিতেন না, বিশেষ ঐরূপ স্ত্রীলোকের গান। রাজা মিনতি করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন, অনুরোধ করিলেন, "একখানি গান শুনিয়া যান।" বাঈজি গান ধরিল:

"প্রভু মোর অবগুণ চিত না ধর।
সমদরশি হ্যায় নাম তোমার॥
এক লোহ পূজামে রহত হ্যায়।
এক রহো ঘর ব্যাধক পরো॥
পরলোক মন দ্বিধা নাহি হ্যায়।
দুঁহু কাঞ্চন করে॥"

(দ্বিতীয় কলিটি আমাদের স্মরণ নাই)

সমস্ত গানটির ভাব এই-যে, হে প্রভু! তুমি সমদর্শী, নিগু'ণ ও ভাগ্যবানকে সমান চক্ষে দেখিয়া থাক—যেরূপ পরশমণি, দ্বিধা না করিয়া ব্যাধগৃহে লৌহ ও পূজাগৃহে লৌহ, স্পর্শমাত্র সোনা করিয়া দেয়। নদীর নির্মল বারি বা মলা-ধৌত নালার জল—গঙ্গাদেবী সমভাবে গ্রহণ করিয়া লন, আর দুই জলই গঙ্গাজল হইয়া যায়।

তান লয়-গঠিত, ভাবপূর্ণ সুকণ্ঠে গীত সঙ্গীত শ্রবণে বিবেকানন্দের চক্ষে জলধারা পড়িতে লাগিল—মনে-মনে ভাবিতে লাগিলেন, "ধিক আমার সন্ন্যাস-অভিমানে! এখনও 'এ ঘৃণিত,' 'এ মান্য'—আমার বোধ আছে।" তদবধি সেই বাঈকে বিবেকানন্দ 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন এবং যখন খেতড়ীতে যাইতেন, খেতড়ীর রাজাকে অনুরোধ করিতেন—"আমার মাকে ডাক, আমার গান শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছে।" 'বাঈ' পরম শ্রদ্ধার সহিত গান শুনাইত, বিবেকানন্দ মুগ্ধ হইতেন। *

[* এই লেখাটি "রঙ্গালয়" সাপ্তাহিক পত্রে (৯ চৈত্র, ১৩০৭) প্রকাশিত 'অভিনেত্রী সমালোচনা' নামক রচনার অংশ।]

শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গীত

দুখিনী ব্রাহ্মণী-কোলে কে শুয়েছ আলো করে,
কেরে ওরে দিগম্বর এসেছ কুটীর-ঘরে॥
ভূতলে অতুল-মণি, কে এলিরে যাদুমণি,
তাপিতা হেরে অবনী, এসেছ কি সকাতরে॥
ব্যথিতে কি দিতে দেখা, গোপনে এসেছ একা,
বদনে করুণা মাখা, হাস কাঁদ কার তরে॥
মরি মরি রূপ হেরি, নয়ন ফিরাতে নারি,
হৃদয়-সন্তাপ-হারী, সাধ ধরি হৃদিপরে॥

২

আমি সাধে কাঁদি,
হৃদয় রঞ্জনে না হেরে নয়নে কেমনে প্রাণ বাঁধি।
বিদায় দিছি পাষাণ প্রাণে, চাব কার মুখপানে,
ফুল্ল ফুল-হারে সাজাইব কারে, পোড়া বিধি হল বাদী॥
ভাবে ভোরা মাতোয়ারা, দু'নয়নে বহে ধারা
ঢলে ঢলে ঢলে নাচ কুতূহলে, এসো গুননিধি সাধি॥
চলে গেলে, আর এলে না, জীব তো হরিনাম পেল না,
পার পাবে না ক্ষণে, যদি দীনহীনে, কর পদে অপরাধী॥

৩

গগনভেদী উঠেছে জয়রব,
আজ যোগোদ্যানে রামকৃষ্ণ উৎসব ॥
মত্ত ধরা সসাগরা পরাশ শ্রীপদ
নাই তো আর ভবসিন্ধু, হয়েছে গোষ্পদ
ঘরে ঘরে রামকৃষ্ণ নাম-সম্পদ ॥

৪

আজ ধীরে জাগিছে স্মরণ।
হয়েছি রতনহারা বিহনে যতন ॥
সেই রবি-শশী-তারা সেই ধরা ফুল-হারা
বহিছে সময়ধারা বহিত যেমন।
সেই পক্ষীকুল কল অনিলে দোলে অনল
কেবল না হেরি নাথ তোমার বদন ॥
রসিক প্রেমিকবর জনমন ফুল্লকর
ধরেছিলে কলেবর আমার কারণ।
তবে প্রেম নাহি মনে ভুলে আছি তোমা ধনে
শত ধিক এ-জীবনে, ধিক তোরে মন ॥

৫

যদি স্মরণ নিতে পারি রাঙা পায়
নাম নিলে তার হৃদয় ভরে, কলঙ্ক কোথা পলায় ॥
নাম কলঙ্কভঞ্জন, ডাকলে নিরঞ্জন, থাকে কি অঞ্জন
লাঞ্ছনা গঞ্জনা কি রয়, ভেসে যায় তার করুণায় ॥
যে জন করুণা যাচে, (ঠাকুর) আসেন তার কাছে,
অভয় চরণ তার তরে আছে,
ডাক পতিত, পতিতপাবন, তরবে নামের মহিমায় ॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

(১)

সকল মঙ্গলালয়, পূর্ণ বিরাজিত,
প্রেমের আধার !
নির্বিকার, হর্ষ শোচ-বাসনা-বর্জিত,
জ্ঞানদীপ্ত মূর্তি মহিমার !
পদরেণু বাঞ্ছিত গঙ্গার,
নির্মল—অনিল স্পর্শে যার ;
উজ্জ্বল বিমল কান্তি, তাপিত জনের শান্তি,
চরণে হরণ ধরা-ভার,
শরেণ্য বরেণ্য আত্মা প্রণম্য সবার !

(২)

শুভাশুভ এ সংসারে সম প্রবাহিত,
মিশ্রিত ধারায়,
সুখে দুখে মানব-জীবন আন্দোলিত,
তুষ্ট রুষ্ট কহে দেবতায়,
গৃহ দগ্ধ অনল প্রভায়,
পূতিবারি—প্রাণনাশ তায় ;
পবন জগৎ-প্রাণ, ধ্বংসকারী বেগবান্,
রবি-তাপে জীবন হারায়,
অন্ন-বিষ, শস্য ক্ষয় কভু বরিষায় ।

(৩)

কভু রোষান্বিত হন জনক-জননী,
সহোদর—পর,
ভয়ঙ্করী বিকম্পিতা কভু বা ধরণী,
শয্যাগৃহ—সর্পের বিবর ;
প্রেমহীন পত্নীর অন্তর,
ধনে হয় পুত্র প্রাণহর ;
স্নেহমায়া পাশস্থিয়া, দুষ্টা কন্যা দহে হিয়া,
শত্রুপ্রায় স্বজন প্রখর,
অবিশ্বাসী—পুত্রসম পালিত কিঙ্কর ।

(৪)

ভাবান্তর নাহি মাত্র তব করুণায়
হে দীনশরণ
মাগে বা না মাগে—কৃপা বিলাও ধরায়,
বরিবার বারি বরিষণ ;
বিধবার ধনাপহরণ,
ভ্রূণহত্যা, কুলস্ত্রী-গমন ;
ত্যাজি কন্যা-পুত্র-নারী, পানাসক্ত, অত্যাচারী,
লোকত্যাজ্য ঘৃণিত জীবন—
তব দ্বার মুক্ত তার পতিত পাবন !

(৫)

ভবে ভ্রান্ত, অশান্ত তরঙ্গে দোলে নর
অজ্ঞান-আঁধারে,
সত্য-তত্ত্ব নিরূপণে ব্যাকুল অন্তর,
অসহায় বুদ্ধিবলে নারে
তর্ক দ্বন্দ্ব শাস্ত্রের বিচারে—
সন্দেহ উদয় বারে বারে ;
দিতে স্নিগ্ধ পদছায়া, ধরায় ধরেছ কায়া,
ঐক্য-জ্ঞান প্রচার সংসারে,
মিটে দ্বন্দ্ব, ঘুচে সন্দ, বিশ্বাস-সঞ্চারে ।

(৬)

কর্মফলে ভ্রাম্যমাণ জন্ম-মৃত্যু মাঝে,
নহে নিবারণ,
দিয়ে স্থান ভগবান্ শ্রীচরণ রাজে
তার নরে কপালমোচন !
নিরন্তর ত্রিতাপ দহন,
দণ্ড-করে পশ্চাতে শমন ;
কর্মফল নিজদেহে সহিয়া অপার স্নেহে,
করো দূর শমন-শাসন,
বার ত্রাস, হব পাশ, ত্রিতাপ হরণ !

(৭)

মোক্ষলুব্ধ হয় চিত্ত তোমার পরশে,
ভোগে তৃণজ্ঞান,
প্রেম-ভ্রমে কাম-রসে আর নাহি রসে,
দুঃখ সুঃখ নেহারে সমান ;
ঠেলে পায় ধন-জন-মান,
আত্মতত্ত্বে নিয়োজিত প্রাণ ;
বিবেক হৃদয়ে ফোটে, বিষয়-বন্ধন টোটে,
বৈরাগ্য-আলোক দৃশ্যমান,
আত্মা হেরে আপনারে—নহে অনুমান।

(৮)

কে তোমা পুজিতে পারে, পূজা জানে কেবা,
অজ্ঞান মানব,
আপন উন্নতি মাত্র তব পদ-সেবা,
তব ধ্যান পরম উৎসব ;
গোষ্পদ দুরন্ত ভবার্ণব,
দুষ্ট ষড়্‌রিপু্‌ পরাভব ;
ভুলায় যন্ত্রণা জ্বালা, তব নাম জপমালা,
অহঙ্কার দমিত দানব,
অর্চনার অধিকার—অতুল বৈভব।

(৯)

নিরৈশ্বর্য, আসিয়াছ মাধুর্য লইয়ে,
প্রেমে আঁখি ঝরে,
মানব, মানব-মাঝে, পরশিতে হিয়ে,
অমিশ্রিত মাধুর্য অধরে,
পাছে নর নাহি আসে ডরে
দীনবেশে ডাক সকাতরে ;
হরিবারে মন-প্রাণ, কর নাথ আত্মদান,
সংসার ভুলাও কণ্ঠস্বরে,
নয়ন-মাধুরী হেরি অভিমান হরে।

(১০)

চিনালে চিনিতে পারে, নহে অসম্ভব,
পুরুষ প্রধান !
মত্তচিত্ত মহা ঘোর বিষয়-আহব
হৃদয়ে না রহে তব স্থান ;
স্বপ্রকাশ হও বিদ্যমান
জ্ঞানাঞ্জনে করি দৃষ্টিদান ;
তবু ক্ষণে মূঢ় মন, হয় রূপ বিস্মরণ,
ইন্দ্রিয়-তাড়না বলবান্ !
হৃদ্‌পদ্ম বিকশিয়া হও অধিষ্ঠান ॥

সারদাদেবী-সঙ্গীত

পোহাল দুখ রজনী।
গেছে "আমি আমি" ঘোর কুস্বপন,
নাহি আর ভ্রম জীবন-মরণ,
হের জ্ঞান অরুণ-বদন বিকাশে, হাসে জননী ॥
বরাভয়করা দিতেছে অভয়,
তোল উচ্চতান গাও জয় জয়,
বাজাও দুন্দুভি,শমন-বিজয়, যার নামে পূর্ণ অবনী ॥
কহিছে জননী "কেঁদো না, রামকৃষ্ণ" পদ দেখো না ।
নাহিক ভাবনা রবে না যাতনা ॥"
হের মম পাশে, করুণায় দুটি আঁখি ভাসে,
ভুবন-তারণ গুণমণি ॥*

[* পূজ্যপাদ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ দেহত্যাগের পূর্বে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর দর্শন প্রার্থনা করেন। মাতাঠাকুরাণী সে সময় জয়রামবাটীতে ছিলেন সুতরাং সশরীরে না গিয়াও তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন। দর্শনের পর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ গিরিশচন্দ্র ঘোষকে ডাকাইয়া গানের ভাবটি স্বয়ং বলিয়া দিয়া গানটি রচনা করান। এই গান শুনিতে শুনিতে বা শ্রবণের পরেই তিনি দেহরক্ষা করেন।—'সঙ্গীত সংগ্রহ' ।]

বিবেকানন্দ-সঙ্গীত

(১)

তারা উজ্জ্বল পশিল ধরাপর, নির্মল গগন বিকাশি।
রত্নগর্ভা নারী রত্ন প্রসবিল, বিভোর বাল সন্ন্যাসী॥
রবিকর-কর্ষিত কুজ্ঝটিকা-ঘন, আবরে দিনকর-কান্তি,
মায়াবলম্বন কায়া প্রকটন, লীলা আবরণ ভ্রান্তি॥
গুরুপদ ধারণ, আত্মসমর্পণ, মহাহ্রদে নদ মহাসম্মিলন,
দয়া উচ্ছ্বসিত স্রোত মহান, দূরিত অশান্তি বিধৌত মেদিনী,
জনমন-মার্জিত শান্তিপ্রদান; সশিষ্য গুরুপদে হৃদে সাধে ধরি,
গায় অকিঞ্চন গান, কৃপাকণা অভিলাষী॥

(২)

কে রে নরেন্দ্রবর বীরেশ্বর দেহধারী।
সিদ্ধ মহাবিদ্যাবলে অবিদ্যা বিনাশকারী॥
তমাচ্ছন্ন বসুমতী, হেরি কি ব্যথিত যতি,
বিলাইতে জ্ঞান-জ্যোতি কে এনেছে সহকারী॥
রহি পরহিতে রত, শিখাবে কি মহাব্রত,
এসেছ আশ্রিত যত জন-মন তাপহারী॥
গুরুপদে বলিদান জীবন যৌবন মান,
হয়েছ কি অধিষ্ঠান, সাজিতে দীন-ভিখারী॥

(৩)

ভুবন ভ্রমণ কর যোগিবর যার ধ্যানে।
তাঁহারি সন্তানগণ চেয়ে আছে পথপানে॥
উচ্চব্রতে আত্মহারা, ভ্রমি সসাগরা ধরা,
মোহিলে মানব-চিত, প্রভুর গৌরব-গানে।
নানাদেশে নানাভাবে জয়ধ্বনি একতানে॥
রামকৃষ্ণ হৃদে ধর, হৃদয় আকৃষ্ট কর,
ইষ্টপূজা পূর্ণ তব, পুলক-আলোক দানে।
জনমন পুলকিত, মোহনিশা অবসানে॥